ভারত গল্পকথা

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারত গল্পকথা

পত্র ভারতী □ PATRA BHARATI

৩/১ কলেজ রো ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

রূপে রসে বর্ণে গন্ধে অনুপমা প্রাচীন ভারতভূমিকে
যারা জানতে চায়, এই বই সেই অগণিত
বন্ধুদের হাতে তুলে দিলাম।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য কিছু বই

দুরন্ত ঈগল

কালের জয়ডঙ্কা বাজে

নীল ঘূর্ণি

নাম তার ভাবা

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা (নবরূপে)

কিংমিক ও নানুকের দেশে

দিগন্তপারের স্বপ্ন

ভূমিকা

সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি রূপময় ভারতবর্ষ। আয়তনে যেমন বিশাল বিপুল, তেমনি বিচিত্র তার রূপ ও প্রকৃতি। তার উত্তরে যেমন চিরতুষারে ঢাকা নগাধিরাজ হিমালয় মহাকাশ স্পর্শ করেছে, আর তার পরেই প্রসারিত হয়েছে দিগন্তহীন সমতলভূমি, তেমনি দক্ষিণে তার পাদদেশে এসে আছড়ে পড়ছে নিঃসীম বারিধির অশান্ত ঊর্মিমালা।

এই যে বৈচিত্র্য ও বিশালতা, এটা শুধু ভারতের বাইরের রূপ নয়, যুগে যুগে তার মানসলোককেও তা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতীয় মহাকাব্য দুখানি—রামায়ণ ও মহাভারত। দেশের মতই বিশাল তাদের কলেবর, বিচিত্র তাদের সংগ্রহ। উপনদী-শাখানদীর মতই অজস্র কথা ও কাহিনী এসে মিশেছে মূল দুটি কাহিনীর স্রোতধারার সঙ্গে। শুধু কি মহাকাব্যদুটিতে, অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও, তার জাতক, পুরাণ ইত্যাদিতেও গল্প ও উপকথার ভাণ্ডার সুবিপুল, অফুরন্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচীন ভারতের যে চিত্র আমরা দুই মহাকাব্যে, বিশাল জাতকগ্রন্থে এবং সংখ্যাতীত গল্প-উপকথার ভাণ্ডারে দেখি, তার সঙ্গে ভারতের বিস্তার ও বিপুলতারই যে কেবল সংগতি রয়েছে, তাই নয়; হিমালয়ের মতই তা স্পর্শ করেছে তার কল্পলোক ও ভাবরাজ্যের মহাকাশ; যাত্রা যেন তার সীমাহীন ঊর্ধ্বলোকের দিকে। এখানে দেখা মেলে অমূল্য মণিমুক্তোর মত এমন সব কাহিনীমালার, যেগুলি রূপে, রসে, বর্ণবৈচিত্র্যে ও সুষমায় বিশ্বে নজিরহীন। এবং তাদের গল্পবস্তু এমনই আশ্চর্যসুন্দর, যা সব বয়সের পাঠককে সমানভাবে আনন্দ দিতে সক্ষম।

এই বইয়ে, আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে, রামায়ণ-মহাভারত এবং জাতক ও লোককথা থেকে মোট ষোলটি গল্প নির্বাচন করে নতুন রূপে ও ভাষায় পরিবেশন করা হলো। মূল কাহিনীগুলির কাঠামোয় নতুন রক্ত-মাংস-মজ্জা সংযোজন করা হয়েছে, বলা যেতে পারে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি প্রাচীন ভারতের বর্ণাঢ্য রূপমাধুরীর কিছুটাও ফুটিয়ে তুলতে পেরে থাকি এবং তার মাধ্যমে জাতির উত্তরাধিকারীরা যদি দেশের বর্ণাঢ্য প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি কিছু-মাত্রও আকৃষ্ট হয়, তাহলেই বুঝব, আমার চেষ্টা-যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী পৃষ্ঠা

মনু ও মহাপ্লাবন	৯
কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ	১৬
ছাতা ও জুতার উৎপত্তি	২৪
ব্যাধ ও কপোত-কপোতী	২৯
সগর রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞ	৩৪
পৃথিবীতে গঙ্গা-অবতরণ	৪২
নল-দময়ন্তী	৪৮
যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা	৭১
অনাথ-সংবাদ	৮০
মিত্রবিন্দক	৯৪
পশু ও মানুষ	১১৫
পরিণাম ও পুরস্কার	১২৭
নামের ফ্যাসাদ	১৩৮
প্রথম কান্না	১৪৪
বিধাতার বিধিলিপি	১৪৯
চিরস্মরণীয়া গোপকন্যা	১৬৯

সুদূর আদি যুগে—কত কাল আগে কে জানে !···

ভারতের উত্তরে দিগন্তপ্রসারী গিরিরাজ হিমালয়। তুষারশুভ্র মুকুট পরে হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে—ধ্যানমৌন মহাকালের মতো।

নির্জন হিমালয়ের কোলে শান্ত সুন্দর তপোবন বদরিকাশ্রম—মহর্ষি মনুর আশ্রম। মনু সূর্যের পুত্র। সূর্যের আর এক নাম বিবস্বান। মনুকে তাই বলা হয় বৈবস্বত মনু।

তপোবন থেকে কিছু দূরে কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে চীরিণী নদী—অশান্ত উচ্ছল পাহাড়ী মেয়ের মতো। দুই কূলে তার মনোহর বনশোভা। বর্ণে গন্ধে অপরূপ।

চীরিণীর তীরে মনু তপস্যা করছেন। তিনি মহাতপা—হিমালয়ের এই নিভৃত কোণে তপস্যা করছেন বহুকাল। আর সেই দুশ্চর তপস্যার ফলে লাভ করেছেন অসীম ক্ষমতা।

সেদিন মহর্ষি তপস্যায় বসেছেন। এমন সময় কানে এল এক ক্ষীণ কণ্ঠ। কে যেন আর্ত কণ্ঠে বলছে—"মহর্ষি, আমি বড়ই বিপন্ন। শত্রুর হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।"

মহর্ষি চোখ মেললেন। দেখলেন—তীরের কাছে জলের উপর ভেসে উঠেছে এতটুকু একটা মাছ। জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

অবাক হয়ে মহর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তোমার শত্রু ?"

মাছ বলল—"নদীর যত বড় বড় মাছ। আমাকে খাওয়ার জন্যে সব সময় তারা পিছনে তাড়া করে ফিরছে।"

আরও অবাক হয়ে মহর্ষি বললেন—"কেন ? মাছ মাছকে খাবে কেন ?"

মাছ বলল—"আমাদের মাছের রাজ্যে এইটাই তো নিয়ম, মহর্ষি। বড় মাছ ছোট মাছকে দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলে। শক্তিমানের হাত থেকে দুর্বলের নিস্তার নেই। তাই তো এ নিয়মকে বলা হয় মাৎস্য-ন্যায়।"

তারপর একটু থেমে কাতর কণ্ঠে সে আবার বলল—"সেইজন্যেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। দেখুন—আমি বড়ই ছোট। যে কোন সময়ে

বড় মাছের হাতে আমার মরণ হতে পারে। আপনিই কেবল পারেন আমাকে রক্ষা করতে। আমাকে বাঁচান মহর্ষি!"

মাছটির জন্যে মনুর মন মমতায় ভরে গেল। অঞ্জলি ভরা জলে ছোট্ট সুন্দর মাছটিকে তিনি সযত্নে তুলে নিলেন নদী থেকে।—রেখে দিলেন জলভরা এক পাত্রের মধ্যে।

দিন যায়। মাছ মনের সুখে নিশ্চিন্তে বাস করে সেই পাত্রের জলে, আর মনুর স্নেহে যত্নে বাড়তে থাকে দিনের পর দিন। বাড়তে বাড়তে শেষে এক সময় সে এত বড় হল যে, পাত্রের মধ্যে তার শরীর আর আঁটতে চায় না। তখন মনুকে সে বলল—"মহর্ষি, পাত্রের মধ্যে আমি আর থাকতে পারছি না, নড়তে চড়তেও কষ্ট পাই। কোনো একটা বড় জলাশয়ে আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।"

আদরের ছোট মাছটি এত বড় হয়েছে দেখে মহর্ষির বড় আনন্দ হল। তখুনি তাকে তুলে নিয়ে এক সরোবরে ছেড়ে দিলেন।

প্রকাণ্ড সরোবর। নির্ভয়ে মাছের সেখানে দিন কাটে। দিনরাত সে সাঁতার কেটে বেড়ায় মনের আনন্দে।

তারপর কত দিন কেটে গেল। মাছের জন্যে মহর্ষির আর কোনো ভাবনা নেই। আগের মতই আবার তিনি তপস্যায় মন দিয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর ধ্যান ভাঙতেই মিনতিভরা কণ্ঠে মাছ তাঁকে ডাকল। বলল—"মহর্ষি দেখুন, এই সরোবরেও আমি আর থাকতে পারছি না। এখানেও আমার শরীর আর আঁটছে না। তাই বলছি—দয়া করে গঙ্গায় আমাকে ছেড়ে দিন। আপনার দয়াতেই আমি প্রাণে বেঁচেছি, আজ এত বড় হয়েছি। এ উপকার আমি জীবনে ভুলব না, মহর্ষি। সুযোগ পেলেই সাধ্যমত প্রতিদান দেবার চেষ্টা করব।"

মহর্ষি অবাক হলেন।

তাঁর বড় ভাল লাগল। মাছকে তিনি তখুনি সরোবর থেকে তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ছেড়ে দিলেন।

মাছের মনে যেন আনন্দের জোয়ার এল। জলে পড়তেই খুশীতে আত্মহারা হয়ে সে সাঁতার কেটে আর লেজের ঝাপ্‌টা মেরে তোলপাড় করে তুলল সুপ্রশস্ত গঙ্গার জল।

মহর্ষি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত মনে আবার গিয়ে ধ্যানে বসলেন।

তারপর কত দিন কেটে গেল—মহর্ষির খেয়াল নেই। শেষে আবার

সীমাহীন উত্তাল সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে মাছ নৌকো টেনে নিয়ে চলল। ছুটে চলল উল্কার মতো। [পৃষ্ঠা ১৩]
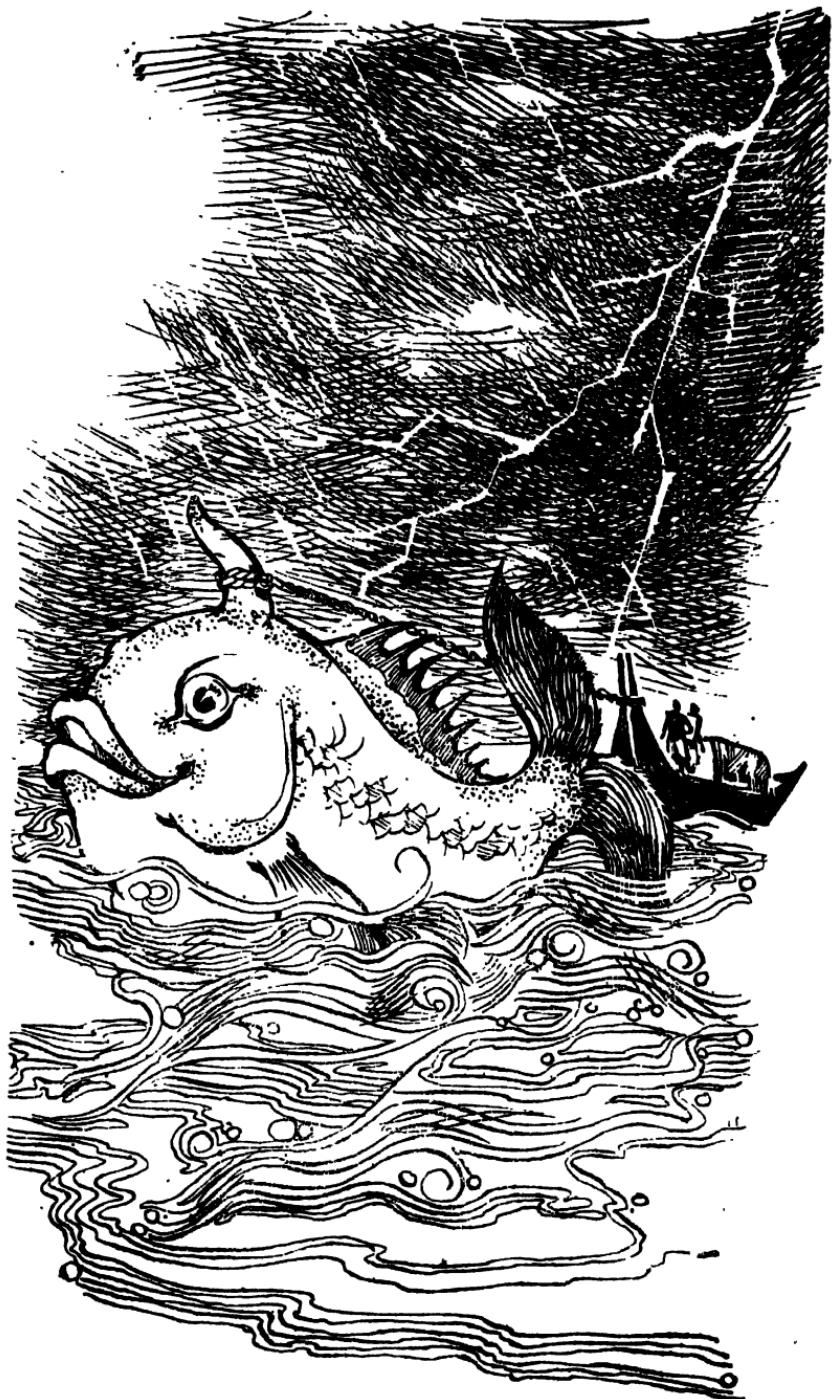
একদিন তাঁর ধ্যান ভাঙতেই মাছ তীরের কাছে এগিয়ে এল। ডাক দিল মহর্ষিকে। বলল—"দেখুন মহর্ষি, গঙ্গার বুকেও আমার শরীর আর আঁটছে না। পাশ ফিরতেও বড় কষ্ট বোধ হয়, দুই কূলে দেহ আটকে যায়। তাই শেষবারের মতো আবার এসেছি আপনার কাছে। আমার শেষ প্রার্থনা—দয়া করে আমায় সমুদ্রে ছেড়ে দিন।"

মাছকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে মহর্ষি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখে তাঁর কথা নেই। কোথায় সেই একরত্তি ছোট্ট মাছ! তার বদলে এ কী মহাভয়ংকর মৎস্যরাজ! পর্বতের মতো বিশালকায়—এ যে জগতে মহাবিস্ময়!

মহর্ষির চোখে মুখে নিদারুণ দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কি করে এ মাছকে তিনি বয়ে নিয়ে যাবেন সমুদ্রে? এত বড় মাছ—ওজন তার নিশ্চয়ই সাংঘাতিক হবে! কিন্তু তার অনুরোধই বা তিনি এড়াবেন কি করে? সত্যিই তো—গঙ্গায় তার বড় কষ্ট হচ্ছে।

বিষম সংকটে হতভম্বের মতো মহর্ষি ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত মনে এগিয়ে গেলেন মাছটিকে গঙ্গা থেকে তুলবার জন্যে। তুলতে গিয়েই মহর্ষি আবার চমকে উঠলেন, তাই তো! এ কী বিস্ময়ের পর বিস্ময়! এত বড় বিশালকায় মাছ—অথচ ওজন তার এত কম! আর এত স্নিগ্ধশীতল তার শরীর। তাছাড়া মাছেদের গায়ের উৎকট গন্ধও নেই তার গায়ে!

বিস্ময়ে আনন্দে মহর্ষি মাছকে কাঁধে তুলে নিলেন। তারপর রওনা হলেন সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রে পেঁছে মাছকে জলে ছেড়ে দিতেই, মাছের মুখে দেখা দিল স্নিগ্ধ মধুর হাসি। মৃদু হেসে সে বললে—"মহর্ষি, আপনার দয়ার তুলনা নেই। আপনি আমাকে বারে বারে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন! এইবার আমিও তার কিছুটা প্রতিদান দেব। এক মহাবিপদ আসছে, সে বিপদ থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করব।"

মনু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাছের দিকে। কিসের বিপদ থেকে সে তাঁকে রক্ষা করবে? মাছ যেন বুঝতে পারল মহর্ষির মনের কথা। একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—"শুনুন মহর্ষি, মহাভয়ংকর এক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীর বুকে। নেমে আসছে সর্বগ্রাসী এক মহাপ্লাবন। সেদিনের আর বিলম্ব নেই। সে বন্যার হাত থেকে কিছুই নিস্তার পাবে না।—স্থাবর-জঙ্গম, অরণ্য-পর্বত সমস্তই তলিয়ে যাবে। ধরণীর বুক থেকে মুছে যাবে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সমস্ত চিহ্ন।"

মাছের কথা শুনে অনাগত এক ভয়ংকর বিপদের আশংকায় মহর্ষির সর্বদেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। বিহ্বল মহর্ষি শুনলেন, নিষ্ঠুর

নিয়তির মতো মাছ বলছে—"সব কিছুই ধ্বংস হবে, মহর্ষি। এমন কি দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব-কিন্নরও সে প্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। কিন্তু আপনার ভয় নেই। আপনাকে আমি রক্ষা করব। কিন্তু তার আগে কয়েকটি কাজ আপনাকে করতে হবে। যা বলি মন দিয়ে শুনুন—তাচ্ছিল্য করবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব খুব মজবুত একখানা বড় নৌকা তৈরি করুন। নৌকায় খুব শক্ত কিছু মোটা দড়ি রাখবেন আর যে সব উদ্ভিদ খুব প্রয়োজনীয়, তাদের বীজ কিছু কিছু সঙ্গে নেবেন। নৌকায় সেগুলিকে সাজিয়ে রাখবেন আলাদা আলাদা করে। তারপর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস্, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, এই সপ্তর্ষিদের সঙ্গে নিয়ে আপনি নৌকায় আমার জন্যে সমুদ্রে অপেক্ষা করবেন। ভয় নেই—স্মরণ করতেই আমি ঠিক সময়ে হাজির হব। সে সময় আমার মাথায় শিঙ্ দেখতে পাবেন। এখন আমায় বিদায় দিন। মনে রাখবেন, আমার সাহায্য ছাড়া সেই প্রলয়ের হাত থেকে আপনারা কিছুতেই নিস্তার পাবেন না।"

এই বলে মাছ মহাসমুদ্রে ডুব দিল। মনু স্তব্ধ হয়ে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুকাল। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাজে মন দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ করে একদিন সপ্তর্ষিদের নিয়ে তিনি সমুদ্রে নৌকা ভাসালেন।

তারপর একদিন নেমে এল সেই মহাপ্লাবন—নেমে এল লক্ষ কোটি বজ্রের গর্জন। সব কিছু ভেসে গেল। দেখতে দেখতে কোথায় তলিয়ে গেল পৃথিবী। জীবজন্তু রইল না, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত রইল না। রইল শুধু অসীম অথই জলরাশি—ক্ষুব্ধ উন্মত্ত মহাসমুদ্র আর তার প্রলয় কল্লোল। আর তার মাঝে মনুর নৌকা আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগল মোচার খোলার মতো।

চারিদিকে তাকিয়ে মনুর বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। মাছকে তিনি মনে মনে স্মরণ করলেন। অমনি মুহূর্ত মধ্যে কোথা থেকে এসে হাজির হল মৎস্যরাজ। পর্বতের মতো সুবিশাল তার কলেবর, আর মাথায় পর্বতের চূড়ার মতই প্রকাণ্ড শিঙ্। মাছের নির্দেশ মতো মনু দড়ি দিয়ে তার শিঙের সঙ্গে নৌকা বাঁধলেন। সীমাহীন উত্তাল সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে মাছ নৌকা টেনে নিয়ে চলল। ছুটে চলল উল্কার মতো মহাবেগে।

এইভাবে মাস গেল, বছর গেল, কেটে গেল কত কাল। তবুও বন্যার শেষ নেই। মাছ নৌকা নিয়ে ছুটতে লাগল, ঘুরতে লাগল মহাসমুদ্রে। নৌকা বাঁধবার ঠাঁই নেই কোথাও। চারিদিকে শুধুই জল আর জল। জলমগ্ন আকাশ ও পৃথিবী—সব একাকার। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ফুলছে, ফুঁসছে,

পর্বতের মত ছুটে আসছে, আর উন্মত্তের মত আছাড় খেয়ে পড়ছে নৌকার গায়ে।

মনু চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আর বেদনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—হায়! কোথায় সেই গিরিরাজ হিমালয়! কোথায় গেল সেই শ্যামসুন্দর কোমলা পৃথিবী! সে যেন সেই কোন্ জন্ম-জন্মান্তর আগে লুপ্ত হয়েছে—জীবনের শেষ চিহ্ন!

তারপরেও কেটে গেল আরো বহুকাল। শেষে একদিন ধীরে ধীরে হিমালয়ের এক আকাশছোঁয়া মহাশৃঙ্গ জেগে উঠল অন্তহীন সমুদ্রের বুকে। মাছ নৌকা নিয়ে শৃঙ্গের কাছে এসে বলল—"মহর্ষি, এই শৃঙ্গে নৌকা বেঁধে অপেক্ষা করুন। জল কমতে শুরু করছে!"

মহর্ষি নৌকা বাঁধলেন সেখানে। আজও সে শৃঙ্গকে বলা হয় 'নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ'।

নৌকা বাঁধা হতেই গম্ভীর স্বরে মাছ বলল—"আমার কাজ শেষ হয়েছে, মহর্ষি। এইবার বিদায় নেব। কিন্তু তার আগে কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যাব। প্রলয়ে জীবজগৎ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তাকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। আপনাদের মধ্যে মনুই হবেন সেই স্রষ্টা। তাঁরই একাগ্র সাধনায় পৃথিবী আবার জীবনের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠবে। জন্ম নেবে সুরাসুর যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব-কিন্নর।"

মাছের কথা শেষ হতেই মনু জিজ্ঞেস করলেন—"মৎস্যরাজ, বহুকাল যাবৎ ভেবেছি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, জিজ্ঞেস করব তোমার পরিচয়। কে তুমি? তুমি তো সামান্য জলচর জীব নও।"

মৃদু হেসে মাছ বলল—"না মহর্ষি, সামান্য মাছ নই আমি। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা। প্রলয় থেকে তোমাদের রক্ষা করার জন্যেই মাছের রূপ ধরে এসেছিলাম।" বলেই মাছ অন্তর্হিত হল। আর বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন মহর্ষিরা।

তারপর জল কমতে লাগল ধীরে ধীরে। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি ধীরে ধীরে মাথা তুলল একের পর এক—হিমালয় জাগল। জল আরো নেমে গেল—ধীরে ধীরে জাগল বসুন্ধরা। দেখা দিল সিক্ত কোমল মাটি।

উদ্ভিদের বীজগুলি সঙ্গে নিয়ে মাটির বুকে পা দিলেন মনু আর সপ্তর্ষি—যেন কত জন্ম পরে। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল গভীর শান্তি আর মুক্তির নিশ্বাস।

কিন্তু এ কী!—এ কি সকরুণ দৃশ্য পৃথিবীর! শব্দহীনা প্রাণহীনা রিক্তা বসুন্ধরা যেন মহাশ্মশান! মহাশূন্যতার মাঝে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে—সন্তানহারা জননীর আর্ত কান্নার মত।

শোকবিহ্বল মহর্ষিদের দু চোখ বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। প্রাণ মন হাহাকার করে উঠল।

তারপর মনু কাজে মন দিলেন। জীবন-সৃষ্টির জন্যে শুরু হল তাঁর একাগ্র কঠোর তপস্যা। ধীরে ধীরে বীজ থেকে উদ্ভিদ-জগতের সৃষ্টি হল। ধীরে ধীরে জন্ম নিল প্রাণিজগৎ! সবুজ প্রাণের উচ্ছল আনন্দে আর মানুষের কলকোলাহলে আবার পৃথিবী একদিন হেসে উঠল—উদ্বোধন হল নবজীবনের।

সে কোন্ এক কালে—হাজার হাজার বছর আগে······

সে সময় মধ্য দেশে ছিল গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ। শুধু নামেই ব্রাহ্মণ —শাস্ত্রচর্চা, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম, কোন কিছুই সে জানত না। সেকালে ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল বেদপাঠ করা। কিন্তু মূর্খ গৌতম লেখা-পড়াই বিশেষ জানত না, তা বেদপাঠ করবে কি করে? তাই ভিক্ষাবৃত্তিই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। ভিক্ষা করেই তার দিন চলত। আর এই ভিক্ষার আশায় সময় সময় বহু দূরের পথ তাকে যেতে হত।

একদিন গৌতম ভিক্ষায় বের হয়েছে। নিজের দেশে ভিক্ষা আর বড় মেলে না। ঘুরতে ঘুরতে মধ্য দেশ ছাড়িয়ে এক সময় সে এসে হাজির হল উত্তর প্রদেশ। বনের পাশেই ছিল একখানি গ্রাম। গৌতম ভিতরে ঢুকে দেখল, বাসিন্দারা সবাই অবস্থাপন্ন, কিন্তু জাতিতে কিরাত। বনে জঙ্গলে ঘুরে পশু-পাখি শিকার করাই তাদের পেশা। মনে তাদের এতটুকু দয়ামায়া নেই। তারা বনের ব্যাধ।

গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের বাস নেই। গৌতম একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর এসে উঠল বেশ অবস্থাপন্ন এক কিরাতের বাড়িতে। পরিচয় পেয়ে বাড়ির কর্তা তাকে খাতির-যত্ন করে বসাল, আদর-আপ্যায়নের পর জানতে চাইল তার আসবার কারণ।

গৌতম বলল—"বহু দূর দেশ থেকে আমি এসেছি। তোমাদের গ্রামখানা দেখে আমার বেশ ভালই লেগেছে। সুবিধা পেলে এখানে আমি থেকেও যেতে পারি। সেইজন্যে আমার প্রার্থনা—থাকার মত আমাকে একখানা ঘর দাও, আর এক বছরের মত খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দাও।"

একজন ব্রাহ্মণ গাঁয়ে থাকতে চাইছেন—এ তো মহা ভাগ্যের কথা! সবাই খুব খুশী হয়ে উঠল। গৌতমের প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হল। শুধু তাই নয়। এক বছরের খাবার-দাবার, নতুন কাপড় আর থাকার ঘর তো সে

পেলই, সেই সঙ্গে তাকে পরিচর্যা করার জন্যে বিধবা যুবতী দাসীও একজন দেওয়া হল।

খাওয়া-পরার আর ভাবনা নেই—গৌতম তো ভারী খুশী। সেখানে সে মহানন্দে বাস করতে লাগল।

তারপর বহুদিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে আত্মীয়স্বজনের কথা গৌতম ভুলে গেল। গাঁয়ের কথাও আর মনে রইল না।

দুর্দান্ত নিষ্ঠুর ব্যাধদের সঙ্গে থাকার ফলে ধীরে ধীরে তার স্বভাবও পালটে গেল। সে তীরধনু ছোঁড়া শিখল এবং কালে কালে একজন পাকা ব্যাধ হয়ে দাঁড়াল। কিরাতদের মত বনে বনে পশু-পাখি শিকার করে বেড়ানোই হল তার একমাত্র কাজ।

একদিন গৌতম শিকারের জন্য বনে গিয়েছে, এমন সময় তার বাড়িতে এসে হাজির হলেন একজন শুদ্ধাচারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। গৌতমেরই গ্রামবাসী তিনি। গৌতমও সেই সময় ফিরে এল শিকার থেকে। হাতে তার তীরধনু। কাঁধে মরা হাঁসের বোঝা। সারা গা দিয়ে মরা পাখির রক্ত ঝরে পড়ছে। ঠিক যেন রাক্ষসের মত চেহারা।

ব্রাহ্মণ গৌতমকে দেখেই চিনেছিলেন। তিনি শিউরে উঠলেন। এককালে গৌতম ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধু। আজ তার এই অবস্থা দেখে কিছু সময়ের জন্যে ব্রাহ্মণের মুখে কথা যোগাল না। তারপর বেদনাভরা কণ্ঠে তিনি বললেন—"আমাকে চিনতে পার, গৌতম ? আজ এ কী তোমার অবস্থা হয়েছে ? তুমি এত নীচে নেমেছ ? মধ্য দেশের সৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কুলে না তোমার জন্ম ? এই কি তার পরিণতি ? শেষকালে তুমি এত বড় কুলাঙ্গার হলে গৌতম ;"

লজ্জায় গৌতম মুখ তুলে চাইতে পারছিল না। মনে হয়তো তখন কিছু অনুতাপও এসেছিল। মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়, তারপর বলল—"আমাকে ক্ষমা কর, ভাই। আমি মূর্খ—বেদজ্ঞানহীন ; তাই অর্থের লোভে এখানে এসে এইসব অপকর্ম করছি। কিন্তু আর নয়।"

ব্রাহ্মণ খুশী হয়ে বললেন—"বেশ, তাই যদি হয়, তুমি যদি নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে থাক, তাহলে এখনও সময় আছে। দয়ালু আর বিনয়ী হও ভাই—বিদ্যা ও চরিত্রবল লাভের চেষ্টা কর, আর সৎ পথে থেকে অর্থোপার্জন কর, তাহলেই তোমার সমস্ত পাপ দূর হবে।"

এই বলে ব্রাহ্মণ গৌতমকে আরো নানা উপদেশ দিয়ে পর দিন ভোরবেলায় বিদায় নিলেন। গৌতমও সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করল। সৎ পথে থেকে অর্থোপার্জন করবে—এই আশায় একলাই রওনা হল সমুদ্রের দিকে। কিছুদূর যেতেই সে দেখল, একদল বণিক চলেছে সেই পথে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে চলল তাদের সঙ্গে।

সরু পথ। দুধারে গভীর বন আর পাহাড়ের সারি। কত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকে সেখানে। হঠাৎ এক সময় এক পাহাড়ের গুহা থেকে এক বুনো হাতী বেরিয়ে এল—তাদের আক্রমণ করল শুঁড় উঁচিয়ে। বণিকদের মধ্যে যে যেদিকে পারল, ছুটে পালাল। মারাও পড়ল অনেকে। আর প্রাণের দায়ে বনের ভিতর দিয়ে গৌতম ছুটতে লাগল অশ্বের মত।

অনেকক্ষণ পরে সে এসে হাজির হল এক উপবনে। সে বনের শোভা অপরূপ—দেখে প্রাণ মন তার জুড়িয়ে গেল। বনের চারিদিকে বিচিত্র সুন্দর কত ফুলের সমারোহ! গাছে গাছে উড়ছে বিচিত্র সুন্দর কত পাখি। কোথাও তার শাল তাল তমাল আর অগুরু চন্দন গাছের বন। কোথাও আমগাছের সারি। ফলভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলি। সব ঋতুতেই সে সব গাছে ফল ধরে। পাখির কাকলি-ঝঙ্কারে, স্নিগ্ধ মলয় হাওয়ায় আর ফুলের মিঠা গন্ধে গৌতমের মনে হল, কে যেন পরম যত্নে সাজিয়ে রেখেছে বাগানখানা।

ঘুরতে ঘুরতে গৌতম এসে বসল এক বটগাছের নীচে। ডালপালা ছড়িয়ে সে বিরাট মহীরুহ বহুদূর পর্যন্ত ছায়া বিস্তার করেছে। গৌতম নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সেখানে।

সেই বটগাছে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক পরমধার্মিক বক বাস করতেন। তাঁর আর এক নাম ছিল রাজধর্ম। রাজধর্ম ছিলেন দেবতার সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন কশ্যপ। মা ছিলেন দক্ষের মেয়ে সুরভি। আর ব্রহ্মা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। রোজ ভোরবেলায় ব্রহ্মালোকে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসা ছিল রাজধর্মের নিত্যকার কাজ।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজধর্ম বাসায় ফিরে দেখতে পেলেন গৌতমকে। তাঁর ভারী আনন্দ হল অতিথি দেখে। গৌতমও সে সময় ঘুম থেকে উঠে বসেছিল। খিদের জ্বালায় তার পেট জ্বলছে। এমনি সময়ে রাজধর্মকে দেখে মনটা তার খুশীতে নেচে উঠল। হাজার হোক ব্যাধের স্বভাব তো! কিভাবে নধরকান্তি বকটির মাংসে খিদে মেটানো যায়, তারি ফন্দি আঁটতে লাগলো মনে মনে।

এদিকে রাজধর্ম কিন্তু বাসা থেকে তখনি নেমে এসে গৌতমকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, নিজের পরিচয় দিয়ে রাত্রিটা তাঁর ওখানে কাটাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন বার বার। গৌতমও তাই চাইছিল। অতিথি-সৎকারের জন্য রাজধর্ম তখন নদী থেকে বড় বড় মাছ ধরে আনলেন, আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। গৌতম তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলে রাজধর্ম ডানা দিয়ে তাকে বাতাস করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন তার নামধাম পরিচয়, জানতে চাইলেন তার এখানে আসবার কারণ।

গৌতম নিজের পরিচয় কিছুই প্রকাশ করল না। শুধু বলল—"আমার

এমনি সময়ে রাজধর্ম'কে দেখে মনটা তার খুশীতে নেচে উঠল।······কিভাবে নধরকান্তি বকটির মাংসে খিদে মেটানো যায়······ [পৃষ্ঠা ১৮]

নাম গৌতম। আমি ব্রাহ্মণ—বড়ই গরীব। তাই টাকা রোজগারের আশায় সমুদ্রের দিকে চলেছি।"

রাজধর্ম বললেন—"বেশ! আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। যাতে প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।" এই বলে তিনি গৌতমের জন্যে ফুল পাতা দিয়ে সুন্দর করে বিছানা পেতে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলায় গৌতমকে একটি পথ দেখিয়ে বকরাজ বললেন—"এই পথ দিয়ে গেলে আপনি তিন যোজন দূরে মেরুবজ্র নামে একটি নগর দেখতে পাবেন। সেখানে বিরূপাক্ষ নামে একজন মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ বাস করেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। তাঁর কাছে গিয়ে আমার নাম করবেন। তাহলেই সমস্ত প্রার্থনা আপনার পূরণ হবে।"

গৌতম রওনা হল। রাজধর্মের নির্দেশমত বিরূপাক্ষের রাজধানী মেরুবজ্র নগরে পেঁছে সে তো অবাক। দেখল—নগরের প্রাকার, তোরণ, কপাট, অর্গল, সব কিছুই পাথরের তৈরী।

বিরূপাক্ষ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আগের মত এবারও গৌতম সব চেপে গেল। নিজের নাম আর গোত্রই শুধু বলল। আর সেই সঙ্গে জানাল তার আসবার কারণ। বিরূপাক্ষ কিন্তু খুশী হলেন না। বললেন—"ব্রাহ্মণ, ভয় করবেন না। আপনার সমস্ত পরিচয় ঠিকমত খুলে বলুন।"

গৌতম বুঝল, কঠিন ঠাঁই। কি আর করে? জড়িয়ে জড়িয়ে কোনো রকমে বলল—"মহারাজ, এবার সত্যি কথাই বলছি। মধ্য দেশে আমার জন্ম। এখন কিরাতের বাড়িতে থাকি। এক বিধবা কিরাতিনীকে বিয়ে করেছি।"

গৌতমের কথা শুনে আর তার চেহারা ও হাবভাবে বিরূপাক্ষের মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। বুঝলেন, লোকটা জাতিতেই শুধু ব্রাহ্মণ, কিন্তু প্রবৃত্তি তার অতি হীন। কি করবেন তিনি, ভাবতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন, লোকটা যত অসৎই হোক, শুধু হাতে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলে না। হাজার হোক প্রিয়সখা রাজধর্ম তাকে পাঠিয়েছেন।

সেদিন ছিল কার্তিক পূর্ণিমা। সেই উপলক্ষে বিরূপাক্ষের ওখানে এক হাজার ব্রাহ্মণ খাওয়ানোর, আর প্রচুর দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা ছিল। গৌতম তাই অন্যান্যদের মতই ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত হল। দক্ষিণা পেল প্রচুর—সোনার তৈরী কত ভোজনপাত্র, কত হীরা-মণিমাণিক্য।

ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন। গৌতমও রওনা হল—ধনরত্নের এক বিরাট বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অতি কষ্টে ফিরে এল সেই বটগাছের তলায়। শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত গৌতমকে দেখে রাজধর্ম

বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি থাকতে বন্ধু যদি কষ্ট পেল, তাহলে কোথায় রইল তাঁর ধর্ম? তাঁর বেঁচে থেকে কি লাভ?

তাই তখনি তিনি গাছ থেকে নেমে এসে নিজের ডানা দিয়ে বন্ধুকে বাতাস করে, তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর আগুনের পাশে তার জন্যে বিছানা পাতলেন পরম যত্নে। নিজেও তিনি সে রাতে গাছের উপরে বাসায় শুলেন না। বন্ধুর পাশেই শয্যা বিছিয়ে নিলেন।

খাওয়া সেরে গৌতম শুয়ে পড়ল। সুখচিন্তায় মন তার বিভোর। এত আরাম সে জীবনে কোন দিন বোধ করেনি। ধনরত্ন পেয়েছে প্রচুর। খাওয়াটাও মন্দ হয়নি। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—"ধনরত্নে বোঝাটা বড়ই ভারী হয়েছে। যেতেও হবে বহুদূর। অথচ পথের মধ্যে খিদে পেলে খাব, এমন কিছুই সঙ্গে নেই।"

গৌতম ভাবতে লাগল। পাশে শুয়ে আছেন বন্ধুবৎসল বকরাজ। হঠাৎ তাঁর উপর চোখ পড়তেই গৌতম উঠে বসল, আপন মনে বলল—বাঃ। ঠিক হয়েছে। বকটা তো বেশ হৃষ্টপুষ্ট! গায়ে ওর এত মাংস আছে যে, পথের মাঝে খাওয়ার কথা আর ভাবতেই হবে না।

তারপর!—গভীর রাত্রি। আগুন জ্বলছে। রাজধর্ম বন্ধুর পাশে ঘুমোচ্ছেন নির্ভাবনায়। গৌতম উঠে দাঁড়াল। তারপর—মনে তার এতটুকু অনুতাপ এল না, এতটুকু খটকা লাগল না—চোখের নিমেষে সে বকরাজের গলা টিপে ধরল, হত্যা করল তাঁকে। তারপর তাঁর দেহ থেকে পাখা, রোম ছাড়িয়ে আগুনে মাংস সিদ্ধ করে নিল ভালভাবে। শেষে, ভোরের আলো ফুটতেই ধনরত্ন আর মাংসের বোঝা নিয়ে কৃতঘ্ন ছুটে চলল নিজের পথে।

এদিকে, রাক্ষসরাজের ভাবনার অন্ত নেই। পরদিন রাজধর্ম এল না দেখে তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন—"দেখ, রাজধর্মের জন্যে আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ভোরে সে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে যায়। সন্ধ্যার আগে আমার সঙ্গে দেখা না করে কখনো ঘরে ফেরে না। আজ এই প্রথম যে, সে এল না। গৌতম নামে সেই লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগেনি। তার ভাবভঙ্গী দেখে দুর্জন পাষণ্ড বলেই মনে হয়েছিল। সে লোকটি রাজধর্মের কাছে গেছে জেনেই আমি এত উদ্‌বিগ্ন বোধ করছি। তুমি একবার যাও—রাজধর্মের খোঁজ নিয়ে এস।"

রাক্ষসরাজপুত্র তখুনি কয়েকজন অনুচর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বটগাছের নীচে এসে রাজধর্মের পাখা পালক হাড়গোড় ইত্যাদি দেখে বুঝতে তাদের কিছুই বাকি রইল না। পিতৃবন্ধু পরম সুহৃদের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে তারা দারুণ রাগে ঝড়ের বেগে ছুটল সামনের দিকে।

ধনরত্নের বোঝা আর রাজধর্মের মৃতদেহ নিয়ে গৌতমও তখন ছুটছিল

প্রাণপণে ! কিন্তু দৌড়ে রাক্ষসের সঙ্গে পারবে কেন ? দেখতে দেখতে রাক্ষসের দল এসে পড়ল। তারপর গৌতমকে সবসুধ বেঁধে নিয়ে হাজির করল বিরূপাক্ষের সামনে।

রাজধর্মের মৃতদেহ বুকে নিয়ে বিরূপাক্ষ হায়-হায় করে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে লাগল সারা দেশ। অন্তিম সময়ে বন্ধুর অসহায় করুণ মুখখানি তাঁর যতই মনে পড়তে লাগল, বিষম শোকে রাক্ষসরাজ ততই অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে দারুণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে আদেশ দিলেন—"এই কৃতঘ্ন দুর্জনকে এখনই বধ কর। এর মাংস খেতে দাও রাক্ষসদের।"

রাজার আদেশ শুনে গৌতম ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। নাক মলল, কান মলল। সবার হাতে পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল বার বার। এমনি সময় ভীষণদর্শন রাক্ষসেরা এসে হাজির হল রাজার কাছে। করযোড়ে মাথা হেঁট করে তারা বলল—"মহারাজ, এই কৃতঘ্নের মাংস খাবার জন্যে আমাদের আদেশ করবেন না। ও দেহ আমরা খেতে পারব না! ওকে দস্যুদের হাতে দিন।"

বিরূপাক্ষের আদেশে রাক্ষসেরা তখন গৌতমকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে দস্যুদের খেতে দিল। কিন্তু দস্যু তো দূরের কথা, পোকামাকড়ও পর্যন্ত সেই বন্ধু-হত্যাকারীর দেহের মাংস স্পর্শ করল না।

তারপর বিরূপাক্ষের আদেশে রাজোচিত মর্যাদায় রাজধর্মের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন হল। শোকার্ত রাজপুরীর চোখের জলের মাঝে জ্বলে উঠল চিতার আগুন। বন্ধুশোকে বিরূপাক্ষ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

ওদিকে, সেই নিদারুণ সংবাদ জননী সুরভির কানে যেতে তিনিও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর ছুটলেন পাগলিনীর মত—যেখানে আগুনে গ্রাস করেছে তাঁর সন্তানের শেষ চিহ্ন। হাহাকার করে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে এসে দাঁড়ালেন চিতার উপরে। সারা দেহ তাঁর কাঁপতে লাগল। পুত্রস্নেহাতুর অন্তর শোকে তাপে মথিত হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দুধের ফেনা। কিন্তু সে তো শুধু ফেনা নয়, সে যে জননীর স্নেহরসে জারিত মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধা চিতার উপরে পড়তেই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। দেখতে দেখতে চিতার আগুন নিভে গেল। আর মায়ের সেই স্নেহ-সুধার স্পর্শে রাজধর্ম প্রাণ ফিরে পেয়ে, যেন গভীর ঘুম থেকে আবার জেগে উঠলেন। আবার ফিরে এল তার পূর্বের সেই রূপ ও স্বাস্থ্য।

বিরূপাক্ষ ছুটে গিয়ে রাজধর্মকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই, হঠাৎ দেবরাজ

ইন্দ্র এসে দেখা দিলেন সেখানে। বিরূপাক্ষ ও রাজধর্ম, পৃথিবীর দুই অনুপম শ্রেষ্ঠ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মৃদুমধুর হেসে তিনি বললেন—"পৃথিবীতে তোমাদের এ বন্ধুত্বের তুলনা নেই। বড় সুন্দর, বড় অনুপম। আর রাজধর্ম! তোমার আতিথেয়তাও অতুলনীয়। বড় খুশী হয়েছি। বর চাও তুমি।"

ইন্দ্রকে প্রণাম করে রাজধর্ম বললেন—"আমার উপর যদি সত্যিই খুশী হয়ে থাকেন দেবরাজ, তাহলে বর দিন, আমার পরম বন্ধু গোতম যেন এখনি বেঁচে ওঠেন।"

রাজধর্মের প্রার্থনা শুনে ইন্দ্র চমৎকৃত হলেন। বিস্ময়ে চমকে উঠল সর্বলোক। ইন্দ্র তখুনি পূরণ করলেন তাঁর প্রার্থনা। অমৃত ছিটিয়ে দিলেন গোতমের দেহের মাংসের উপরে।

জীবন ফিরে পেয়ে গোতম উঠে বসল, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল সকলের দিকে। মুখে সে কত দুঃখই না প্রকাশ করল! রাজধর্মের কাছে কত ক্ষমাই না চাইল। কিন্তু সে সবই ছিল তার ভান। অন্তরে তার গ্লানি বা অনুতাপের লেশও ছিল না। সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে। রাজধর্ম সবই বুঝলেন। ব্যথিত কণ্ঠে তিনি বিদায় দিলেন গোতমকে।

গোতম যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবার সেই ধনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মরি-বাঁচি করে ছুটল সে—যেখান থেকে এসেছিল। বাকি জীবনে সে এতটুকু সুখ শান্তি পেল না, শেষজীবন কাটল তার নিদারুণ দুঃখযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে। মরণের পরেও সে নিষ্কৃতি পেল না। মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নের দল নরকে যে দুঃসহ শাস্তি ভোগ করে, সে-ও তাই ভোগ করতে লাগল অনন্তকাল ধরে।

আর, রাজধর্ম ও বিরূপাক্ষের জীবনে এল অফুরন্ত সুখ ও শান্তি। জীবন তাঁদের কাটতে লাগল আগের মতই নিবিড় ভালবাসায়। ফুলের মত তাঁদের খ্যাতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীময়।

ছাতা ও জুতার উৎপত্তি

সে কোন্ এক যুগের কাহিনী—ইতিহাস সেখানে নীরব। তখন ভারতবর্ষে ছিল কত আশ্রম-তপোবন। মুনি-ঋষিরা বাস করতেন সেখানে। তাঁরা তপস্যা ও যাগযজ্ঞ করতেন, বেদপাঠ ও শাস্ত্র আলোচনা করতেন, আর বিদ্যা দান করতেন সকলকে।

সেই সময় ভারতবর্ষে ছিলেন এক মহর্ষি—নাম জমদগ্নি। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রেণুকা। জমদগ্নি যাগ-যজ্ঞ-তপস্যায় যেমন ছিলেন সকলের নমস্য, তেমনি ধনুর্বিদ্যাতেও তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তীর ধনুক চালনা করবার সুযোগ পেলে তাঁর আর আনন্দের সীমা থাকত না। অবসর পেলেই তীরধনু নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন, মনের সুখে তীর ছুঁড়তেন যত্রতত্র। সে সময়ে রেণুকাকেও প্রায়ই বেরোতে হত তাঁর সঙ্গে। রেণুকার কাজ ছিল জমদগ্নি তীর ছুঁড়লে সেগুলি কুড়িয়ে আনা।

এমনি ভাবে একদিন জমদগ্নি তীরধনু হাতে বেরিয়ে পড়লেন, রেণুকাকে বললেন—"আজ আমি ভালভাবে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করব। চল, তুমি আমার তীর কুড়িয়ে দেবে।"

রেণুকা দ্বিরুক্তি না করে চললেন মহর্ষির পিছনে পিছনে। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল—দারুণ গরম। আশ্রমের বাইরে এসে জমদগ্নি উপযুক্ত স্থান বেছে নিলেন। তার পরেই শুরু হল তাঁর শরসন্ধান। তিনি তীর ছোঁড়েন একের পর এক, আর রেণুকা ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনেন সে তীর। জমদগ্নি আবার টংকার দেন ধনুকে, তীর গিয়ে পড়ে আরও দূরে, রেণুকা আবার ছোটেন তীরের পিছনে পিছনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জমদগ্নি খেলায় মেতে উঠলেন।

ধনুকের টংকারে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে, তীর গিয়ে পড়ছে আরো আরো দূরে। ভারী মজা লাগছে জমদগ্নির। একমনে তিনি তীর ছুঁড়ছেন,

আর মাঝে মাঝে রেণুকাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—"তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু, দেরি কোর না।"

এইভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার কোনো দরকার ছিল না। একে তো স্বামীর আদেশ, তার উপর জমদগ্নির মত ঋষির কথা। রেণুকার সাহস কি যে এতটুকু দেরি করেন, সাধ্য কি যে সে-আদেশ অমান্য করেন! তাই যত পরিশ্রমই হোক না কেন, উঠি-পড়ি করে তাঁকে ছুটতে হয়।

এদিকে বেলা যতই বাড়তে থাকে, ততই বাড়তে থাকে রোদের তাপ, আর ততই ঘন ঘন টংকার পড়ে জমদগ্নির ধনুতে। কিছু সময়ের মধ্যেই রেণুকা হাঁপিয়ে পড়লেন। পরিশ্রমে আর রোদের তাপে তখন তিনি গলদ্‌ঘর্ম।

দেখতে দেখতে সূর্যদেব মাথার উপরে উঠলেন। রোদের সে কী প্রচণ্ড তাপ! একে তো জ্যৈষ্ঠ মাস, তায় ভর-দুপুর বেলা। মার্তণ্ডদেব যেন আগুন ছড়াতে লাগলেন পৃথিবীর উপরে। মাটি ফেটে ফুটে চৌচির হল।

কিন্তু ক্লান্তি নেই জমদগ্নির, খেয়ালও নেই কোনো দিকে। ধনুকে তিনি টংকারের পর টংকার দিচ্ছেন, তীর ছুটছে শাঁ শাঁ শব্দে, আর মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছেন—"দেরি কোর না, লক্ষ্মীটি। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তীর ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ঠায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

কিন্তু ছোটা তো দূরের কথা, রেণুকা তখন আর হাঁটতেই পারছিলেন না। প্রচণ্ড তাপে মাটি এমন গরম হয়ে উঠেছে যে, পা রাখা দায়, মাথার তালুও ফেটে যাবার মত অবস্থা। কিন্তু রেণুকা নিরুপায়—না গিয়ে কোন উপায় নেই। কোথায় কোন্ দূরে দূরে গিয়ে পড়ছে তীরগুলো—দুপুর রোদ মাথায় করে সে সব খুঁজে কুড়িয়ে আনা যে কত কঠিন, মহর্ষি তা একবারও ভাবছেন না। ভাববার কি ছাই তাঁর অবকাশ আছে!

ঘামে রেণুকার সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। সেই কোন্ সকাল থেকে শুরু হয়েছে দৌড়ঝাঁপ। তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাই একটু বিশ্রামের জন্যে তাড়াতাড়ি টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালেন এক গাছের নীচে।

কিন্তু বিশ্রাম তো বিশ্রাম—কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। মহর্ষি হয়তো এতক্ষণে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। রেণুকা তাই আর দাঁড়ালেন না। তাড়াতাড়ি তীরগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটলেন। স্বামীর কাছে গিয়ে দেখলেন, যা আশংকা করেছিলেন, তা-ই ঘটেছে। জমদগ্নি মুখ আঁধার করে দাঁড়িয়ে আছেন। রেণুকাকে দেখেই রাগে ফেটে পড়লেন—"কী! এত দেরি হল যে! করছিলে কি, এ্যাঁ?"

স্বামীর মূর্তি দেখে রেণুকার মুখ শুকিয়ে গেল, ভীতকণ্ঠে বললেন—"এই প্রচণ্ড রোদে মাটিতে পা রাখা দায়, মাথার তালুও যেন পুড়ে যাচ্ছিল,

চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। তাই একটু বিশ্রামের জন্যে কয়েক মুহূর্ত গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমার উপর রাগ করবেন না, ইচ্ছে করে আমি দেরি করিনি।"

রেণুকার কথা শুনে আর তাঁর চোখমুখের অবস্থা দেখে জমদগ্নির সব রাগ গিয়ে পড়ল সূর্যদেবের উপর। বললেন—"বটে! সূর্যের এত স্পর্ধা যে, আমার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়। তাকে আজ আমি পেড়ে নামাবো আকাশ থেকে।" বলেই ধনুকে তিনি টংকার দিলেন।

সূর্যদেব প্রমাদ গণলেন। তাড়াতাড়ি এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে জমদগ্নির কাছে এসে প্রণাম করে বিনীতভাবে বললেন—"মহর্ষি, সূর্যের উপর আপনি অযথা রাগ করছেন। তিনি আপনার কী ক্ষতি করেছেন? তিনি তো কারো অমঙ্গল করেন না। সব কিছুই করেন সকলের মঙ্গলের জন্যে। এই দেখুন না—জীব আর প্রাণিজগতের যাতে কল্যাণ হয়, সেজন্যে তিনি নিজের তেজের দ্বারা পৃথিবী থেকে জলীয় পদার্থ অর্থাৎ রস শুষে নেন, বর্ষার সময় সেই রস আবার বৃষ্টির আকারে ঢেলে দেন পৃথিবীতে। তার ফলে, ফুল-ফল লতা-পাতায় পৃথিবী হেসে ওঠে—শস্যের সমারোহ জাগে পৃথিবীর বুকে। সুখী মানুষের ঘরে ঘরে পূজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ আর আনন্দ-অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে যায়। সুতরাং এমন যে সূর্য, তাঁকে আকাশ থেকে টেনে নামালে আপনি ভাল করবেন, না মন্দ করবেন—একবার ভেবে দেখুন। জগৎসংসারের তাহলে কি মহা সর্বনাশ ঘটবে না? তাই আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি নিরস্ত হোন—সূর্যকে তীরবিদ্ধ করবেন না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সূর্যদেব যতই অনুনয়-বিনয় করেন, জমদগ্নিকে যতই শান্ত করার চেষ্টা করেন, জমদগ্নির রাগ যেন ততই বাড়তে থাকে। শেষে না পেরে সূর্য বললেন—"আচ্ছা মহর্ষি, তা না হয় হল। কিন্তু সূর্যকে আপনি তাক করবেন কিভাবে? সূর্য তো সব সময়েই আকাশ-পথে ভ্রমণ করছেন, স্থির নন এক মুহূর্তের জন্যেও—আপনি সেই অস্থিরচঞ্চলকে কিভাবে তীরবিদ্ধ করবেন?"

জমদগ্নি এবার রাগে ফেটে পড়লেন, হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—"থামো থামো, আর চালাকি করতে হবে না। নিজের জন্যে নিজে এসেছ ওকালতি করতে—তা-ও আবার ছদ্মবেশে। তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি? ব্রাহ্মণের বেশ ধরে ঠকাতে এসেছ আমাকে? শাস্তি তোমাকে আমি দেবই। এত বড় স্পর্ধা তোমার যে, আমার স্ত্রীকে কষ্ট দাও! আজ দেখব, তোমার কত তেজ! আর কখন তুমি স্থির, কখনই বা অস্থির—ভাবছ, তা বুঝি আমার জানা নেই। একমাত্র দুপুরবেলায় যে তুমি মাঝ আকাশে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম কর—সে কি আর জানি না, মনে কর? সেই সময়

রেণুকার কথা শুনে······জমদগ্নির সব রাগ গিয়ে পড়ল সূর্যদেবের উপর।
বললেন "বটে!······নামাবো আকাশ থেকে।" [পৃষ্ঠা ২৬]

তোমাকে আমি তীর মেরে মাটিতে ফেলব।" বলেই জমদগ্নি ধনুকে টংকার দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

এবার সূর্যদেব সত্যিই ভড়কে গেলেন। ভয়ে তাঁর বুক কেঁপে উঠল। যে তেজী ঋষি আর যে রকম বদ্‌রাগী, তাতে কখন কি করে বসেন, ঠিক কি? তাই তাড়াতাড়ি তিনি জমদগ্নিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে করযোড়ে বললেন—"মহর্ষি, ক্ষমা করুন আমাকে। আমি আপনার শরণাগত। যে অন্যায় করেছি, তার জন্যে অনুতপ্ত। আমাকে আপনার ক্ষমা করতেই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে আগুনে যেন জল পড়ল। জমদগ্নির রাগ যেমন দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি নিভেও গেল আবার দপ্‌ করে। তিনি হেসে ফেললেন। ধনুক নামিয়ে বললেন—"তাহলে আর কি বলব! তুমি যখন শরণই নিলে, তখন আর বলবার কিছু নেই। আর যাই হোক, শরণাগতের উপর তো আর রাগ করা চলে না! আচ্ছা যাও—এবারের মত তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু তার আগে এমন একটা ব্যবস্থা করে যাও, যাতে তোমার তেজে রেণুকার চলাফেরায় কোনো কষ্ট না হয়।"

সূর্যদেবের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জমদগ্নিকে একজোড়া চটি আর একটা ছাতা দিয়ে তিনি বললেন—"মহর্ষি, আপনার দয়াতেই পৃথিবীতে এই প্রথম ছাতা ও জুতা এল। ছাতা মাথায় দিয়ে, পায়ে জুতা পরে চললে, আমার তেজে আপনার স্ত্রীর আর কোনো কষ্ট হবে না। এখন আমায় বিদায় দিন।" এই বলে সূর্যদেব অন্তর্হিত হলেন।

কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা তিনি করে গেলেন যে রোদের হাত থেকে রেণুকাই শুধু নন, সব মানুষই সর্বকালের জন্যে রেহাই পেয়ে গেল। সেই কোন্‌ আদি যুগে ছাতা ও চটির সেই যে প্রথম প্রচলন হল, তারপর থেকে তা আর বন্ধ হয়নি কখনো, দিন দিন বেড়েই চলেছে—ছাতা ও চটির অধিষ্ঠান হয়েছে প্রতিটি মানুষের ঘরে। যুগে যুগে তাদের চেহারা পালটেছে, আরো সুন্দর হয়েছে, রূপের বাহারে তোমার আমার সকলের মন হরণ করেছে। তবু কিন্তু আদ্দিকালের সেই ছাতা ছাতাই আছে, জুতো জুতোই আছে।

ব্যাধ ও কপোত-কপোতী

পুরাকালে কোনো এক সময়ে ভারতবর্ষে বাস করত দুর্দান্ত এক ব্যাধ। তার চেহারা ছিল যমদূতের মত। গায়ের রঙ ছিল ঘোর কালো। আর বিকট মুখটা ছিল হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড। আর সেই বিকট মুখে ভাঁটার মত জ্বলত টকটকে লাল চোখ দুটো।

দেখতে সে ছিল যেমন কুৎসিত, তার স্বভাবও ছিল তেমনি কদর্য নির্মম। নিষ্ঠুরতায় আর দুষ্কর্মে তার জুড়ি ছিল না। নানা রকম বীভৎস কাজ সে এত সহজভাবে করত যে, শুনেই লোকে শিউরে উঠত। একমাত্র নিজের স্ত্রী ছাড়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কেউই তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখত না।

সে ছিল বনের নিষাদ। বনে বনে ঘুরে জাল পেতে সে পাখি শিকার করত। আর নিজের উদরান্নের সংস্থান করত সেই সব মরা পাখি বিক্রি করে। বলতে গেলে এইটাই ছিল তার একমাত্র জীবিকা।

এইভাবে তার দিন কাটছিল মন্দ নয়। সারা জীবনই হয়ত কেটে যেত। এমন সময় হঠাৎ একদিন কি ঘটল, শোন।

রোজকার মত সেদিনও ব্যাধ বনে গিয়েছিল শিকার করতে। পাখির খোঁজে এ বন সে বন ঘুরে সে ঢুকল এক গহন বনে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন সে আদিম মহারণ্য! যুগ-যুগান্তের মহীরুহ সব গায়ে গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাধ সেখানে ঘুরতে লাগল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। তার কাঁধে জাল, হাতে রয়েছে লাঠি, খাঁচা আর লোহার শলাকা। এমন সময় হঠাৎ আকাশের দিকে নজর পড়তেই ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল।

দেখল, দুর্যোগের ঘনঘটায় নিকষকালো আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। নিথর অরণ্যের বুকেও নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার।

দেখতে দেখতে দুর্যোগ ভেঙে পড়ল অরণ্যের মাথায়। ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হল অরণ্যের বিষম মাতামাতি। বনের এমন ভয়ঙ্কর চেহারা ব্যাধ জীবনে দেখেনি। অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে ঘন ঘন। বিষম গর্জন করে বাজ পড়ছে মুহু মুহু। বড় বড় মহাবৃক্ষ সব উপড়ে পড়ছে,

ভেঙে পড়ছে ঝড়ের ঝাপ্‌টায়। বৃষ্টির জলে সারা বন জলে জলময়। আর তারি মাঝে বুনো পশুর দল প্রাণের ভয়ে চারিদিকে বন তোলপাড় করছে।

ঝড়-জলে ভিজে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে অসহায় ব্যাধও ছুটতে লাগল দিশেহারা হয়ে। সর্বাঙ্গ তার কেটেকুটে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু সেদিকে তখন তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

জনহীন অন্ধকার মহাবন। একলা ব্যাধ সেখানে আশ্রয় খুঁজতে লাগল ঝোপঝাড়ের মাঝে আর গাছের তলায়। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল, গাছের নীচে পড়ে আছে এক কপোতী—শীতে প্রায় আধমরা হয়ে।

পাখি দেখেই ব্যাধ থমকে দাঁড়াল, ভুলে গেল সব কিছু! কপোতীকে খপ্‌ করে ধরে পুরে ফেলল খাঁচার মধ্যে। নিজে সে এত বিপন্ন, প্রাণভয়ে এত দিশেহারা, তবু আধমরা মূক পাখিটির জন্যে মনে তার এতটুকু করুণা জাগল না।

কিছুকাল পরে ঝড়-জল থেমে আকাশ পরিষ্কার হলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাধ এসে দাঁড়াল এক গাছতলায়। মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত মেঘমুক্ত আকাশ। রাত্রি নেমেছে অরণ্যের বুকে। বাড়ি তার সেখান থেকে বহুদূর। তাই উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা সেই গাছের নীচেই সে রাত্রি কাটানো স্থির করল। তারপর পাতা-ডালপালা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ভয়ে ভয়ে।

সেই গাছেরই এক উঁচু ডালে পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে বাস করত এক কপোত। কোন্ সকালে স্ত্রী তার বেরিয়ে গেছে খাবারের খোঁজে। তারপর এত রাত হল—কিন্তু এখনো সে ফিরে এল না। কপোত সেই বিকাল থেকে তার পথ চেয়ে বসে আছে। আর দুর্যোগের সময়ে নীরবে চোখের জল ফেলেছে।

তারপর দুর্যোগের পরেও কপোতী যখন ফিরে এল না, তখন ধৈর্যের বাঁধ তার ভেঙে গেল। কপোতীর কথা স্মরণ করে শোকে দুঃখে আকুল হয়ে সে বিলাপ করতে লাগল—হায় হায়, কোথায় গেল কপোতী? আর কি সে ফিরে আসবে? ঝড়ে জলে নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ ঘটেছে, নয়তো এত রাত তো সে কখনো করে না

কপোতের করুণ কান্না আকুল হয়ে ফিরতে লাগল শব্দহীন মহারণ্যে।

এখন, সেই গাছের তলায় ব্যাধের খাঁচায় আটক রয়েছে যে কপোতী, সে-ই ছিল কপোতের স্ত্রী। গাছের উপরে স্বামীর কান্না শুনে অভাগিনী ছটফট করতে লাগল নীচে খাঁচার মধ্যে। শেষে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করে বলল—"আমার জন্যে শোক কোর না। তুমি বেঁচে থাকলে আবার সুখী হতে পারবে। কিন্তু নিজের দুঃখে আত্মহারা হয়ে কর্তব্য ভুলে যেও না। এই ব্যাধ আজ তোমার অতিথি—শরণাগত। তোমারি

তারপর প্রজ্বলিত হুতাশন তিনবার প্রদক্ষিণ করে হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে ঝাঁপ দিল তার মধ্যে। [পৃষ্ঠা ৩৩]

গাছের নীচে সে আশ্রয় নিয়েছে। বড় কষ্ট পাচ্ছে শীতে। তাই ভালভাবে অতিথি সৎকার করা, ব্যাধের সেবা করাই এখন তোমার প্রধান কাজ। আমার কথা ভুলে যাও। ব্যাধের খাঁচা থেকে আমার মুক্তি নেই।"

কপোতীর কথা কানে যেতেই কপোত তখনি গাছ থেকে নেমে এল। খাঁচার মধ্যে অসহায় সঙ্গিনীকে আবদ্ধ দেখে কেঁদে উঠল হাহাকার করে। শেষে চোখের জল মুছতে মুছতে ব্যাধের কাছে গিয়ে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—"আপনি আজ আমার অতিথি। শাস্ত্রমতে অতিথি সেবা করার মত মহাপুণ্য আর নেই। অতিথি শত্রু হলেও তাকে বিন্দুমাত্র অনাদর করা অন্যায়—মহাপাপ। এখন বলুন, আপনার কি উপকার আমি করতে পারি। আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

শীতে তখন ব্যাধের হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরেছিল। কপোতের ভদ্র আচরণ ও মিষ্ট কথায় সে উঠে বসল, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—"তোমার কথায় বড় খুশী হলাম, কপোত। বিশেষ কিছু চাই না। ঝড়ে জলে ভিজে শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। এর কোনো ব্যবস্থা করতে পার ?

ব্যাধের কথা শুনে কপোত তখুনি গাছতলার শুকনো পাতাগুলো এনে এক জায়গায় জড়ো করল, তারপর তাড়াতাড়ি উড়ে গিয়ে কোথা থেকে একখন্ড জ্বলন্ত অঙ্গার এনে আগুন ধরিয়ে দিল পাতার স্তূপে। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। আগুনের তাপে হাত-পা সেঁকে ব্যাধের যেন নবজন্ম লাভ হল। সে চাঙ্গা হয়ে পরম আরামে নড়েচড়ে বসল। শীতের দাপটে এতক্ষণ পেটের কথা মনে ছিল না। শীত ছাড়তেই পেটের চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। পাতার আগুনের চেয়েও শতগুণ জোরে জ্বলে উঠল খিদের আগুন।

হৃষ্টপুষ্ট কপোতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল—"কপোত, যে উপকার করলে তার জন্যে তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু খিদের জ্বালায় যে মরে গেলাম। কিছু খেতে দিতে পার ?"

বনের পাখি সে—কি খেতে দেবে ? অথচ খিদের সময় অতিথিকে বিমুখ করাও মহাপাপ। নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কপোত বলল—'ঘরে তো আমার কিছুই নেই। বনের বাসিন্দা আমরা —দিনের খাদ্য যোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিছুই সঞ্চয় থাকে না।"

বলতে বলতে কপোত হঠাৎ থেমে গেল, ডুবে গেল কী এক গভীর ভাবনায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হল বৃক্ষতল। নীরব মহারণ্য যেন হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। তারপরেই হাসিতে ঝলমল করে উঠল কপোতের চোখমুখ। তেমন অপরূপ হাসি ব্যাধ জীবনে আর কখনো দেখে নি।

মধুর কণ্ঠে কপোত বলল—"ভাববেন না আপনি। আপনার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা আমি এখুনি করছি।"

এই বলে সে আরো কিছু শুকনো পাতা এনে আগুনে ফেলতেই আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল হুতাশন। কপোত মনে মনে কপোতীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিল। তারপর প্রজ্বলিত হুতাশন তিনবার প্রদক্ষিণ করে হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে ঝাঁপ দিল তার মধ্যে। কপোতী হাহাকার করে উঠল, পাগলিনীর মত মাথা কুটতে লাগল, আর খাঁচার গায়ে ডানার ঝাপ্টা মারতে লাগল বারবার।

আর ব্যাধ? বিস্ফারিত চোখে আগুনের দিকে বোবার মত ফ্যাল ফ্যাল করে সে চেয়ে রইল। আকস্মিক কোনো তীব্র আঘাতে মানুষ যেমন এক মুহূর্তে বোধশক্তি সব হারিয়ে ফেলে, ব্যাধও তেমনিভাবে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই ডুকরে কেঁদে উঠল অবোধ শিশুর মত। এতদিনের এত নিষ্ঠুর কাজে চোখের পাতা যার একবারও এতটুকু কাঁপেনি, সন্তানের মৃত্যুতেও যার এক ফোঁটা চোখের জল পড়েনি, সে আজ গাছে মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগল কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়! খাঁচা খুলে কপোতীকে সে তখুনি ছেড়ে দিল। স্বামীশোকে জ্ঞানহারা কপোতী তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর ব্যাধ? কোথায় গেল তার খাওয়া দাওয়া! উন্মাদের মত যা কিছু সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যাধ উঠে দাঁড়াল, তারপর অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে হায় হায় করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলল—যেদিকে দু চোখ যায়। অন্তরের অনুশোচনায় নতুন মানুষটি যাত্রা করল নতুন জীবন-পথে।

সগর রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞ

ধীরে বইছে সরযূ নদী।

সরযূর তীরে অযোধ্যা নগরী! হাসিকান্নার কত স্মৃতি, কত ইতিহাস বুকে নিয়ে অযোধ্যা আজো দাঁড়িয়ে আছে। অযোধ্যা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে অতি দূর অতীত দিনের, হাজার হাজার বছর পিছনের।

অযোধ্যা স্বপ্ন দেখছে···

শান্ত সরযূর তীর। সরযূর কূলে কূলে শাল-তমাল, বট-অশ্বত্থ আর বিল্ব-কিংশুকের বনভূমি, মুনি-ঋষিদের ছায়াঘন আশ্রম-তপোবন, স্নিগ্ধসুন্দর গ্রাম ও জনপদ, দিগন্ত-জোড়া সবুজ ফসল ও গোচারণ-ভূমি, আর—ধনে জনে ভরা সৌধনগরী মনোহর অযোধ্যাপুরী।

মহারাজ সগর তখন অযোধ্যার সিংহাসনে। রূপে গুণে, শৌর্যে বীর্যে তাঁর তুলনা নেই। রাজার দুই রানী। বড় রানীর এক ছেলে, নাম অসমঞ্জ। ছোট রানীর ছেলে অনেক—সংখ্যায় ষাট হাজার।

এতগুলি শক্তিমান ছেলে—রাজার আনন্দ হবার কথা। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই। ছেলেরা সবাই বড় হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হয়নি একটাও। তাদের মধ্যে বড় ছেলে অসমঞ্জ সব চেয়ে দুরাচার, সবচেয়ে নিষ্ঠুর। এমন কোন অন্যায় বা পাপ কাজ ছিল না, যা সে করতে পারত না। তার অনাচারে অযোধ্যায় শান্তি ছিল না। পুরবাসী প্রজাদেরও তাই অভিযোগের অন্ত ছিল না।

রত্নজালবিজড়িত অযোধ্যার রাজপুরী—শুভ্র মেঘের মত সুন্দর। সেদিন রাজসভায় রত্নসিংহাসনে মহারাজ সগর বসে আছেন। বিষণ্ন রাজা নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় তাঁর কানে এল হাজার কণ্ঠের তুমুল কোলাহল। শোকবিহ্বল প্রজারা এসে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল রাজার কাছে।—

নগরের যত কিশোর ও শিশু, তাদেরই ছেলেমেয়ে, খেলা করছিল সরযূ-তীরে, এমন সময় মূর্তিমান সর্বনাশের মত কোথা থেকে এল কুমার অসমঞ্জ। শিশুদের সব ধরে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল গভীর জলে। হায় হায় হায়!—কোন্ অতলে কত যে মানিক হারিয়ে গেল!

শোকে মুহ্যমান প্রজাদের চোখের জলে ভিজে গেল রাজসভা।

আতঙ্কে সগর শিউরে উঠলেন। এত নির্মম, এত অনাচারী অসমঞ্জ! নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত তিনি বসে রইলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁকে বড় বিচলিত মনে হল। তার পরেই অসমঞ্জ বিতাড়িত হল রাজ্য থেকে, নির্বাসিত হল চিরতরে।

অযোধ্যা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

আর অযোধ্যার বৃদ্ধ রাজা পুত্রশোকাতুর সগর?—দিন তাঁর কাটে বটে, কিন্তু অন্তরের দাবদাহ অহরহ জ্বলে তুষের আগুনের মত। পিতৃহৃদয় কাঁদে সন্তানের শোকে—হায়রে! কোথায় চলে গেল অভিমানী দুর্ভাগা সন্তান!

রাজার সব কিছু আশা-ভরসা ন্যস্ত এখন অংশুমানের উপর। অসমঞ্জের একমাত্র ছেলে অংশুমান। যেমন সে তেজস্বী ও মহাবল, তেমনি সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী ও বিনয়ী। অংশুমানই অযোধ্যার রাজবংশের সুযোগ্য বংশধর—প্রজাদের পরম স্নেহের পাত্র। ষাট হাজার ছেলের উপর রাজার এতটুকু আস্থা নেই। অসমঞ্জের চেয়ে তারা কম দুর্দান্ত নয়। তাদের দাপটে মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারা পর্যন্ত সুস্থির নন। দেবরাজ ইন্দ্রের আসনও টলে উঠেছে। সগর রাজার বুক কাঁপে ছেলেদের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায়। অনেক ভেবে শেষে তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন।

সগর রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করবেন—শুরু হল এক বিরাট আয়োজন। যেমন যজ্ঞ, তেমনি তার রাজসিক ঘটা। দেশে দেশে রটে গেল সে খবর।

সুবিশাল যজ্ঞভূমি সুসজ্জিত হল। দিগ্‌দিগন্ত থেকে শিষ্যবর্গ নিয়ে কত মুনি-ঋষি এলেন অনুগত রাজারা এলেন সৈন্যসামন্ত আর নানা উপহার নিয়ে। যজ্ঞশালায় জমায়েত হল সব বর্ণের লক্ষ লক্ষ মানুষ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, কোন বর্ণই বাদ রইল না। সকলেরই স্বচ্ছন্দে থাকা-খাওয়ার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হল। তুমুল কোলাহলে কান পাতা দায়। দান-ধ্যান-ভোজন চলল দিনরাত। এত লোক—তবু এতটুকু ত্রুটি রইল না কোথাও।

তারপর এক শুভ দিনে মন্ত্র পড়ে সগর রাজা সুলক্ষণ এক ঘোড়ার কপালে নিজের পরিচয় লিখে ছেড়ে দিলেন। ঘোড়াকে বিপদ-আপদে রক্ষা করবার ভার পড়ল ষাট হাজার কুমারের উপর। ঘোড়া দেশে দেশে ঘুরবে, যেখানে খুশি যাবে। তারপর একদিন যজ্ঞস্থানে ফিরে এলে সকলের কল্যাণের জন্য মন্ত্র পড়ে তাকে আগুনে আহুতি দেওয়া হবে। তবেই সমাধা হবে অশ্বমেধ-যজ্ঞ।

কিন্তু দেশে দেশে ঘুরবার সময় ঘোড়ার পরিচয় লিখন পড়েও কোন রাজা যদি তাকে আটক করতে সাহসী হন, তাহলে ষাট হাজার কুমারের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হবে, কুমারেরা মৃত্যুপণ যুদ্ধ করবে ঘোড়া ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত। কারণ, ঘোড়া ফিরে না গেলে যজ্ঞ সমাধা হবে না। যজ্ঞ সমাধা না হওয়ার অর্থ রাজা ও রাজ্যের সকলের সর্বনাশ।

ঘোড়া রওনা হল। একে একে নির্বিঘ্নে পার হল কত দেশ। পার হল কত রাজ্যের পর রাজ্য, কত দুর্গম অরণ্য-পর্বত, ভয়ংকর কত মরু-কান্তার। সুসজ্জিত সৈন্যদল নিয়ে ষাট হাজার রাজকুমার সাবধানে চলল তাকে অনুসরণ করে। দেবরাজ ইন্দ্র কুমারদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনিও চললেন তাদের সঙ্গে—গোপনে সবার অলক্ষ্যে।

ঘোড়া এগিয়ে চলল। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে শেষে হাজির হল এসে এক দুর্গম দেশে—জলহীন শুকনো সমুদ্রের গভীর খাতে। বড় ভয়ংকর সে দেশ—দিনেও সেখানে রাজত্ব করে প্রদোষের আবছায়া অন্ধকার। রাজকুমারেরা খুব সাবধানে ঘোড়ার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগলেন।

এইরকম স্থানই ইন্দ্র খুঁজছিলেন। রাজকুমারেরা এক সময় মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হতেই, আবছায়া অন্ধকারের মাঝে যজ্ঞের ঘোড়া কোথায় অদৃশ্য হল।

কুমারদের মধ্যে কলরব পড়ে গেল। খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল ঘোড়া? চোখের পলকে হাওয়ায় কি মিলিয়ে গেল? চারিদিকে তারা খুঁজতে লাগল—একবার নয়—দুইবার নয়, বার বার। কিন্তু কোথায় পাবে ঘোড়া?

রাজপুত্রদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

এখন উপায়? কাপুরুষের মত কি করে তারা রাজার কাছে ফিরে গিয়ে জানাবে এই নিদারুণ সংবাদ? কি করে বলবে—সর্বনাশ হয়েছে, চুরি গেছে যজ্ঞের ঘোড়া?

আবার তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। কত কাল ধরে খুঁজল। কোন দেশের কোন জায়গাই বাকি রাখল না। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম হল। যাদুমন্ত্রে ঘোড়া যেন অদৃশ্য হয়েছে পৃথিবী থেকে।

তারপর—নিরুপায় রাজকুমারেরা ফিরে চলল রাজার কাছে। লজ্জায় ঘৃণায় তাঁরা মাটির সঙ্গে যেন মিশে গেল।

॥ ২ ॥

যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে মহারাজ সগর মন্ত্রপূতে ঘোড়ার প্রতীক্ষায় বসে আছেন, চারিদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের তুমুল কোলাহল এমন সময় রাজপুত্রেরা ফিরে

এল। ফিরে এল তারা ধীরে ধীরে নত মস্তকে। সঙ্গের সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও উল্লাস নেই, জয়ধ্বনি নেই। আর নেই সেই যজ্ঞের ঘোড়া!

মুহূর্তে থেমে গেল সব কোলাহল। স্তব্ধ যজ্ঞভূমি শুনল সে নিদারুণ সংবাদ। বজ্রাহতের মত শুনলেন মহারাজ সগর। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ক্ষুব্ধ হতাশ কণ্ঠে তিনি গর্জন করে উঠলেন—"ধিক, ধিক তোমাদের—কাপুরুষ। দূর হও আমার সামনে থেকে। স্বর্গ মর্ত্য রসাতল—যেখান থেকে পার, খুঁজে নিয়ে এস যজ্ঞের ঘোড়া। ঘোড়া না নিয়ে ফিরবে না কখনও। আর—যজ্ঞের ঘোড়া যে চুরি করেছে, তাকেও শাস্তি দেবে উচিতমত।"

হতভাগ্য ষাট হাজার কুমার আবার ফিরে চলল—যেমন এসেছিল, তেমনি নতমস্তকে। যে পথে তারা এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে গেল জলহীন সেই ভয়ংকর সমুদ্র-খাতে। দুঃখে, অপমানে ও হতাশায় মরিয়া হয়ে তারা ঠিক করল—পিতার আদেশে আগে তারা রসাতলেই যাবে। পৃথিবী বিদীর্ণ করে ঢুকবে পাতালে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এক বিষম কাণ্ড। বিরাট বিরাট খন্তা কোদাল নিয়ে রাজকুমারেরা ভীম বিক্রমে পৃথিবী খুঁড়তে আরম্ভ করল। ভয়ে কেঁপে উঠল ত্রিভুবন। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জীবজগৎ ভয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। দেব-দানব যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব-কিন্নর, ভীত সন্ত্রস্ত সবাই—যে যেখানে পারল গিয়ে আত্মগোপন করল।

সগর-সন্তানদের কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের খন্তা কোদালের হাত থেকে রাক্ষস-দৈত্য অজগর কেউই নিস্তার পেল না। শত সহস্র প্রাণীর কারও মাথা কাটা পড়ল, কারও হাত পা কাটা গেল, কারও বা দেহ থেকে চামড়া আলাদা হয়ে গেল, কারও বা আবার সর্বাঙ্গের হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হল। আর্তনাদ ও হাহাকার উঠল জগৎময়।

তারপর একদিন ষাট হাজার কুমার পাতালে প্রবেশ করল। ভয়ংকর পাতাল-রাজ্যে থমথম করছে মৃত্যুর মত স্তব্ধতা। কুমারেরা অগ্রসর হল পূব দিকে। শেষ সীমায় এসে তারা অবাক হয়ে দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক মহাকায় গজ। পর্বতের মত বিশাল তার চেহারা, নাম বিরূপাক্ষ। তাকে বলা হয় দিগ্‌গজ। অরণ্য-পর্বত সমেত পৃথিবীর পূব দিকের অংশ সে মাথায় ধারণ করে আছে। মহাভারে ক্লান্ত হয়ে দিগ্‌গজ যখন মাথা নাড়া দেয়, পৃথিবী তখন কেঁপে ওঠে—ভূমিকম্প হয় পৃথিবীর বুকে।

রাজকুমারেরা তাকে সম্মান দেখিয়ে দক্ষিণ দিকে খুঁড়ে চলল। সেখানে তাদের দেখা হল মহাপদ্ম নামে দিগ্‌গজের সঙ্গে। তারপর একে একে তারা গেল পশ্চিম ও উত্তর দিকে। সেখানেও দেখতে পেল সুমনা ও ভদ্র নামে দুই দিগ্‌গজকে। কিন্তু যজ্ঞের ঘোড়ার সন্ধান মিলল না কোথাও।

এখন তারা কোথায় কোন্ দিকে যাবে? ঘোড়া না নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পথও বন্ধ। ক্লান্ত নিরুপায় কুমারেরা মরিয়া হয়ে পাতালের উত্তর-পূব কোণ খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই। শেষে অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়াল। সবিস্ময়ে দেখল—এক তপস্বী ধ্যানে মগ্ন, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতই তাঁর তেজ; আর তারই অদূরে চরছে তাদের যজ্ঞের ঘোড়া। এতদিনের হারানিধি খুঁজে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল কুমারেরা। সঙ্গে সঙ্গে, সেই তপস্বীই তাদের ঘোড়া চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে মনে করে, রুখে দাঁড়াল। তপস্বীর পরিচয় তারা জানত না, তাই দারুণ রাগে খন্তা-কোদাল গাছ-পাথর হাতের কাছে যা পেল, তাই নিয়ে রে-রে শব্দে তেড়ে গেল 'ভণ্ড তপস্বী'কে মারবার জন্যে।

সে তপস্বী আর কেউ নন—সকলের নমস্য, মহাতেজা মহাত্মা কপিলদেব। চীৎকার শুনে তাঁর ধ্যান ভেঙে গেল। মারমুখো কুমারদের দেখেই তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন। ক্রুদ্ধ এক হুংকার ছাড়তেই আগুন জ্বলে উঠল তাঁর দু চোখে। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। নিমেষের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ষাট হাজার সগর-সন্তান।

এক মুহূর্তেই জীবনের কলরব থেমে গেল পাতাল-রাজ্যের সেই কোণে। নেমে এল নিথর স্তব্ধতা। আর তার মাঝে পড়ে রইল ষাট হাজার ভাগ্যহীন রাজকুমারের ভস্মস্তূপ। মহাত্মা কপিল আবার ধ্যানে বসলেন। আর যজ্ঞের ঘোড়া ঘুরতে লাগল দিশেহারা হয়ে।

॥ ৩ ॥

এদিকে যজ্ঞশালায় কুমারদের পথ চেয়ে সগর বসে আছেন। উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনায় মন তাঁর বিকল। সেই কবে ছেলেরা বেরিয়েছে ঘোড়ার খোঁজে। আজও ফিরল না। শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে রাজা ডাকলেন পৌত্র অংশুমানকে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—"অংশুমান, তোমার কাকারা তো আজো ফিরে এল না। অভাগা আমি—তোমার বাবা অসমঞ্জকে হারিয়েছি। ষাট হাজার কুমারের ভাগ্যে যে কি ঘটল, তা-ও বুঝছি না। কিছুদিন যাবৎ, কেন জানি না, বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে কিসের যেন হাহাকার শুনতে পাই। তুমিই এখন আমার একমাত্র সম্বল। তাই বলছি—তোমার কাকাদের খোঁজে আর যজ্ঞের ঘোড়ার সন্ধানে একবার যাও তুমি। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যেও। তোমাকে আর বেশী কি বলব, অংশুমান! তুমি মহাবীর, বুদ্ধিমান। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। যজ্ঞ সমাধা করতে তুমিই এখন আমার একমাত্র সহায়।" এই বলে বৃদ্ধ রাজা মাথা নীচু করলেন।
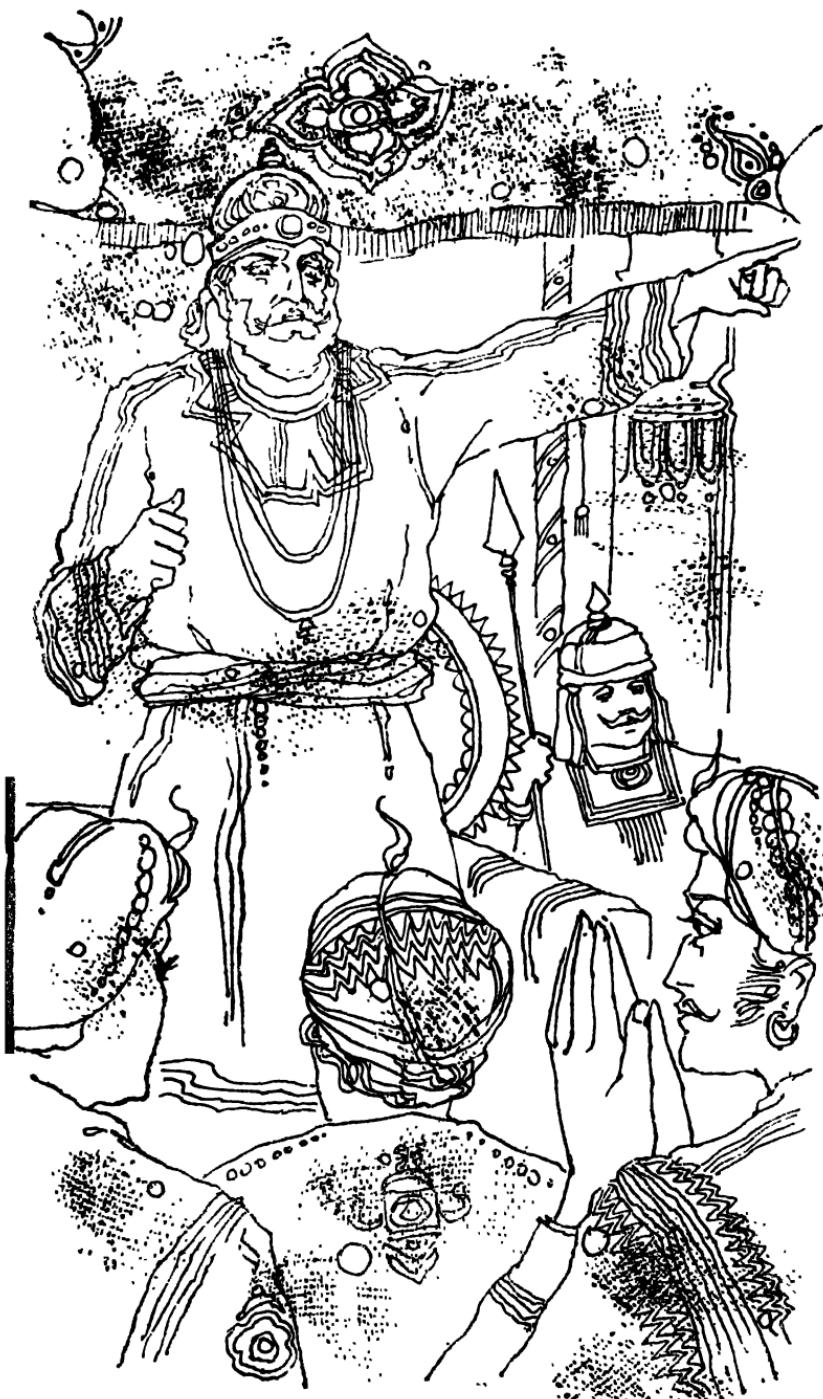
বজ্রাহতের মত শুনলেন মহারাজ সগর।……ক্ষুব্ধ হতাশ কণ্ঠে তিনি গর্জন করে উঠলেন—"ধিক্, ধিক্ তোমাদের—কাপুরুষ।…" [পৃষ্ঠা ৩৭]

অংশুমানের চোখে জল এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তখুনি সে রওনা হল। তারপর, পৃথিবীর বুক চিরে তার কাকারা যে পথে পাতালে নেমেছিল, সেই পথে সে-ও নামল পাতালে। যেতে যেতে পাতালরাজ্যে তারও দেখা হল সেই সব দিগ্‌গজের সঙ্গে। তাদের সে সম্মান দেখিয়ে কুশলবার্তার পর জিজ্ঞেস করল তাঁর কাকাদের খবর আর যজ্ঞের ঘোড়ার কথা। অংশুমানের ব্যবহারে দিগ্‌গজেরা খুব খুশী হয়েছিল। তাকে বলে দিল পথের নিশানা। আশীর্বাদ করে বলল—"কোনো ভয় নেই, কুমার। যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে নিশ্চয়ই তুমি ফিরে যেতে পারবে।"

দিগ্‌গজদের কথামত চলে বহুদূর গিয়ে অংশুমান শেষে উপস্থিত হল—মহাত্মা কপিল যেখানে তপস্যা করছেন। দেখল, যজ্ঞের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বিরাট ভস্মস্তূপ। এক নিমেষেই সে বুঝল, সর্বনাশ ঘটেছে। হাহাকার করে সে কেঁদে উঠল। নিস্তব্ধ পাতাল-রাজ্যে নিঃসঙ্গ অংশুমান কাঁদতে লাগল অসহায় শিশুর মত। অভাগা বৃদ্ধ রাজা, তার পিতামহের কথা মনে হতেই শোক যেন তার শতগুণ বেড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সে মহাত্মা কপিলের স্তব করতে লাগল করযোড়ে।

অংশুমানের স্তবে ও চোখের জলে কপিল আর স্থির থাকতে পারলেন না। চোখ মেলে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—"শোক কোরো না, অংশুমান। তোমার কাকারা নিজেদের দোষেই অকালে এভাবে জীবন হারিয়েছে। কিন্তু আমি বর দিচ্ছি, তাদের এই জীবন দান বৃথা যাবে না। তাদের সদ্‌গতি করতে গিয়ে ভবিষ্যতে পৃথিবীর খুব বড় এক উপকার হবে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা। স্বর্গলোকে তিনি আকাশ-গঙ্গা নামে প্রবাহিতা—আজো তিনি নামেন নি পৃথিবীতে। তোমারই বংশের কোনো পুরুষ কঠিন তপস্যার দ্বারা তাঁকে পৃথিবীতে আনবেন।

"গঙ্গার জলে পৃথিবী ধনে জনে পূর্ণ হবে, মানুষের ঘরে আসবে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও শান্তি। আর সেই পবিত্র জলের স্পর্শে ভস্মীভূত সগর-সন্তানেরা উদ্ধার পাবে, তাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে। যতদিন পৃথিবী থাকবে, থাকবে স্থাবর-জঙ্গম আর অরণ্য-পর্বত, ততদিন ত্রিভুবনে তোমাদের বংশের খ্যাতিও অম্লান অক্ষয় হয়ে থাকবে। শোক করো না, অংশুমান—যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে ফিরে যাও, অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ কর। আমি বলছি, তোমাদের বংশের কল্যাণ হবে। *শুধু মনে রেখো, গঙ্গার জলস্পর্শ ছাড়া তোমার কাকাদের সদ্‌গতি হবে না।*"

শোকবিহ্বল অংশুমান কপিলকে প্রণাম করে ঘোড়া নিয়ে আবার ফিরে চলল। আর পিছনে অন্ধকার পাতালের সেই নির্জন কোণে পড়ে রইল তার কাকাদের ভস্মস্তূপ।

যজ্ঞশালায় সে ফিরে এলে সগর শুনলেন সব। চোখে অশ্রু নেই এক ফোঁটা—বৃদ্ধ রাজা বসে রইলেন বোবা জড়ের মত। রাজার জন্যে কাঁদল সবাই—ছেলে বুড়ো যুবা—সমস্ত প্রজা। বৃদ্ধ রাজাকে কাঙাল করে যজ্ঞ শেষ হল এতকাল পরে।

দিন যায়। অযোধ্যার শূন্য প্রাসাদ যেন খাঁ খাঁ করে। সগরের মন প্রাণ ছটফট করে কি এক অব্যক্ত ব্যথায়। অশরীরী ছায়ার মত কারা যেন করুণ ম্লান মুখে ঘোরে তাঁর চারিপাশে।

আর কেন?—সগর শেষে একদিন অযোধ্যার সিংহাসনে অংশুমানকে অভিষিক্ত করলেন। তারপর সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে বিদায় নিলেন অযোধ্যা থেকে। দূর বনবাসে গিয়ে অভাগা সন্তানদের সদ্গতির কথা ভাবতে ভাবতে শেষে পৃথিবী থেকেও বিদায় নিলেন একদিন।

পৃথিবীতে গঙ্গা-অবতরণ

সগর রাজার মৃত্যুর অনেক কাল পরে···

ভগীরথ তখন অযোধ্যার রাজা। সগর রাজার সুযোগ্য বংশধর তিনি। তাঁর শাসনের গুণে বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকু।

কিন্তু ভগীরথের মনে সুখ নেই, রাজ্যসুখে রুচি নেই। দিনরাত কেবল এক চিন্তা, একটা কথাই কেবল ভাবেন তিনি—সেই কতকাল আগে থেকে পাতালের কোন্ এক অজানা কোণে পড়ে আছে তাঁর পূর্বপুরুষ সগর-সন্তানদের ভস্মস্তূপ। গঙ্গা আজো নামেন নি পৃথিবীতে। তাঁদের তাই আজো সদ্গতি হল না, তাঁরা উদ্ধার পেলেন না অপমৃত্যুর পাপ থেকে। কি করলে পৃথিবীর বুকে গঙ্গার অবতরণ সম্ভব হবে? কি করলে ঘুচবে তাঁর বংশের এই কলঙ্ক, এ অভিশাপ?—অহরহ এই এক প্রশ্ন অস্থির করে তোলে ভগীরথকে।

অনেক ভেবে ভগীরথ শেষে একদিন রাজসভায় এসে বসলেন। অন্য দিনের মত সাধারণ সভা সে নয়। কি এক বিশেষ সংকল্প জানাবার জন্যে তিনি আহবান করেছেন রাজ্যের যত সচিব, পুরোহিত, সভাসদ্ আর জ্ঞানী গুণী পুরবাসী প্রধানদের।

তাঁরা একে একে সবাই এসে আসন গ্রহণ করলেন। রাজসভা নীরব হলে ভগীরথ বললেন—"আপনারা জানেন, আজো আমার পূর্বপুরুষদের সদ্গতি হয়নি, কল্যাণময়ী গঙ্গার জলস্পর্শ ছাড়া সদ্গতি হবেও না। পিতামহ অংশুমান সারা জীবন ভেবেও কোনো কিনারা করতে পারেন নি। পিতা দিলীপ ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত কঠিন রোগে পড়েছিলেন। তাঁদের পরে সে কঠোর দায়িত্ব পালনের ভার পড়েছে আমার উপর। আমি ঠিক করেছি, গঙ্গাকে আনবার জন্যে হিমালয়ে যাব। গঙ্গা পৃথিবীতে না এলে আমিও আর ফিরব না। হয় আমার সংকল্প সফল হবে, না হয় এই দেহ শেষ হবে। রাজ্য-সম্পদ রইল, সে সব রক্ষণাবেক্ষণের ভার রইল আপনাদের উপর।"

রাজার এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় রাজসভায় যেন বজ্রপাত হল। রাজ-পুরীতে আর রাজ্যের ঘরে ঘরে নেমে এল অন্ধকার। অনুরোধ উপরোধ বৃথা

হল, ব্যর্থ হল চোখের জল। রাজ্য-সম্পদ, বিলাস-ব্যসন সব কিছু ত্যাগ করে তরুণ রাজা ভগীরথ একদিন অনির্দেশ ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ালেন, যাত্রা করলেন দুর্গম হিমালয়ের দিকে।

॥ দুই ॥

কত বছর কেটে গেল তারপর।

অযোধ্যা থেকে বহু দূরে গিরিরাজ হিমালয়—পৃথিবীর মেরুদণ্ড যেন। হিমালয়ের অনেক উপরে সুন্দর রমণীয় এক দেশ। বড় দুর্গম জনহীন। চারিদিকে তার তুষারশুভ্র শিখরমালা—মেঘের উপরে মহাশূন্যে উঠে গেছে কোথায় কত উঁচুতে।

সেখানে সেই নির্জন দেশে কঠোর তপস্যা করছেন ভগীরথ। কে বলবে এই সেই অযোধ্যার তরুণ রাজা? সে কমনীয় সুন্দর রূপ কোথায় হারিয়ে গেছে! মাথায় নেমেছে আজানুলম্বিত দীর্ঘ জটা। পরনে বল্কল। গৌর-কান্তি নিটোল স্বাস্থ্য আজ মলিন অস্থিসার॥

মোহন রূপ ধরে কত বসন্ত এসে বারে বারে তাঁকে ডেকে গেছে। গ্রীষ্ম এসেছে প্রচণ্ড তাপ আর খররৌদ্র নিয়ে। কত বর্ষা এসেছে—অঢেল জলের ধারা নেমেছে তাঁর মাথার উপরে। শীত এসেছে ভয়ংকর রূপ নিয়ে, তুষার ঝড়ে ঢেকে দিয়েছে সব কিছু। কিন্তু কিছুই ভগীরথকে টলাতে পারে নি। সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তরে গঙ্গাকে ডাকছেন তিনি একমনে—নীরব একাগ্রতায়। সংকল্পে তিনি স্থির, অচঞ্চল। কেউ যা পারে নি, হয় তিনি তাই সফল করবেন—গঙ্গাকে আনবেন পৃথিবীতে, না হয় এখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন।

এই ভাবে একে একে পার হল কত বছর।

তারপর আবার ঘুরে এল এক বসন্ত। তখনো ভগীরথ তপস্যামগ্ন। তাঁর পাশ দিয়ে পাহাড়ী নদী কলকল ছলছল রবে ছুটে চলেছে চঞ্চল শিশুর মত। পর্বতের গুহায় গুহায় জেগেছে হিংস্র পশুর দল। শিকারের লোভে ওত পেতে আছে সিংহ বাঘ ভালুক। গহন বন তোলপাড় করে ঘুরছে মত্ত বুনো হাতীর দল। গাছে গাছে লতায় লতায় দেখা দিল কিশলয়ের শ্যাম-শোভা, নানা রঙের নানা ফুলের বিপুল আয়োজন। ফুলের মুকুট, ফুলের আভরণ—মনমাতানো ফুলের সাজ পরলেন অরণ্যদেবী। পাখির গানে মুখরিত হল মনোহর পার্বত্য ভূমি।

অন্য দিনের মত সেদিনও ভগীরথ তপস্যায় বসেছেন। কিন্তু আজ কি যেন এক অজানা আনন্দে বারবার সারা অন্তর তাঁর ভরে উঠছে, শরীরে রোমাঞ্চ জাগছে। আনন্দের প্লাবন নেমেছে যেন বিশ্ব-জগতে। মন কিছুতেই বাধা

মানতে চাইছে না—ছুটতে চাইছে বাঁধনহারা নদীর মত। ভগীরথ বিব্রত বোধ করেন। এমন সময় হঠাৎ সেই আনন্দ-বন্যার ভেতর থেকে তাঁর কানে এল এক মধুর দেবীকণ্ঠ—"ভগীরথ চোখ খোল। আমি হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা—দেখ, এসেছি।"

ভগীরথ চমকে উঠলেন, মন চঞ্চল হয়ে উঠল—শোনার ভুল নয় তো! কিন্তু আবার কানে এল সেই অপরূপ বীণার ঝঙ্কার—"ভগীরথ, চোখ খোল। তোমার আকুল আহ্বানে স্থির থাকতে না পেরে আমি এসেছি।"

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন ভগীরথ—এ কী! এ কী অপরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তি!—দশদিক আলোয় আলোকিত! আর সেই আলোকচ্ছটার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতির্ময়ী এক মাতৃমূর্তি। ভগীরথ আত্মহারা—সব কিছু ভুলে নির্বাক নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন। মৃদু হেসে গঙ্গা বললেন—"বর চাও, ভগীরথ।"

ভগীরথ লুটিয়ে পড়লেন মায়ের পদতলে। আনন্দের আবেগে চোখে নামল অশ্রুর বন্যা। বললেন—"এসেছ, মা! এতকাল পরে দয়া হল সন্তানের উপর? বর দাও, মা—আমার সঙ্গে পৃথিবীতে যাবে তুমি। তোমার স্নেহের স্পর্শে সগর-সন্তানেরা ধন্য হবেন, মুক্ত হবেন। ঊষর পৃথিবী উর্বরা হবে, ধনধান্যে ভরে উঠবে মানুষের গৃহসংসার।"

মধুর হেসে গঙ্গা বললেন—"তাই হবে, ভগীরথ। পৃথিবীতে আমি অবতরণ করব। কিন্তু ঐ ঊর্ধ্বলোক থেকে যখন নামব, তখন পৃথিবী তো আমার সে তীব্র বেগ ধারণ করতে পারবে না। একমাত্র মহাদেবই পারেন সে বেগ ধারণ করতে। এক কাজ কর, ভগীরথ। তুমি মহাদেবের আরাধনা কর। তিনি যদি রাজী হন, তাহলেই আমার অবতরণ সম্ভব হবে।" এই বলে গঙ্গা বিদায় নিলেন।

আবার শুরু হল ভগীরথের কঠোর তপস্যা। একমনে তিনি মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও শেষ হতে চলল। ভক্তের আহ্বানে মহাদেব আর কত দিন স্থির থাকতে পারেন! শেষে একদিন কৈলাস শিখর থেকে তিনি নেমে এলেন ভগীরথের সামনে। বললেন—"আমি এসেছি ভগীরথ, বর চাও।'

মহাদেবকে প্রণাম করে করযোড়ে ভগীরথ বললেন—"প্রভু, জননী গঙ্গাদেবী আমার সঙ্গে পৃথিবীতে যাবেন, কিন্তু প্রথমে নামবার সময় পৃথিবী তো তাঁর সেই বেগ ধারণ করতে পারবেন না। আপনাকেই তা ধারণ করতে হবে।"

মহাদেব বললেন—"বেশ, তাই হবে। গঙ্গাকে নামতে বল। আমি প্রস্তুত।" বলেই হিমালয়ের মহাশৃঙ্গের মত ত্রিশূল হাতে নিয়ে দেবাদিদেব মহাদেব দাঁড়ালেন মাথার বিরাট জটাজাল বিস্তার করে।

মহাদেব বললেন—"বেশ, তাই হবে। গঙ্গাকে নামতে বল। আমি প্রস্তুত।"

[পৃষ্ঠা ৪৪]

ত্রিভুবনে সাড়া পড়ে গেল। গঙ্গার অবতরণ হবে, তিনি নামবেন পৃথিবীতে —এতকাল পরে এল সেই শুভলগ্ন। হিমালয়ের শিখরে শিখরে দুন্দুভি বাজতে লাগল। সুগন্ধ বাতাস বইল। শুরু হল অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি। দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব-কিন্নর, সবাই সমবেত হলেন দিকে দিকে। সমবেত হলেন জগতের যত শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি।

তারপর অপরূপ নাচগান আর অবিরাম জয়ধ্বনির মাঝে গঙ্গার যাত্রা শুরু হল! ঊর্ধ্বলোক থেকে, হিমালয়ের তুষারে ঢাকা আকাশ-ছোঁয়া শিখর থেকে গঙ্গা নামতে লাগলেন। তুমুল কল-কল্লোলে শিখর থেকে শিখরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল তাঁর বিপুল জলস্রোত। গঙ্গা মনে মনে ভাবলেন—"দেখব মহাদেব, কত শক্তি ধর তুমি! পৃথিবী ভাসিয়ে তোমাকে নিয়ে আমি চলে যাব রসাতলে।" তারপরেই বিপুল জলরাশি নিয়ে দুর্গম বেগে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহাদেবের জটার উপরে।

গঙ্গার অহঙ্কার টের পেয়ে মহাদেব চটে উঠলেন। মনে মনে বললেন— "বটে! তুমি রসাতলে যাবে! —আমাকে নিয়ে? আচ্ছা!"

সঙ্গে সঙ্গেই সব চুপ, চারিদিকে অন্ধকার। কোথায় গেলেন গঙ্গা! আর কোথায় মিলিয়ে গেল তাঁর সেই বিপুল জল-কল্লোল! ভীত চমকিত বিশ্ব-লোক দেখল—গঙ্গা পথ হারিয়ে ঘুরছেন মহাদেবের জটাজালের মধ্যে। বেরোবার পথ নেই।

ভগীরথ প্রমাদ গণলেন। লুটিয়ে মহাদেবের পায়ে পড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। অল্পেই তুষ্ট আশুতোষ। মৃদু হেসে গঙ্গাকে বের করে দিলেন জটাজাল থেকে। গঙ্গা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শিবকে প্রণাম করে নামলেন পৃথিবীতে। ভগীরথকে ডেকে বললেন—"ভগীরথ, পথ দেখাও।"

আগে আগে চললেন ভগীরথ, পিছনে চললেন সুরধনী গঙ্গা। আর গঙ্গাদেবীকে অনুসরণ করে চললেন জগদ্বাসী—দেবতা মানুষ মুনি-ঋষি সকলে। জলস্রোতের সঙ্গে চলল হাঙ্গর কুমীর মাছ কচ্ছপ—যত সব জলচর প্রাণী। ফেনিল জলরাশি পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফ দিয়ে ছুটে চলল— কোথাও এঁকেবেঁকে, কোথাও সরল গতিতে, কোথাও বা প্রশস্ত হয়ে, কোথাও আবার সঙ্কীর্ণ ধারায়। গাছ, পাথর, যা কিছু সামনে পড়ল, সবই ভেসে চলল খরস্রোতে।

এমন সময়ে হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। চলার পথের উপরেই ছিল জহ্নু নামে এক মুনির আশ্রম। গঙ্গা মনে মনে ভাবলেন—শিবের কাছে হার মেনেছি বটে, তাই বলে কি সাধারণ মানুষকেও আমার সমীহ করে চলতে হবে? আমি হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা—নগণ্য এই আশ্রমটাকেও কি আমার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে?

তিনি সোজা এগিয়ে চললেন। জহ্নু তখন যজ্ঞে বসেছিলেন। হঠাৎ গঙ্গার জলস্রোতে আশ্রম ভরে গেল, ভেসে গেল জহ্নুর যজ্ঞশালা। ভয়ংকর রাগে মুনি জ্বলে উঠলেন—"কী! এত বড় স্পর্ধা! গঙ্গার এত অহংকার!"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জহ্নু উঠে দাঁড়ালেন, তারপর এক গণ্ডূষে পান করে ফেললেন গঙ্গার সমস্ত জল।

হঠাৎ পিছন ফিরে ভগীরথ দেখলেন, গঙ্গার চিহ্নও নেই, জহ্নুর উদর থেকে ভেসে আসছে তাঁর কলধ্বনি। ভগীরথ হায় হায় করে উঠলেন—শেষে কি সবই পণ্ডশ্রম হল! জহ্নুকে তিনি তুষ্ট করতে শুরু করলেন নানাভাবে। দেবতা-গন্ধর্ব মুনি-ঋষি, সমস্ত বিশ্ববাসীও মুনিকে অনুরোধ করতে লাগলেন বারবার। বললেন—"মহর্ষি, সকলের মঙ্গলের জন্যে গঙ্গা পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁকে বের করে দিন। আজ থেকে তিনি আপনার মেয়ে হলেন।"

ধীরে ধীরে মুনির রাগ পড়ল। গঙ্গাকে তিনি কান দিয়ে বের করে দিলেন। জহ্নুর কন্যা বলে সেই থেকে গঙ্গার আর এক নাম হল জাহ্নবী।

ভগীরথের পিছনে পিছনে গঙ্গা আবার অগ্রসর হলেন, আরও প্রশস্তা হলেন, শেষে পড়লেন এসে জলহীন সেই ভয়ংকর সমুদ্রে! সমুদ্র জলে ভরে উঠল! সেখান থেকে গঙ্গা নামলেন পাতালে। কলধ্বনি তুলে এগিয়ে চললেন—যেখানে সগর-সন্তানদের ভস্মরাশি পড়ে আছে কত যুগ ধরে।

গঙ্গার পবিত্র স্পর্শ পেয়ে সগর-সন্তানেরা স্বর্গে গেলেন। পৃথিবী উর্বরা হল। সুখে শান্তিতে ভরে উঠল কোটি কোটি মানুষের সমাজ-সংস্কার। ধনে-জনে হেসে উঠল উত্তর ভারত—আমাদের এই প্রাচীন আর্যাবর্ত।

কাজ-শেষে বহুকাল পরে ভগীরথ আবার অযোধ্যায় ফিরলেন! দেশময় শুরু হল আনন্দ-উৎসব। তারপর পরম সুখে ভগীরথ রাজত্ব করতে লাগলেন কত কাল ধরে।

ভগীরথের চেষ্টায় গঙ্গা পৃথিবীতে নেমেছিলেন বলে গঙ্গাকে বলা হয় ভগীরথের কন্যা। গঙ্গার আর এক নাম তাই ভাগীরথী।

ভগীরথ ছিলেন সগর রাজার বংশধর। তাঁরই চেষ্টায় জলহীন সমুদ্র আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিল—জলে ভরে উঠেছিল। সমুদ্রকে তাই মনে করা হয় সগরবংশের সন্তান। আর সেই জন্যেই সমুদ্রের আর এক নাম সাগর।

পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে মনোহর বিন্ধ্যপর্বতমালা—ভারতের কটিদেশ ঘিরে আছে সবুজ মেখলার মত।

দূর অতীতের এক সময়—স্বপ্নে ঘেরা ভারতবর্ষে···

বিন্ধ্যপর্বতের কাছে ছিল শস্যশ্যামল এক সোনার দেশ—ছবির মত সুন্দর। দেশের নাম ছিল নিষধ। ধনে মানে, জ্ঞানে গরিমায় আর রাজার সুশাসনে ভারতের মধ্যে নিষধ ছিল তখন সর্বশ্রেষ্ঠ—সব রাজ্যের মুকুটমণি। নিষধের ঘরে ঘরে—তার ঘাটে মাঠে গ্রামে ও নগরে তখন হাসি ছিল, আনন্দ ছিল আর ছিল অনাবিল শান্তি।

কিন্তু শান্তি ছিল না নিষধের রাজার মনে। নিষধের রাজা নল ছিলেন বয়সে তরুণ, কিন্তু ছিলেন সূর্যের মত তেজস্বী, কন্দর্পদেবের মত রূপবান আর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বীরত্বে ও মহানুভবতায় জগতে তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ধর্মনিষ্ঠা ও উদার মিষ্ট ব্যবহারের জন্য দেবতাদের মধ্যেও তাঁর খ্যাতি ছিল অতুলনীয়।

কিন্তু কিছুকাল যাবৎ তাঁর মনে এসেছে এক ভাবান্তর। রাজকার্যে, আমোদ-আহ্লাদে, তাঁর মন নেই। এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহও তিনি ত্যাগ করেছেন। শেষে কিছু দিন হল আশ্রয় নিয়েছেন রাজোদ্যানে। সেখানে নির্জনে তিনি একলা থাকেন, আর কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন দিনরাত।

তাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তর ও অস্থিরতা দেখে রাজসভার সকলের মনেও নেমে এসেছে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

সেদিন ভোর হয় হয়। নিষধের রাজোদ্যানে বসন্ত নেমেছে। ফুলভারে নুয়ে পড়েছে মাধবী করবী ও পারিজাতকুঞ্জ। ফুলের সাজ পরেছে অশোক চম্পক আর কদম্ব বকুল।

ভোরের পাখি ডেকে গেল। আকাশের পূব তীর জুড়ে শুরু হয়েছে আলোর

মাতন। উষার আঁচল ধরে সূর্য উঠেছে ধীরে ধীরে। এমন সময় উপবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন অনিন্দ্যসুন্দর এক তরুণ যুবা—মহারাজ নল। চোখে মুখে তাঁর অবসাদ আর ক্লান্তির ছাপ। ক্লান্ত পদক্ষেপ।

নল আনমনা। কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। ভাবছেন কত কি —

দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক আসে রাজসভায়। বলে কত রাজ্যের কত খবর। কিন্তু একজনের কথা সবাই বলে। বলে ভিন্‌দেশী এক রাজকুমারীর কথা। তিন ভুবনে তার নাকি তুলনা নেই—রূপেগুণে সে অনুপমা। তার রূপের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ম্লান হয়, স্বর্গের লক্ষ্মীও নাকি হার মানে।

নল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ধীর পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ান পারিজাত-কুঞ্জের কাছে। চিন্তা আসে একের পর এক।

নীল আকাশের পথ বেয়ে ডানা মেলে ভেসে চলেছে সাদা সাদা মেঘখণ্ড। মেঘের সাথে নলের মনও উড়ে চলে কল্পনার রথে। চোখে তাঁর শূন্য দৃষ্টি। পুষ্পোদ্যান ছাড়িয়ে, নিষধের সীমানা পার হয়ে সে দৃষ্টি চলে গেছে দূরে—কত অরণ্য-পর্বত, নদ-নদী, মরু-কান্তার পার হয়ে—বহু বহু দূরে বিদর্ভ রাজ্যে। বিদর্ভের রাজা ভীমের কন্যাই সেই রাজকুমারী—দময়ন্তী।

নল চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পায়চারি করতে থাকেন অস্থির পদে—

কি করবেন তিনি? বিদর্ভের রাজা ভীম মহাবল পরাক্রান্ত। ভীম কি রাজী হবেন তাঁর সঙ্গে দময়ন্তীর বিয়ে দিতে? যদি রাজী না হন, তাহলে তো লজ্জা আর অপমানের শেষ থাকবে না!

হঠাৎ নল চমকে উঠলেন—ও কী! আকাশে সোনার হাঁস! নীল আকাশের বুক চিরে আসছে এক ঝাঁক সোনার হাঁস!

মন্ত্রমুগ্ধের মত নল দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে দেখতে আলোর বুকে কাঁপন তুলে সোনার হাঁস নেমে এল। নেমে এল তাঁরই পুষ্পোদ্যানে। কী অপরূপ সুন্দর! তাদের আলো-ঝলমল সোনার পাখায় ঠিকরে পড়ছে সোনার আলো!

কিছুক্ষণ পরে নল যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। এগিয়ে গেলেন হাঁস-গুলিকে ধরবার জন্যে। হাঁসগুলিও যেন বুঝতে পারল তাঁর মনের কথা। তারা সরে গেল একটু! নল আবার এগিয়ে গেলেন। আবার তারা সরে গেল। নলকে নিয়ে তারা যেন খেলা শুরু করল।

এইভাবে খেলা চলল বহুক্ষণ। শেষে বহু ছুটোছুটির পর নল অনেক কষ্টে ধরে ফেললেন একটাকে। অমনি সে সোনার হাঁস কথা বলে উঠল—"মহারাজ মারবেন না আমাকে, দয়া করে ছেড়ে দিন। আমরা আপনার উপকার করব। বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তীর নাম আপনি শুনেছেন কখনো?

রূপে গুণে তাঁর তুলনা নেই। আপনি ছাড়া তাঁর স্বামী হবার মত যোগ্য পুরুষও নেই পৃথিবীতে। আমাকে ছেড়ে দিন, মহারাজ। সঙ্গীদের নিয়ে আমি যাব দময়ন্তীর কাছে। তাকে গিয়ে বলব আপনার অসামান্য রূপগুণের কথা। অনুরোধ করব, আপনাকে ছাড়া তিনি যেন আর কাউকেই বিয়ে না করেন।"

হাঁসের কথা শুনে নল মুগ্ধ—বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। মুখে তাঁর একটি কথাও যোগাল না। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলেন তাকে।

নীল আকাশের কোল বেয়ে সোনালী আলপনার মত সোনার হাঁস উড়ে চলল সার বেঁধে। নলের মনোরথই যেন উড়ে চলল আকাশ-পথে।

॥ দুই ॥

বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুর। বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী। কাজলকালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই তাঁর রূপের দীপ্তি। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর রূপ ও গুণের খ্যাতি।

কিন্তু এমন যে দময়ন্তী, কিছুদিন হল কি যেন তাঁর হয়েছে। সব সময়ে তিনি আনমনা। সদাহাস্যময়ী আজ গম্ভীর—হাসতেই যেন ভুলে গেছেন, একেলা বসে থাকেন নিরালায়।

একমাত্র সখীরা ছাড়া আর কেহই জানে না, কেন তাঁর এই অবস্থা।—যাঁর রূপ ও গুণের খ্যাতি সকলের মুখে মুখে, যাঁর প্রশংসায় পৃথিবী মুখর, দময়ন্তীও শুনেছেন সেই মহারাজ নলের কথা। যতই শুনেছেন, ততই অস্থির হয়েছেন। শেষে পণ করেছেন—নলকে ছাড়া আর কাউকেই তিনি বিয়ে করবেন না, আর কারো গলায় বরমাল্য দেবেন না।

বিদর্ভের রাজোদ্যানে ভোর হল সেদিন। ভোরের আলো, পাখির গান আর ভ্রমরের গুঞ্জরণে জেগে উঠল উপবন। বাগানে শুধু ফুল আর ফুল—ফুলের সমুদ্র যেন। ফুলের গন্ধে বাতাস পাগল—দোল দিয়ে গেল ফুলের রাজ্যে।

সখীদের নিয়ে ধীরে ধীরে রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন দময়ন্তী। তাঁর রূপের আলোয় হেসে উঠল উপবন। চমকে উঠল ফুল। চমকে উঠল ভোরের আলো। বনের পাখিও চেয়ে রইল গান ভুলে।

ধীর মন্থর পদে দময়ন্তী গিয়ে সরোবরের ঘাটে বসলেন। বড় করুণ, বড় বিষণ্ণ তাঁর মুখ—বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন। নীরবে তিনি বসে রইলেন মাথা নীচু করে।

হঠাৎ আকাশের দিকে নজর পড়তেই সখীদের একজন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'দেখ দেখ !'

সবাই চমকে উঠল—আরে ! তাইতো ! কী ব্যাপার ! এক ঝাঁক সোনার হাঁস !—উড়ে আসছে এই দিকেই !

দেখতে দেখতে হাঁসের ঝাঁক আকাশ থেকে নেমে এল সেই পুষ্পোদ্যানে। কী মনোহর ! কী সুন্দর ! মুগ্ধ নির্বাক দময়ন্তী—সখীদের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। তারপর এগিয়ে গেলেন তাদের ধরবার জন্যে। কত চেষ্টাই না করলেন। কিন্তু সোনার হাঁস ধরা দিল না কিছুতেই।

শেষে একটি হাঁস কথা বলে উঠল। বলল—"রাজকুমারী, কেন অকারণে আমাদের ধরতে চাইছ ? তার চেয়ে শোন, একটা খবর বলি। মহারাজ নলের নাম শুনেছ কখনো ? নিষধের রাজা তিনি। রূপে গুণে, শৌর্যে বীর্যে ত্রিভুবনে তাঁর তুলনা নেই। তিনিই একমাত্র তোমার স্বামী হতে পারেন। শোন দময়ন্তী, মহারাজ নলকে ছাড়া আর কাউকেই তুমি বিয়ে করো না।'

হাঁসের মুখে নলের কথা !—দময়ন্তী হতবাক। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন ? তাঁর দেহ কাঁপতে লাগল থরথর করে। শেষে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন—"হংসরাজ ! যে কথা তুমি আজ শোনালে আমাকে, তার জন্যে তোমাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার আমার ভাষা নেই। আমার একটা মিনতি তোমাকে রাখতে হবে। আমার দূত হয়ে একবার তোমায় নিষধ দেশে যেতে হবে। মহারাজকে গিয়ে বলবে—তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই আমি বিয়ে করব না, স্বামী হিসাবে আর কাউকে আমি স্বপ্নেও ভাবি না।"

দময়ন্তীর কথায় সোনার হাঁস রাজী হল। তাঁর দূত হয়ে তখুনি আবার উড়ে চলল নিষধ দেশে।

॥ তিন ॥

দিন কাটে। কিন্তু দময়ন্তীর দিন আর কাটে না। চোখে তাঁর ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। দিনে দিনে শরীর তাঁর রোগা হতে লাগল। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ হল বিবর্ণ।

রাজা ও রানীর বুক ফেটে যায় মেয়ের দশা দেখে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে অমাত্যবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে মহারাজ ভীম স্থির করলেন—দময়ন্তীর বিয়ের বয়স হয়েছে, তাঁর বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ বিয়ে নয়। দময়ন্তীর স্বয়ংবর হবে। দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-মহারাজেরা সবাই আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন। দময়ন্তী স্বয়ং তাঁদের ভিতর থেকে নিজের পছন্দমত বর বেছে নেবেন।

কর্তব্য স্থির হলে, আমন্ত্রণ-লিপি নিয়ে মহারাজ ভীমের দূত ছুটল দেশে দেশে। মহর্ষি-নারদের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্যের দেবতারাও জানতে পেলেন সে সংবাদ। দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ, অগ্নিদেবতা আর ধর্মরাজ যম, এই চারজন প্রধান দেবতা ঠিক করলেন—দময়ন্তীকে লাভ করবার জন্যে তাঁরাও যাবেন স্বয়ংবর-সভায়।

যথাসময়ে নলও খবর পেলেন। নিশ্চিন্ত মনে এক শুভ দিনে তিনি রওনা হলেন বিদর্ভ দেশে। নানা দুর্গম দেশ, অরণ্য পর্বত পার হয়ে নলের রথ ছুটে চলল আলোর শিখার মত।

এদিকে, দেবতা চারজনও সেই পথে যাচ্ছিলেন স্বয়ংবর-সভায়। দূর থেকে নলকে দেখেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের বুঝতে বাকি রইল না, স্বয়ংবর-সভায় নল উপস্থিত থাকলে তাঁদের নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। কারো কপালে দময়ন্তীর বরমাল্য জুটবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মতলব ঠিক করে তাঁরা গিয়ে নলের পথ আটকে দাঁড়ালেন। তারপর বিস্মিত নলকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ইন্দ্র বললেন—"শোন নিষধরাজ, তোমার সঙ্গে আমাদের একটা জরুরী কথা আছে। তুমি পরম ধার্মিক, সত্যবাদী! বিশেষ একটা কাজে দূত হয়ে আমাদের একটু সাহায্য কর।"

নল ভক্তিভরে প্রণাম করে তখনি রাজী হলেন ইন্দ্রের কথায়। ইন্দ্র হেসে বললেন—"বড় খুশী হলাম, নল, তোমার ব্যবহারে। দেখ, দময়ন্তীকে লাভ করার জন্যে আমরা চলেছি তাঁর স্বয়ংবর-সভায়। আমাদের দূত হয়ে এখনি একবার তোমাকে দময়ন্তীর কাছে যেতে হবে। তাঁকে গিয়ে বলবে—আমাদের যে কোনো একজনকে তিনি বরমাল্য দান করুন। কোনো ভয় নেই তোমার, আমার বরে দময়ন্তীর সুরক্ষিত পুরীতেও তুমি অনায়াসে ঢুকতে পারবে। কেউই দেখতে পাবে না।"

নলের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে হাতজোড় করে তিনি বললেন—"এ কেমন কথা হল, দেবরাজ? আমিও তো চলেছি দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায়। আপনাদের পক্ষ হয়ে আমি কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে এসব কথা বলব? এবারের মত আমাকে ক্ষমা করুন।"

মাথা নেড়ে ইন্দ্র বললেন—"তা হয় না, মহারাজ। একবার শপথ করে তুমি ভাঙতে পার না। তুমি না পরম ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ? যাও আর দেরি করো না, তাড়াতাড়ি যাও।"

নল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কোনো উপায় নেই—তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মনের ব্যথা ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। মাথা নীচু করে তিনি রওনা হলেন দেবতাদের প্রস্তাব নিয়ে।

কিছু পরে দময়ন্তীর প্রাসাদে ঢুকে নল দেখলেন, মণিমুক্তাখচিত একটি

সুসজ্জিত ঘরে দময়ন্তী সখীদের নিয়ে বসে আছেন। নল, দময়ন্তী—দুজন দুজনকে দেখেই চমকে উঠলেন ; কারো মুখে কথা নেই। দুজনকে দেখে দুজনেই মুগ্ধ।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল বিহ্বলতার মধ্যে। তারপর আত্মসংবরণ করে নল কথা বললেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে দময়ন্তীকে বললেন তাঁর আসবার কারণ। দময়ন্তী হেসে ফেললেন। মৃদুকন্ঠে বললেন—"দেবতারা কি আমায় পরীক্ষা করছেন? তাঁরা তো জানেন আমার অন্তরের কথা—মহারাজ নল ছাড়া আর কাউকেই আমি বরণ করব না।"

দময়ন্তীর কথা শুনে আনন্দে বিস্ময়ে নল নির্বাক। তাঁর ভয় হল—পাছে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি নিজেকে না হারিয়ে ফেলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন—"বলছ কি, কল্যাণী? দেবতাদের বাদ দিয়ে নলকে কেন বরণ করবে? নল তো একজন সামান্য মানুষ। ভেবে দেখ, দময়ন্তী..."

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। দেখলেন, দময়ন্তী কাঁদছেন। আঁচলে চোখ ঢেকে দময়ন্তী বললেন—"মহারাজ, আপনাকে আমি প্রথমেই চিনেছি। স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি। লোকের মুখে আর হাঁসের কাছে শুনেছি আপনার চেহারার বর্ণনা। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, মহারাজ! দেবতাদের চরণে প্রণাম জানিয়ে শপথ করছি, আপনাকেই আমি বরণ করব। অকারণে আমাকে স্বর্গসুখের লোভ দেখাবেন না।"

অশ্রুমুখী দময়ন্তীর দিকে চেয়ে নলও আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করে ফেললেন তাঁর কাছে। তারপর ফিরে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন দেবতাদের। মৃদু হেসে দেবতারা চললেন স্বয়ংবর-সভায়।

উৎসবমুখরিত স্বয়ংবর-সভা—সুবিশাল স্বর্ণময় সভামণ্ডপ। অগুরু ধুনার গন্ধে ভরপুর।

মণ্ডপের ভিতরে শত শত সোনার আসনে নিমন্ত্রিত রাজগণ বসে আছেন—উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই।

এমন সময় শত শত শঙ্খ-তূর্য হঠাৎ বেজে উঠল। সচকিত হয়ে উঠল সভাস্থল। বেদমন্ত্র পড়ে পুরোহিতেরা আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবচন পড়লেন সমস্বরে।

সভায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন দময়ন্তী। হাতে তাঁর পুষ্পমাল্য। পরনে অপরূপ সুন্দর বসন, আর বর অঙ্গে কত অলংকার-আভরণ। লক্ষ্মী-রূপা দময়ন্তীকে দেখে অভিভূত হল সভাস্থল।

নিস্তব্ধ সভামণ্ডপ। মুগ্ধ বিহ্বল রাজাদের সামনে দিয়ে দময়ন্তী এগিয়ে চললেন। ঘোষক সঙ্গে চলল প্রত্যেক রাজার পরিচয় দিতে দিতে। কিন্তু ওসব দিকে কান নেই দময়ন্তীর।

ধীর মন্থরপদে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অভাবনীয় এক দৃশ্য দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেখলেন, পাশাপাশি পাঁচটি আসনে পাঁচজন পুরুষ বসে আছেন—প্রত্যেকেই দেখতে ঠিক নলের মত। এতটুকু পার্থক্য নেই কোথাও।

এটা যে দেবতাদের কারসাজি, তা বুঝতে দময়ন্তীর বাকী রইল না। কিন্তু এখন উপায়? অনেক ভেবে চিন্তেও কোনো কিনারা না পেয়ে নিরুপায় দময়ন্তী শেষে একমনে দেবতাদের স্তব করতে শুরু করলেন। এই বিষম পরীক্ষা থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্যে আকুল মিনতি জানাতে লাগলেন তাঁদের পায়ে।

দময়ন্তীর আকুল প্রার্থনায় আর নলের প্রতি তাঁর অচলা নিষ্ঠা দেখে দেবতারা আর কতক্ষণ চুপ করে থাকবেন? সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা দেবচিহ্ন ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীও চিনতে পারলেন নলকে। লজ্জানত মুখে এগিয়ে গিয়ে তিনি বরমাল্য পরিয়ে দিলেন নলের গলায়। আনন্দধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু অন্য রাজারা সবাই হায় হায় করে উঠলেন।

নলের উপর দেবতারা বড়ই খুশী হয়েছিলেন। তাই প্রত্যেকে তাঁরা নলকে একটি করে বর দিলেন।

ইন্দ্র বললেন—"শোন মহারাজ, যত ছোট বা সরু দরজাই হোক না কেন, আমার বরে তুমি তার ভিতর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে।"

অগ্নি বললেন—"আমার বরে তুমি যেখানেই আমাকে ডাকবে, সেখানে গিয়েই জ্বলে উঠব।"

যম বললেন—"যে কোন খাদ্যবস্তুই তুমি রান্না কর না কেন, আমার বরে তা-ই অত্যন্ত সুস্বাদু হবে। আর তাছাড়া ধর্মে তোমার মতি থাকবে চিরকাল।"

বরুণ বললেন—"শোন নল, আমার বরে তুমি যেখানেই জল চাইবে, সেখানে গিয়ে আমি হাজির হব। তাছাড়া এই নাও স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য—তোমায় দান করলুম। এ মালা কোনো দিনই ম্লান হবে না, চিরস্থায়ী হবে এর সুগন্ধ।"

এই বলে দেবতারা বিদায় নিলেন। তাঁরা ফিরে চললেন স্বর্গরাজ্যের দিকে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ দেখলেন—কলি ও দ্বাপর, দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু কোথায় যেন চলেছে তাড়াতাড়ি। তাদের সাজগোজ, হাবভাব দেখে দেবতাদের

কেমন যেন সন্দেহ হল। তাদের দুজনের মত, বিশেষতঃ কলির মত দুর্জন পাষণ্ড আর দ্বিতীয়টি নেই। এমন কোনো অন্যায় পাপ কাজ নেই, যা সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে করতে না পারে। যেমন নিষ্ঠুর সে, তেমনি হিংসুক আর পরশ্রীকাতর।

ইন্দ্র তাই এগিয়ে গিয়ে কলিকে জিজ্ঞেস করলেন—"আরে কলি যে! কি খবর? তা দ্বাপরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

এক গাল হেসে কলি বলল—"আর বলেন কেন, দেবরাজ! বিদর্ভ-রাজকুমারী দময়ন্তীকে আমার বিয়ে করবার বড়ই সাধ। তাই দ্বাপরকে নিয়ে চলেছি তার স্বয়ংবর-সভায়।"

ইন্দ্র মুচকি হেসে কলিকে দময়ন্তীর স্বয়ংবরের খবর দিলেন। কলি যেন আর্তনাদ করে উঠল। দেখতে দেখতে তার চোখ রাগে জবার মত লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত পিষে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল—"এত বড় স্পর্ধা দময়ন্তীর! দেবতাদের উপেক্ষা করে সামান্য একজন মানুষকে সে বরমাল্য দিলে! আর নলের এত সাহস যে, সে গ্রহণ করলে সে বরমাল্য! এজন্যে তাদের সমুচিত শাস্তি পাওয়া উচিত, দেবরাজ।"

দেবতারা তার কথায় প্রতিবাদ করলেন। বললেন—"না কলি, তোমার এ ধারণা ভুল। নল-দময়ন্তী আমাদের কিছুমাত্র উপেক্ষা বা অনাদর করেনি। বরণ্ড আমাদের অনুমতি নিয়েই দময়ন্তী নলকে বরণ করেছে। তাই তোমার এ রাগের কোনো হেতু নেই। তুমি শান্ত হও।"

কিন্তু শান্ত হওয়া তো দূরের কথা, কলির রাগ বাড়তে বাড়তে সপ্তমে চড়ল। কোনো ভাবেই যখন তাকে নিরস্ত করা গেল না, তখন দেবতারা বললেন—"শোন কলি, নলের মত সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁর অনিষ্ট করার কথা ভাবতে পারে, এমন দুরাত্মা পাষণ্ডও দেখা যায় কদাচিৎ। নলের কোনো ক্ষতি করলে পরিণামে তার ফল তোমার পক্ষে মোটেই শুভ হবে না। এজন্যে তোমাকেও শেষ পর্যন্ত অশেষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই আবার তোমাকে অনুরোধ করছি—তুমি নিরস্ত হও।" এই বলে দেবতারা বিদায় নিলেন।

জনমানবহীন সেই ভয়ঙ্কর দেশে কলি ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল দ্বাপরের মুখোমুখী। ঘনায়মান প্রদোষ-অন্ধকারে তার রক্তাভ চোখ জ্বলতে লাগল ধ্বক্ ধ্বক্ করে। তারপর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে সে বলল—"শোন দ্বাপর, দেবতারা যাই বলুন, নল-দময়ন্তীকে শাস্তি আমি দেবই। নতুবা আমার শান্তি নেই। কিন্তু একার পক্ষে এ কাজ করা খুব সহজ নয়। তোমার সাহায্য দরকার। থাকবে তুমি আমার সঙ্গে?"

দ্বাপর রাজী হতেই দুজনে মিলিয়ে গেল রক্তাভ ধূসর অন্ধকারে। সঙ্গে

সঙ্গে কোথায় হঠাৎ খল খল অট্টহাসি জেগে উঠল রুক্ষ প্রকৃতির বুকে। তার-পরেই সব চুপ।

॥ চার ॥

কিছুদিন পরে—দ্বাপরকে সঙ্গে নিয়ে কলি একদিন এসে হাজির হল নিষধ দেশে। দেখল, ধনধান্যে ভরা দেশ—প্রজাদের সুখের সীমা নেই। সুখের সীমা নেই নল-দময়ন্তীর। তাঁদের দিন কাটে যেন মধুর স্বপ্নের মত।

নল-দময়ন্তীর সুখ দেখে হিংসায় কলির বুক ফেটে যায়, মনে নরকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে দিনরাত। সবার অলক্ষ্যে সকলের অগোচরে নলের পিছু পিছু সে ঘোরে ছায়ার মত, আর নলের কাজকর্মে খুঁত খুঁজে বেড়ায়। যত তুচ্ছ, যত সামান্যই হোক, ছুতো একটু পেলেই হয়, অমনি সে ঢুকবে নলের দেহে—তারপরেই শুরু করবে সর্বনাশ।

কিন্তু এক এক করে বছরের পর বছর কেটে চলল, তবু কোনো সুযোগই তার মিলল না। পুণ্যশ্লোক নলের কাছেও সে ঘেঁষতে পারল না কোনো ভাবে। ক্রমে ক্রমে নল-দময়ন্তীর এক ছেলে আর এক মেয়ে হল। তাঁরা ছেলের নাম রাখলেন ইন্দ্রসেন, মেয়ের নাম ইন্দ্রসেনা।

এই ভাবে দীর্ঘ এগার বৎসর কাটতে চলল। তবু কলির প্রতিহিংসার নিবৃত্তি নেই। আদিম হিংস্রতা নিয়ে সংগোপনে সে শিকারের প্রতীক্ষায় ওত পেতে রইল।

তারপরেই একদিন ঘটল সর্বনাশ। কলি হঠাৎ সেদিন নলের কাজে সামান্য একটা দোষ দেখতে পেল। নির্মম কুটিল হাসি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। চোখের নিমেষে সে ঢুকে পড়ল নলের দেহে। কেউ কিছু জানল না, এমন কি নলও বুঝতে পারলেন না—কী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে।

নলের এক ভাই ছিল—নাম পুষ্কর। জহুরী যেমন জহর চেনে, কলিও তেমনি চিনেছিল পুষ্করকে। নলের দেহ আশ্রয় করেই সে ছুটল পুষ্করের কাছে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—"শোন পুষ্কর, আমার কথামত যদি চল তো নলকে দূর করে তোমাকেই আমি নিষধের রাজা করতে পারি।"

এত দিনের স্বপ্ন তার এমনি ভাবে সফল হবে—পুষ্কর তা কল্পনাও করেনি। তাই কলির কথা শুনে চোখ দুটো তার লোভে ও লালসায় চক্‌চক্‌ করে উঠল। মনোবাসনা তার বুঝতে পেরে কলি হেসে বলল—"তাহলে শোন, যা বলি। নল পাশা খেলতে খুব ভালবাসে। কিন্তু অক্ষবিদ্যা জানে না বলে মোটেই ভালো খেলতে পারে না। আজ তোমাকে বাজী রেখে তার সঙ্গে পাশা খেলতে হবে। আমি পাশার রূপ ধরে তোমায় সাহায্য করব।"

বলতে বলতেই কলি পাশার রূপ ধারণ করল, আর পুষ্কর সেই পাশা হাতে ছুটল নলের কাছে।

তারপর বাজী রেখে দুই ভাইয়ের মধ্যে শুরু হল পাশা খেলা। সে এক অদ্ভুত খেলা। নল দান ফেলতেই তা উলটো হয়, আর পুষ্কর যে দান ফেলে, তা-ই ঠিক হয়। নল হারতে লাগলেন বাজীর পর বাজী। কত ধনরত্ন যে তিনি খোয়ালেন, তার ইয়ত্তা নেই।

দময়ন্তী প্রমাদ গুণলেন। অন্তর থেকে কে যেন বার বার তাঁকে বলতে লাগল—নিরস্ত করো, নিরস্ত করো; এ খেলা থেকে রাজাকে নিরস্ত করো, নয়তো চরম সর্বনাশ হবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নল তখন পাগলের মত—কলির প্রভাবে তাঁর মতিচ্ছন্ন ঘটতে শুরু হয়েছে। যতই তিনি হারছেন, ততই বাড়ছে তাঁর জিদ।

যাঁর তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি ছিল জগতে অতুলনীয়, সেই পুণ্য-শ্লোক মহারাজের অবস্থা দেখে দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি খবর দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্য ও গণ্যমান্য পুরবাসীদের। বিপদ শুনে তাঁরা ছুটে এলেন। সাধ্যমত বার বার চেষ্টা করলেন রাজাকে নিরস্ত করতে। কিন্তু বৃথা হল সবই। শেষে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁরা বিদায় নিলেন।

অসহায় দময়ন্তী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অন্ধকার—চারিদিকে শুধুই অন্ধকার। নলের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে বিশ্বাসী সারথি ছিল বার্ষ্ণেয়। শেষে তাকে ডেকে তিনি বললেন—"বার্ষ্ণেয়, চরম বিপদের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। কোথায় যাব, কোথায় থাকব—কিছুই জানি না। তুমি আজই ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে রথে নিয়ে কুণ্ডিনপুরে যাও। বাবার হাতে তাদের সমর্পণ কোরো। রথ-ঘোড়াও জমা রেখো সেখানে। ইচ্ছে করলে তুমিও সেখানে থাকতে পার।"

বার্ষ্ণেয় তখনি রওনা হল। কয়েকদিন পরে কুণ্ডিনপুরে পেঁছে রথ-ঘোড়া সমেত আদরের রাজপুত্র রাজকন্যাকে সে সমর্পণ করল মহারাজ ভীমের হাতে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশের পথে। বহু দিন ছন্নছাড়া পাগলের মত এ দেশ সে দেশ ঘুরল। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর কঙ্কালসার। শেষে এক সময় কোনো রকমে এসে সে হাজির হলো অযোধ্যায়। সেখানে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাছে সারথির কাজ নিয়ে পড়ে রইল মুখ বুজে।

এদিকে পাশা খেলায় নল ধনরত্ন রাজ্যসম্পদ, সব কিছু খোয়ালেন একে

একে। আর যখন তার কিছু রইল না, পুষ্কর তখন নিজমূর্তি ধারণ করল, উপহাস করে বলল—"এবার কি পণ রাখবে, মহারাজ? এক দময়ন্তী ছাড়া তোমার তো আর কিছুই নেই। চাও তো দময়ন্তীকে বাজী রাখতে পার।"

দময়ন্তী!—নল চমকে উঠলেন। স্নেহের ছোট ভাই পুষ্কর—যাকে তিনি বুকে করে মানুষ করেছেন, তারই মুখে এই হীন মর্মান্তিক উপহাস! নলের পূর্বেকার সুস্থ বুদ্ধি আবার যেন ক্ষণেকের তরে ফিরে এল। দুঃখে ক্ষোভে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দেহ থেকে রাজপোশাক অলঙ্কার আভরণ, সমস্তই খুলে ফেললেন একে একে। তারপর এক কাপড়ে বেরিয়ে গেলেন রাজপুরী থেকে।

আর দময়ন্তী? নিষধের নিরাভরণা রাজলক্ষ্মী একখানি মাত্র কাপড় সম্বল করে বেরিয়ে এলেন রাজপুরী থেকে। স্বামীকে অনুসরণ করলেন আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে। পুরবাসীরা হাহাকার করে কেঁদে উঠল। শোকে দুঃখে আঁধার হল নিষধপুরী।

পুষ্কর নগর মধ্যে ঘোষণা করে দিল—"নল-দময়ন্তীকে যে কোনো রকম সহানুভূতি দেখাবে, তার শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড।"

পুষ্করের ভয়ে কোনো প্রজাই রাজা ও রানীকে সাহায্য করতে পারল না। নীরবে গোপন কান্নাই তাদের সার হল।

কতক দিন পরে—

উপায়ান্তর না দেখে নল-দময়ন্তী লোকালয় ত্যাগ করে বনে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। নিরাশ্রয়, অসহায় দুটি মূক মানুষ—পরনে ময়লা কাপড়। বনের ফলমূলই একমাত্র খাদ্য—অধিকাংশ দিন তাও জোটে না। রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার ঠাঁইটুকুও নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনিদ্রায় দেহ মন ভেঙে পড়েছে, শ্রান্তিতে পা চলে না—তবুও তাঁরা পথ চলেন একে আর একজনকে ভর দিয়ে।

নিজের জন্যে দময়ন্তীর এতটুকু দুঃখ নেই। সুখে দুঃখে স্বামীর তিনি সহচরী—এর চেয়ে বড় সুখ তিনি কোনো দিনই কামনা করেন নি। সুস্থ দেহে সুস্থ মনে নল সঙ্গে থাকলেই তিনি সুখী। কিন্তু নল তো সুস্থ নন! তাই আশঙ্কায় দময়ন্তীর বুক কাঁপে, চোখের জলেরও তাই বিরাম নেই। নলের পাশে পাশে থাকেন তিনি ছায়ার মত।

জীবনের এত বড় বিড়ম্বনা, এত লাঞ্ছনা নল আর সইতে পারছেন না। দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে অন্তরের জ্বালা তাঁর শতগুণে বেড়ে যায়। রাজরানীর ভিখারিণীর বেশ দেখে দুঃখ-যাতনায় তিনি ছটফট করতে থাকেন।

কলিও কিন্তু নিশ্চিন্তে বসে নেই। নল-দময়ন্তীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবেও না।

তাই অনেক ভেবে শেষে একদিন সে ফাঁদ পাতল। খাবার যোগাড়ের জন্যে ক্ষুধার্ত নল সেদিন বনে বনে ঘুরছেন, এমন সময় এক ঝাঁক পাখি এসে তাঁর সামনে বসল। সোনায় তৈরী তাদের পাখা। মাংস আর সোনা, দুটোই একসঙ্গে জুটবে মনে করে নল তাড়াতাড়ি নিজের পরনের কাপড় খুলে পাখিদের উপরে চাপা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় নিয়ে পাখির ঝাঁক উড়ে পালাল। রাজ্যহারা নিঃসম্বল রাজার কাপড়খানাও কলি চুরি করে পালাল এই ভাবে।

দময়ন্তীর কাপড়ের আধখানা পরে নল তাড়াতাড়ি লজ্জা নিবারণ করলেন বটে, কিন্তু বড় মর্মান্তিক হয়ে এ লাঞ্ছনা তাঁর বুকে বাজল। তীব্র ধিক্কারে মন ভরে গেল। দময়ন্তী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন নানাভাবে। দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলেন একখানি মাত্র কাপড় পরে।

ধীরে ধীরে সূর্য উঠল মাথার উপরে—ভরা দুপুর। এককণা খাদ্যও তাঁদের জুটল না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আর ক্লান্তিতে দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়লেন এক গাছতলায়। কিন্তু নলের চোখে ঘুম নেই। পাশে বসে তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল কত এলোমেলো চিন্তা। চোখে তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘুমন্ত দময়ন্তীর ক্লিষ্ট কাতর মুখের দিকে তিনি কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন নিষ্পলক চোখে। ভাবতে লাগলেন—"আহা কী পরম সুখেই না নিষধের রানী আজ ঘুমোচ্ছে ধুলোর উপরে! কিন্তু কেন?—কেন এই সোনার প্রতিমা আমার জন্যে এত দুঃখ ভোগ করবে?"

উদ্‌ভ্রান্ত নল ভাবতে লাগলেন; হঠাৎ মনে হল—"আচ্ছা, আমি যদি ওকে ছেড়ে যাই, তাহলেই বা কেমন হয়? তাহলে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ও ফিরে যাবে ওর বাবা-মার কাছে। এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে নিস্তার পাবে। শান্তিও হয়তো পাবে কিছুটা।"

কলির প্রভাবে নলের মন তখন বিকল। সুস্থ বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তাই দময়ন্তীকে ছেড়ে যাওয়াই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গত বলে মনে হল।

কিন্তু দুজনের কাপড় যে একখানা!—যাবেন কি ভাবে? হঠাৎ কয়েক হাত দূরে তিনি দেখলেন, একখানা তরবারি পড়ে আছে। ওখানা কিভাবে ওখানে এল, সে কথা একবারও তাঁর মাথায় এল না। তরবারি দিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়ের আধখানা কেটে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পিছনে দময়ন্তীর দিকে চোখ পড়তে ফিরে এলেন আবার। চোখের জল বাধা মানল না। দুহাতে বুক চেপে ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে নল দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আপন মনেই বললেন—"রানী ঘুমোও তুমি, আমি যাই। তোমার ভালোর জন্যেই এতকাল পরে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। এইজন্যেই

তোমাকে ছেড়ে একলা আজ আমায় যেতে হচ্ছে। জানি, ঘুম থেকে জেগে তুমি পাগলিনীর মত খুঁজবে আমাকে। জানি, হিংস্রজন্তুভরা এই জঙ্গলে নানা বিপদ আসবে পায়ে পায়ে, আসবে কত সঙ্কট। তবু কল্যাণী, ভয় নেই তোমার। পুণ্যবতী পবিত্রা তুমি—দেবতারা তোমায় রক্ষা করবেন।"

এই বলে নল আবার ফিরলেন বনের দিকে। কিন্তু পিছন থেকে কে যেন আকর্ষণ করে বারবার—আবার ফিরে এলেন তিনি। একদিকে জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন—পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে আকুলিবিকুলি করে, অন্তর উজাড় করে টানে নিজের পাশে। অন্যদিকে পাপ হাতছানি দেয়, কলি টানতে থাকে প্রাণপণে।

শেষ পর্যন্ত কলির আকর্ষণই বড় হল। ক্ষতবিক্ষত, রিক্ত মন, দেহ অবসন্ন—দুহাতে চোখ ঢেকে নল চলে গেলেন। পিছনে নির্জন বনমধ্যে পড়ে রইলেন নিদ্রিতা দময়ন্তী—একলা, একান্ত অসহায়। মধ্যাহ্নের তন্দ্রাচ্ছন্ন অরণ্যের বুকে হঠাৎ এক দমকা বাতাস উঠল। বনের বুকে মর্মর-ধ্বনি তুলে, সব কিছু এলোমেলো করে বয়ে গেল ঘূর্ণির মত।

কিছু সময় পরে হঠাৎ দময়ন্তীর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসতেই তিনি চমকে উঠলেন—এ কী! কোথায় গেলেন মহারাজ! কাপড়ের যে আধখানা কাটা!

আলুথালু বেশে দময়ন্তী উঠে দাঁড়ালেন—তাহলে আশঙ্কাই কি সত্য হল? পর মুহূর্তে অসহায় কান্নায় মূর্ছিত হয়ে তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন মাটিতে। মূর্ছাভঙ্গের পর পাগলিনীর মত ছুটে চললেন যে দিকে দুচোখ যায়। দময়ন্তীর শোকে নিঃশব্দে কাঁদল সারা বনভূমি। দুঃখতাপে পাগলিনীর মত দময়ন্তী অভিশাপ দিলেন—"যে দুর্জন পাষণ্ডের চক্রান্তে আমার স্বামীর আজ এই দশা, সে যেন কখনো শান্তি না পায়। যার জন্যে আমার স্বামী আজ অকারণে এত যন্ত্রণা ভোগ করছেন, দুঃসহ নরকের যন্ত্রণা তার জীবনকে অহোরাত্র বিষময় করে তুলুক।"

সঙ্গে সঙ্গে নলের দেহে কলি ছটফট করে উঠল।

গহন বনের ভিতর দিয়ে দময়ন্তী চলতে লাগলেন। কত কাঁটা ফুটল, হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হল, রক্ত ঝরতে লাগল সারা অঙ্গে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই দময়ন্তীর। কেঁদে কেঁদে তিনি ডাকতে লাগলেন বনময়—"ওগো মহারাজ, ফিরে এসো, একবার শুধু ফিরে এসো। আমি বড় একা।" কিন্তু ফিরে এলো শুধু প্রতিধ্বনি। বনে বনে ঘুরতে লাগল পাগলিনীর আর্ত কান্না।

দিন গেল। রাত্রির পর আবার এল দিন। কিন্তু অভাগিনীর চলার বিরাম নেই, কান্নারও শেষ নেই। পাহাড়-পর্বত, বনের পশু-পাখি, বড় বড় মহীরুহ,

সবাইকে দময়ন্তী শুধান আকুল কণ্ঠে—"ও গো, আমাকে তোমরা দয়া করে বলে দাও, কোন্ দিকে গেছেন আমার মহারাজ—নিষধের পুণ্যশ্লোক নল।"

দময়ন্তীর কান্নায় মূক অরণ্যের বুকে ব্যথার মর্মর-ধ্বনি জাগে। অরণ্য চেয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে।

একের পর এক দময়ন্তী পার হলেন কত ভয়াল বনভূমি। পার হলেন কত মনোরম বন-উপবন, স্নিগ্ধ সরোবর, হিংস্র জলজন্তুভরা কত খরস্রোতা নদ-নদী। ভয়ঙ্কর কত বিপদের ঝড় গেল তাঁর মাথার উপর দিয়ে। বিকট অজগর তাঁকে গিলতে এল। দুর্জন ব্যাধ চাইল তাঁকে হরণ করতে। একদল বণিকের সঙ্গে চলতে চলতে পাগলা বুনো হাতীর পাল তাঁদের আক্রমণ করল—বণিকদের অনেকে লোক-লস্কর সমেত মারাও পড়ল। সে সব বিপদ থেকে দময়ন্তী রক্ষা পেয়ে গেলেন অতি অল্পের জন্যে।

চলতে চলতে শেষে দময়ন্তী একদিন বনজঙ্গল ছাড়িয়ে লোকালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর একদিন এসে পৌঁছলেন চেদি দেশের রাজধানীতে। পরনে তাঁর শতছিন্ন আধখানা ময়লা কাপড়। দেহ ক্ষতবিক্ষত—কঙ্কালসার। পথের ধুলোয় গায়ের রঙ ময়লা কালো। আর মাথায় একরাশ আলুথালু রুক্ষ চুলের জটা। কোথায় বা সেই সোনার প্রতিমা নিষধের প্রিয় রাজরানী, আর কোথায় বা এই অনাথা পাগলিনী। কে চিনবে তাঁকে?

রাজবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন চেদিরাজমাতা। দময়ন্তীকে দেখেই তাঁকে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলে তাঁর মনে হল। তখুনি দময়ন্তীকে তিনি ডেকে আনালেন—জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পরিচয়।

দময়ন্তী নিজের নাম-ধাম পরিচয় গোপন রেখে আর সব কথাই বললেন। রাজমাতা পরম স্নেহে আশ্রয় দিলেন তাঁকে।

॥ পাঁচ ॥

ওদিকে, নল চলেছেন। দময়ন্তীকে গাছতলায় ফেলে রেখে তিনি চলতে লাগলেন লক্ষ্যহীনের মত। ঘুরতে ঘুরতে শেষে ঢুকলেন এসে এক মহারণ্যে। দেখলেন, বনে দাবানল লেগেছে। অরণ্যের বুকে শুরু হয়েছে এক প্রলয় তাণ্ডব। গাছপালা পুড়ছে, ভেঙে পড়ছে সশব্দে। প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে যত পশুপাখি। পালাতে না পেরে আগুনেও পুড়ে মরছে অনেকে। আর—তারি ভিতর থেকে ভেসে আসছে এক অসহায় করুণ কণ্ঠস্বর। কে যেন তাঁরই নাম ধরে আর্তস্বরে ডাকছে বারে বারে—"কোথায় আছ পুণ্যশ্লোক নল, শীঘ্র এসে রক্ষা কর আমাকে।"

নল আশ্চর্য হলেন—এই বিজন গহন বনে কে বিপন্ন হয়ে তাঁকে ডাকে?

তিনি সাড়া দিলেন। তারপর দাবানলের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, বিশাল এক ভয়ঙ্কর অজগর কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে। চারদিক থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা এগিয়ে আসছে ভীষণ গর্জনে। মৃত্যুভয়ে ভীত অজগর নলকে দেখেই ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—"মহারাজ, রক্ষা করুন আমাকে। আমার নাম কর্কোটক—নাগবংশে জন্ম। দেবর্ষি নারদের শাপে চলাফেরা করার শক্তি আমার লোপ পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'মহারাজ নল যেদিন স্বেচ্ছায় তোমাকে উদ্ধার করবেন, সেদিনই তুমি শাপমুক্ত হবে।' তারপর কত কাল কেটে গেছে। আপনার পথ চেয়ে এখানে পড়ে আছি স্থবিরের মত। আমাকে বাঁচান আপনি। আপনার উপকার আমি ভুলব না মহারাজ,—নিশ্চিত প্রতিদান দেব। জানবেন, নাগবংশে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতেও আপনার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না।" বলতে বলতে চোখের নিমেষে সর্পরাজের আকার এতটুকু হয়ে গেল।

নল তাকে তুলে নিয়ে দাবানলের বাইরে আসতেই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। কর্কোটক তাঁকে দংশন করল। মুহূর্তের মধ্যে কর্কোটকের তীব্র বিষে নলের সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ কোথায় উবে গেল, সে কুৎসিত চেহারার সঙ্গে আগেকার রূপের কোন মিলই রইল না। নল তো হতভম্ব—থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইলেন কর্কোটকের দিকে।

কর্কোটক তখন নিজমূর্তি ধারণ করে বলল—"মহারাজ, দুঃখিত হবেন না। এখন আর আপনাকে কেউ চিনতে পারবে না—এটা হল আপনার ছদ্মবেশ। আমার বিষে আপনার কোনই কষ্ট হবে না, কিন্তু যে নির্মম দুরাত্মা আপনার দেহ আশ্রয় করে আপনাদের এই নিদারুণ দুঃখকষ্টে ফেলেছে, সে যতদিন আপনার দেহের মধ্যে থাকবে, ততদিন আমার তীব্র বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরবে।"

নল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্কোটক বলতে লাগল—"এখন আপনি অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাছে যান। তাঁর কাছে নিজেকে সারথি হিসাবে পরিচয় দেবেন, নাম বলবেন বাহুক। পাশাখেলায় ঋতুপর্ণের মত ওস্তাদ আর কেউ নেই। আপনি যেমন অশ্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত, তিনি তেমনি অক্ষবিদ্যায় সুনিপুণ। সুযোগ পেলেই আপনি তাঁকে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা দিয়ে, তাঁর কাছ থেকে অক্ষবিদ্যা শিখে নেবেন। তাহলেই আপনার সব বিপদ দূর হবে, আবার আগেকার রাজ্য-সম্পদ সব ফিরে পাবেন। ভয় নেই মহারাজ, এখনকার এই কদাকার চেহারা আপনার চিরকাল থাকবে না। যখনি চাইবেন, তখনি আমাকে স্মরণ করে এই কাপড় দুখানা পরলেই আবার ফিরে পাবেন আগেকার সেই রূপ ও সৌন্দর্য।" এই বলে কর্কোটক নলকে দুখানা কাপড় দিয়ে বিদায় নিল।

দময়ন্তীর কান্নায় মূক অরণ্যের বুকে ব্যথার মর্মর-ধ্বনি জাগে। অরণ্য চেয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে। [পৃষ্ঠা ৬১]

নলও রওনা হলেন অযোধ্যার দিকে। দিন দশেক পরে ঋতুপর্ণের কাছে পেঁাছে কর্কোটকের কথামত নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—"মহারাজ, রথ ও ঘোড়া চালাতে আমার মত দক্ষতা কারো নেই। তাছাড়া সবরকম রান্নার কাজেও আমি ওস্তাদ।"

ঋতুপর্ণ তখনি তাঁকে অশ্বাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করলেন। তাঁর অপর দুজন সারথি বার্ষ্ণেয় ও জীবল হল নলের সহকারী।

দিন কাটতে লাগল। সারথির বেশে নল রইলেন অযোধ্যায়। কে-ই বা জানত, কতখানি অন্তর্জ্বালা কুরূপ এই লোকটিকে অহরহ দগ্ধ করছে! অন্তরের সে হাহাকার প্রকাশ পেত কেবল দিনের শেষে, সব কাজের পরে—সূর্যদেব যখন পশ্চিম দিগন্তে রক্ত ঢেলে বিদায় নিতেন পৃথিবীর কাছ থেকে। একান্তে বসে নল তখন দুহাতে মুখ ঢাকতেন। চোখে নামত অশ্রুর বন্যা। আর বুক ভেঙে বেরিয়ে আসত মর্মদাহী দীর্ঘশ্বাস—কোথায় তুমি, দময়ন্তী? পাষাণ আমি—তাই নির্জন বনে তোমায় একলা ফেলে চলে এসেছিলাম। আজো কি বেঁচে আছ, রানী? আজো কি মনে আছে অভাগা নলকে?

॥ ছয় ॥

যে দিন বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুরে খবর এল—রাজ্য-বৈভব হারিয়ে নল-দময়ন্তী কোথায় চলে গেছেন, সেদিন থেকে রাজা ও রানীর দুশ্চিন্তার আর অবধি রইল না। মহারাজ ভীম তখুনি বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করে দেশে দেশে লোক পাঠালেন তাঁদের খোঁজে। কিন্তু সবাই একে একে ফিরে এল বিফল হয়ে—কেবল একজন ছাড়া।

সেই একজন ছিলেন সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ। তিনি ঘুরতে ঘুরতে চেদিদেশে এসে রাজপ্রাসাদে দময়ন্তীকে দেখেই চিনতে পারলেন। দময়ন্তীও কাঁদতে লাগলেন সুদেবকে দেখে। খবর পেয়ে রাজমাতা ছুটে এলেন। পরিচয় পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দময়ন্তীকে। কারণ, তিনি ছিলেন দময়ন্তীর মাসিমা—বিদর্ভের রানীর সহোদরা বোন।

তারপর রাজোচিত ধুমধামে তিনি দময়ন্তীকে পাঠিয়ে দিলেন বিদর্ভরাজ্যে। তার পরের দৃশ্য বড় বিষাদকরুণ—হাসি-কান্নায় ভরা। বাবা-মা দময়ন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সখীরা তাঁকে ঘিরে ধরল—তাদের এক চোখে হাসি আর এক চোখে কান্না। আর দময়ন্তী কতকাল পরে তাঁর আদরের ধন ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে বুকে টেনে নিলেন।

দিন কাটতে লাগল। কিন্তু কোথায় নল? ভোর হয়—দময়ন্তী জল-ভরা ডাগর দুটি চোখ মেলে বসে থাকেন নীরব প্রতীক্ষায়। দিনের শেষে রাত্রি আসে। তারায় ভরা আকাশে বসে চাঁদের রাজসভা—দময়ন্তী নির্নিমেষ চোখে সেখানে পাঠিয়ে দেন তাঁর নীরব জিজ্ঞাসা। তাঁর অসহায় ভাষাহীন শোকে বাবা মা সখীরা আড়ালে চোখের জল মোছেন।

মহারাজ ভীম শেষ পর্যন্ত নলের সন্ধানে আবার সব দিকে লোক পাঠানো স্থির করলেন। তারা যাবার আগে, কয়েকটি কথা দময়ন্তী তাদের বলে দিলেন। বললেন—"আপনারা রাজ্য-জনপদ যেখানেই যাবেন, সেখানেই একটি কথা বার বার বলবেন। 'বলবেন—'হে নিষ্ঠুর পাষাণ, অর্ধেক কাপড়ে অসহায় স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় নির্জন বনে একলা ফেলে তুমি কোথায় গেলে? এর জন্য কি তোমার একটুও অনুতাপ হয় না? স্ত্রী তোমার আজো সেই অর্ধেক কাপড়ে তোমারি পথ চেয়ে বসে আছে। বলে দাও, কবে তার কান্নার শেষ হবে? ওগো নিষ্ঠুর, দয়া করে তার কথার উত্তর দাও।' কোন লোক এ কথার উত্তর দিলে তখুনি এসে আমাকে জানাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, কেউ যেন আপনাদের পরিচয় না পায়।"

দিকে দিকে দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ল ভীমের লোক। কোনো জায়গায়ই তারা খুঁজতে বাকি রাখল না। শেষে একজন ছাড়া সবাই একে একে ফিরে এল হতাশ হয়ে। নৈরাশ্যের অমানিশার মাঝে শেষ প্রদীপ-শিখার মত দময়ন্তীর মনেও তাই জেগে রইল একটুখানি ক্ষীণ আশা।

বহুদিন কেটে গেল। শেষে ফিরে এলেন সেই শেষজন—পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ। দময়ন্তীকে বললেন—"ঘুরতে ঘুরতে একদিন অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণের রাজসভায় গিয়ে আমি বারবার বললাম আপনার কথাগুলো। কিন্তু রাজা বা সভাসদ্‌বর্গ কেউই কোন জবাব দিলেন না দেখে, ফিরে আসছি —এমন সময় বাহুক নামে রাজার প্রধান সারথি আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন নির্জনে। লোকটি দেখতে যৎপরোনাস্তি কুৎসিত। হাত দুখানা তার খুবই ছোট। রথ চালাতে আর রান্নার কাজে সে নাকি খুব ওস্তাদ। আপনার কথাগুলো শুনে সে বেদনার্ত কণ্ঠে বলল—'যারা কুললক্ষ্মী সতী, তারা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও, শত দুঃখকষ্টেও কখনো স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয় না, নিজেদের ধর্মনষ্ট করে না, আর জীবন ও সম্মান রক্ষা করে চোখের মণির মত। তা ছাড়া দময়ন্তী তো জানেন, কত বড় দুর্বিপাকে পড়ে নল তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন—শোকে দুঃখে নলের তখন মতিভ্রম ঘটেছিল। আজ সেজন্যে কষ্ট ও অনুশোচনার তাঁর অন্ত নেই। নল আজ বড় দুঃখী। তিনি শুধু রাজ্যহীন, গৃহহারাই নন—দময়ন্তীর মত স্ত্রীকেও তিনি হারিয়েছেন এবং

তার পূর্বেকার সেই রূপ ও সৌন্দর্যও কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। সেই জন্যে দময়ন্তীর কখনো উচিত নয় নলের উপর রাগ করা।' এই বলে বাহুক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।"

চোখের জলে ভেসে দময়ন্তী শুনলেন সে সংবাদ। তারপর মাকে গিয়ে বললেন—"মা, আপনারা যখন চান আমার সুখের দিন আবার ফিরে আসুক, তখন আমার একটা বিশেষ গোপন কাজে আপনাকে মত দিতে হবে, কিন্তু বাবাকে জানাতে পারবেন না।"

মা রাজী হতেই দময়ন্তী সুদেবকে ডেকে বললেন—"সুদেব, এখনি তোমাকে অযোধ্যায় রওনা হতে হবে। ঋতুপর্ণকে গিয়ে বলবে, মহারাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর আবার স্বয়ংবর হবে। আগামী কাল সূর্য উঠলেই তিনি দ্বিতীয় স্বামী বরণ করবেন। ইচ্ছে হলে আপনিও যেতে পারেন সেখানে।"

বিস্মিত সুদেব চলে গেলেন। দময়ন্তী বসে রইলেন পাথরের মূর্তির মত। একমাত্র ভরসা—পৃথিবীতে নল ছাড়া অশ্ববিদ্যায় এত দক্ষতা আর কারো নেই, যিনি এক দিনের মধ্যে অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে পেঁছাতে পারেন। তবু এ ভরসা যদি মিথ্যে হয়!—বাহুক যদি নল না হন! বড় সাংঘাতিক পরীক্ষা!

॥ সাত ॥

সুদেব এদিকে অযোধ্যায় এসে দময়ন্তীর স্বয়ংবরের খবর দিতেই ঋতুপর্ণের মন আনন্দে নেচে উঠল। তখনি বাহুককে ডেকে তিনি বললেন—"বাহুক, বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর আবার স্বয়ংবর হবে। তুমি বলেছিলে, অশ্ববিদ্যায় তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। একদিনের মধ্যে আমি বিদর্ভে পেঁছাতে চাই। পারবে তুমি নিয়ে যেতে?"

হঠাৎ যেন বাজ পড়ল। নলের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল নিজের অজ্ঞাতেই। চোখের সামনে ঘুরতে লাগল জগৎসংসার—'দময়ন্তী কি তাহলে এইভাবেই আমার উপর প্রতিশোধ নিলে? ভুলতে পারলে সে তার দুর্ভাগা স্বামীকে?'

চোখের দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে এল। আচ্ছন্নের মত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর কিছুটা আত্মস্থ হয়ে করজোড়ে ঋতুপর্ণকে তাড়াতাড়ি বললেন—"তাই হবে মহারাজ। একদিনের মধ্যেই আপনাকে বিদর্ভনগরে পেঁছে দেব।"

তখুনি ঋতুপর্ণ রওনা হলেন। বার্ষ্ণেয়ও চলল বাহুকের সহকারী হয়ে। বাহুকের রথ যেন উড়ে চলল আকাশপথে। ভয়ঙ্কর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে চোখের নিমেষে পিছনে ফেলে চলল কত রাজ্য, কত জনপদ, কত পর্বত মরু মহারণ্য।

বাহুকের দক্ষতা দেখে আর রথের গর্জন শুনে ঋতুপর্ণ ও বার্ষ্ণেয় বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন। বার্ষ্ণেয়র মনে প্রশ্নের ঝড় উঠল।—কে ইনি? ইন্দ্রের সারথি মাতলি? অথবা অশ্ববিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেবতা শালিহোত্র? অথবা—অথবা—ইনি কি মহারাজ নল? নলের মতই ইনি পারদর্শী, বয়সও তাঁরই মত। কিন্তু চেহারায় তো কোন মিল নেই।

বাহুকের ক্ষমতা দেখে ঋতুপর্ণের মনে কিন্তু ঈর্ষা জাগল। সামনেই কিছুদূরে ফল-পাতায় ভরা প্রকাণ্ড একটা গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁরও যে কিছু অসাধারণ ক্ষমতা আছে, সেইটা জাহির করার জন্যে ঋতুপর্ণ বললেন—"বুঝলে বাহুক, সবারই যে সবরকম ক্ষমতা থাকবে, তার কোন মানে নেই। অশ্ববিদ্যায় তোমার যেমন দক্ষতা রয়েছে, আমারও তেমনি অন্য কয়েকটি ক্ষমতা আছে। গণনা বিদ্যায় আমি পারদর্শী। সামনে ওই যে প্রকাণ্ড গাছটা দেখছ, চোখের নিমেষেই আমি ওর ফল-পাতা সব গনে দিতে পারি।" এই বলে ঋতুপর্ণ সঙ্গে সঙ্গে গাছটির ফল ও পাতার সংখ্যা বলে দিলেন।

বাহুক ঋতুপর্ণের মনের ভাব বুঝতে পেরে তখুনি রথ থামিয়ে বললেন—"মহারাজ আপনার কথা সত্য কিনা, আমায় তা যাচাই করে দেখতে হবে। গাছটির সব ফল ও পাতা গনে তবেই আমি যাব।"

ঋতুপর্ণের চোখ কপালে উঠল। বললেন—"বলছ কি, বাহুক? এখন তো দেরি করার সময় নেই, ও গনতে যে বহু সময় লাগবে।"

কিন্তু বাহুক নাছোড়বান্দা। শেষে বহু তর্কাতর্কির পর ঋতুপর্ণের অনুরোধে পড়ে বাহুক ছোট একটা ডালের ফল পাতা গনতে রাজী হলেন এবং দেখলেন—রাজার কথাই ঠিক। বিস্মিত হয়ে তিনি ঋতুপর্ণের প্রশংসা করতেই ঋতুপর্ণ আরো খুশী হয়ে বললেন—"গণনাবিদ্যাতেই শুধু নয় বাহুক, অক্ষ বিদ্যাতেও আমি সুপণ্ডিত।"

করজোড়ে বাহুক বললেন—"মহারাজ আমার একটা নিবেদন আছে। দয়া করে আপনি আমাকে অক্ষবিদ্যা শিখিয়ে দিন, তার বদলে আপনাকে আমি অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে দেব।"

ঋতুপর্ণের আপত্তির কোন কারণই ছিল না, সানন্দে তিনি রাজী হলেন। তারপর জনশূন্য সেই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দুজন দুজনকে নিজের নিজের বিদ্যা শিখিয়ে দিতেই ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। অক্ষবিদ্যার জোরে নলের দেহের মধ্যে কলি যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। কর্কোটক সাপের বিষ বমি করতে করতে হাউমাউ করে সে বেরিয়ে এল তখনি। সঙ্গে সঙ্গে নলও যেন রাহুমুক্ত হলেন—দীর্ঘকালের কঠিন জ্বর-যেন ছেড়ে গেল। আবার ফিরে এল তাঁর আগেকার সেই তীক্ষ্ম ধী-শক্তি, সেই অসাধারণ বিচারবুদ্ধি।

সামনে কলিকে দেখেই নল বিষম রাগে জ্বলে উঠলেন। তাকে শাপ

দিতে যেতেই কলি অন্যের অলক্ষ্যে থেকে করজোড়ে কেঁদে বলল—"মহারাজ, রক্ষা করুন আমাকে। আপনার দেহের মধ্যে আমি ছিলাম বটে, কিন্তু বড় দুঃখেই আমার দিন কেটেছে। দময়ন্তীর অভিশাপে আর কর্কোটক সাপের বিষে অহরহ আমি জর্জরিত হয়েছি। যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা কল্পনাতীত। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন আমি আপনার শরণাগত। যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, থাকবে এই অরণ্য-পর্বত, ততদিন আপনার কীর্তিও অক্ষয় হয়ে থাকবে। এবারের মত আমায় ক্ষমা করুন, মহারাজ।"

কলির কাকুতি শুনে নলের দয়া হল। তিনি ক্ষমা করলেন তাকে। কলিও অমনি উঠি-পড়ি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঢুকল গিয়ে সেই প্রকাণ্ড গাছটার ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে ফুল-ফল-পাতায় ভরা অত বড় মহীরুহ নিমেষের মধ্যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আর বাহুকবেশে নল আবার রথ চালিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার সময় ঋতুপর্ণের রথ এসে পৌঁছাল কুণ্ডিনপুরে। রথের মেঘের মত গর্জন শুনে দময়ন্তী আনন্দে আত্মহারা। এ রথ-নির্ঘোষ যে তাঁর অতি পরিচিত। তাড়াতাড়ি তিনি ছাদে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু যা দেখলেন তাতে চোখে তাঁর জল এল, তিনি দেখলেন—ঋতুপর্ণ ও বার্ষ্ণেয়র সঙ্গে সারথি হিসাবে যে লোকটি এসেছে, সে বাহুক বটে; কিন্তু যত ছদ্মবেশই নল ধরুক না কেন, ওই কুৎসিত চেহারার লোকটির সঙ্গে তাঁর চেহারার এতটুকু মিলও তো কোথাও নেই।

শত যোজন পথ পার হয়ে ঋতুপর্ণের এই আকস্মিক আগমনে মহারাজ ভীমেরও কিন্তু বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কিছুই জানতেন না তিনি। স্বয়ংবরের কোন আয়োজন নেই দেখে ওদিকে ঋতুপর্ণও কম আশ্চর্য হননি। তাঁর ধারণা হল, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গুরুতর বিভ্রাট ঘটেছে। তাই ভীম তাঁকে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করতেই বুদ্ধিমানের মত আসল উদ্দেশ্যটা চেপে গিয়ে তিনি বললেন—"কারণ আর কি মহারাজ! এই এলাম আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে।"

ভীম আরও অবাক হলেন। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে ঋতুপর্ণের রাত্রিবাসের জন্যে রাজোচিত ব্যবস্থা করে দিলেন।

আর, রথ নিয়ে ওদিকে বাহুক গেলেন অশ্বশালায়। ঘোড়াগুলোর ঠিকমত ব্যবস্থা করে তিনি রথের উপর বসলেন বিশ্রাম করতে।

আর দময়ন্তী? মন তাঁর অশান্ত। কেন কে জানে—নলের বদলে বদাকার ওই লোকটাকে দেখে কোথায় মন তাঁর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠবে, তা না অকারণ আনন্দে বারবার চঞ্চল হয়ে উঠছে। শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে তিনি কেশিনী নামে এক দূতীকে ডেকে আনালেন, নানা উপদেশ দিয়ে তাকে পাঠালেন বাহুকের কাছে।

বুদ্ধিমতী কেশিনী—বাহুকের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলল। ফিরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বাহুককে সে নল সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করল। যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে বাহুকও তার উত্তর দিলেন।

তারপরেই হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে কেশিনী জিজ্ঞেস করে বসল—"আচ্ছা বাহুক, আপনার হয়তো মনে আছে, একজন ব্রাহ্মণ অযোধ্যার রাজসভায় গিয়ে কতকগুলো কথা বলেছিলেন, আপনি তার যে উত্তর দিয়েছিলেন সেইটে আবার আপনাকে দয়া করে বলতে হবে—দময়ন্তী শুনতে চান।"

নিমেষের মধ্যে কোথায় ভেসে গেল বাহুকের এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ। অভিমানী মন তাঁর শিশুর মত কেঁদে উঠল। চোখের জল আর বাধা মানল না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবার তিনি সেই কথাগুলো সব বললেন, যা পর্ণাদকে বলেছিলেন এক সময়।

কেশিনী আর সেখানে দাঁড়াল না, দময়ন্তীকে গিয়ে খুলে বলল সব কথা। দময়ন্তী তাকে আবার পাঠালেন বাহুকের কাছে। বলে দিলেন—"কোন কথা না বলে খুব ভালভাবে তুমি বাহুকের কাজকর্ম আচরণ সব লক্ষ্য করবে। তিনি চাইলেও, তাকে জল বা আগুন দেবে না। দেখবে তিনি কি করেন।"

কেশিনী চলে গেল। কিছু সময় পরে যখন সে ফিরে এল, তখন বিস্ময়ে চোখ তাঁর কপালে উঠেছে। বিষম উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল—"দেবী, এমন অদ্ভুত মানুষ আর এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড আমি জীবনে দেখিনি, শুনিওনি কখনো। দেখলাম, খুব নীচু এই এতটুকু দরজা দিয়ে ঢুকবার সময়েও তিনি আমাদের মত মাথা নোয়ালেন না, দরজাই আপনা থেকে উঁচু হয়ে গেল। রান্নার জন্যে যে মাংস পাঠানো হয়েছিল, তা ধোয়ার সময় তিনি পাশের খালি কলসটার দিকে তাকানো মাত্রই সেটা জলে ভরে গেল। রান্নার জন্যে আগুন দরকার—তিনি একমুঠো ঘাস নিয়ে চোখ বুজে একটুক্ষণ বসতেই আগুন জ্বলে উঠল। শুধু কি তাই? দেখলাম, তিনি আগুনে পোড়েন না। ফুলকে তিনি যতই মর্দন করুন না কেন, তা একটুও নষ্ট হয় না, বরং আরো ভালভাবে ফুটে ওঠে, সুগন্ধ তার আরো বেড়ে যায়।"

কেশিনীর কথা শুনে দময়ন্তী দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর কেশিনীর সঙ্গে ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে পাঠালেন বাহুকের কাছে। এই তাঁর শেষ পরীক্ষা।

দীনহীনের মত বাহুক মাথায় হাত দিয়ে একলা বসেছিলেন। হঠাৎ ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে দেখে চমকে উঠলেন। স্থান কাল ভুলে গেলেন তিনি—অভিভূতের মত ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দুই আদরের ধনকে। এত দিনের দুঃখ ব্যথা সব অশ্রু হয়ে নীরবে ঝরতে লাগল তাদের মাথার উপরে।

দময়ন্তীর সমস্ত সংশয় দূর হল এবার। বাবা-মার অনুমতি নিয়ে

বাহুককে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। বললেন—"আচ্ছা বাহুক, বলতে পারো, নল ছাড়া এমন আর কোন্ ধার্মিক পুরুষ আছেন, যিনি নিজের ঘুমন্ত স্ত্রীকে বিনা দোষে নির্জন বনে একলা ফেলে চলে গেছেন ?"

নল বুঝলেন, আর আত্মগোপন করা বৃথা। দুঃখের রাত্রি শেষ হল এতদিনে। কর্কোটক নাগের দেওয়া কাপড় পরতেই আবার তিনি ফিরে পেলেন তাঁর আগেকার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ও যৌবন। তিন বৎসরের অশেষ দুঃখ-বেদনার পর নল-দময়ন্তীর আবার মিলন হল।

তারপর শ্বশুরালয়ে একমাস আনন্দ-উৎসবে কাটিয়ে নল একদিন সসৈন্যে রওনা হলেন নিষধের দিকে। রাজধানীতে পেঁৗছে পুষ্করকে তিনি আবার পাশাখেলায় আহ্বান জানালেন। দময়ন্তীকেই বাজী রাখলেন এবার। নলের কথা শুনে পুষ্করের স্ফূর্তি যেন ফেটে পড়ল। আর, নলের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল দুরন্ত রাগে। তখনি শুরু হল পাশাখেলা।

তারপর মাত্র দুই দানেই নল পুষ্করের রাজ্যসম্পদ, এমন কি তার জীবন পর্যন্ত জয় করে নিলেন। কোথায় গেল পুষ্করের সেই আস্ফালন, কোথায়ই বা গেল সেই স্ফূর্তি। চোখে মুখে ফুটে উঠল দারুণ আতঙ্ক। তার অবস্থা দেখে নলের মন কেঁদে উঠল। কোথায় চলে গেল তাঁর এতদিনের পুঞ্জীভূত রাগ-অভিমান। তবু রাগের ভান করে তিনি বললেন—"কিরে হতভাগা! কি ভাবছিস এখন? যে নীচতা তুই দেখিয়েছিস, যেসব জঘন্য অপরাধ করেছিস ছোট ভাই হয়ে, তার শাস্তি কি জানিস ?—শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

ভয়ে পুষ্করের কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে এল। আচ্ছন্নের মত সে বসে রইল চোখ বড় বড় করে। নল আর স্থির থাকতে পারলেন না। পুষ্করকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"ওরে বোকা, তোকে কি আমি মারতে পারি? তুই যে আমার ছোট ভাই! যত অপরাধই করে থাকিস না কেন, ভাই কি ভাইকে ক্ষমা না করে থাকতে পারে রে? অনেক আগেই তোকে আমি ক্ষমা করেছি। যা—আমার রাজ্যের এক অংশ তোকে দিলাম। তাছাড়াও আমি আশীর্বাদ করছি, পুষ্কর—একশ' বছর পরমায়ু লাভ করে তুই সুখে ও শান্তিতে রাজত্ব করবি।"

পুষ্কর কেঁদে লুটিয়ে পড়ল দাদার পায়ে। এ যে কত বড় শাস্তি, তা কি সে এর আগে কোনো দিন ভাবতে পেরেছে? তার চোখের জলে নলের পা দু' খানাই শুধু ভিজল না, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল তার মনের যত পাপ ও গ্লানি।

আবার সুখের প্রদীপ জ্বলল নিষধের ঘরে ঘরে। দেশময় শুরু হল মহোৎসব! ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে নিয়ে নল ও দময়ন্তী পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

অনেক অনেক যুগ আগে—মহাভারতের একটা দিন।

বনবাসের বারো বৎসর শেষ হতে চলেছে। কাম্যক বন ত্যাগ করে স্ত্রী দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবেরা এসেছেন দ্বৈতবনে। সেখানেই কুটির বেঁধেছেন।

দ্বৈত বন তাঁদের মুগ্ধ করেছে। বনের মাঝে মাঝে তরুবীথির অন্তরালে এখানে ওখানে মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের আশ্রম-কুটির, লতায় পাতায় ছাওয়া শান্ত-সুন্দর তপোবন। সেখান থেকে উদাত্ত কণ্ঠের বেদমন্ত্র গান ভেসে আসে। যজ্ঞের ধূমরেখা আকাশে ওঠে নীরব প্রার্থনার মত। ছায়াঘন স্নিগ্ধশ্যামল বনভূমি ফল ও ফুলের গন্ধে ভরপুর!

সেদিন কুটিরের সামনে বসে আছেন পঞ্চপাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। সবাই নীরব, গভীর চিন্তামগ্ন।—

সুদীর্ঘ বনবাস তাঁদের নিরাপদে কাটেনি। বনবাসের কষ্ট ছাড়াও গুরুতর নানা আপদে বিপদে তাঁরা বারে বারে বিপন্ন হয়েছেন। দুর্ভাগ্য তাঁদের অনুসরণ করেছে ছায়ার মত। অথচ শিক্ষাদীক্ষায়, বীরত্বে ও বাহুবলে ভারতবর্ষে তাঁরা অজেয় অদ্বিতীয়। আর জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তো সবারই শ্রদ্ধার পাত্র। সকলের কাছে ধর্মরাজ বলে তিনি সুপরিচিত। তবু তাঁরা কেন আজ এত দীনহীন? কেন সামান্য বনবাসী?

নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতায় তাঁরা সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে উঠেছিলেন, আর লাভ করেছিলেন অফুরন্ত ধনসম্পদ। কিন্তু তাঁদের এই সৌভাগ্য দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সহ্য হয়নি। সহ্য করতে পারেনি শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি তাদের অনুচরের দল। চিরকাল তারা পাণ্ডবদের হিংসা করেছে, তাদের ক্ষতি করেছে, হত্যার চেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

এবারও সেই কৌরবদের কুটিল চক্রান্তে শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায় তাঁরা

রাজ্য-সম্পদ সব কিছু হারিয়ে বনবাসী হয়েছেন। বারো বৎসর বনবাসের এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জীবন গ্রহণ করেছেন।

বনবাস শেষ হতে চলেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে অজ্ঞাতবাস। কোথায় কি ভাবে সেই একটা বৎসর কাটবে, কে জানে! তার পরেই বা কি ঘটবে? কৌরবদের কাছ থেকে তাঁরা কি ফিরে পাবেন নিজেদের রাজ্য-সম্পদ?

চিন্তাকুল মুখে পঞ্চপাণ্ডব বসে আছেন। অন্ধকার বর্তমান আর অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তায় মন তাঁদের ভারাক্রান্ত। এমন সময় অদূরবর্তী আশ্রম থেকে এক ব্রাহ্মণ ছুটে এলেন, রুদ্ধশ্বাসে বললেন, যুধিষ্ঠিরকে—"মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে। গাছে টাঙানো ছিল আমার অরণি ও মন্থদণ্ড*। এক হরিণ এসে গা ঘষছিল সেখানে। হঠাৎ অরণি ও মন্থদণ্ড তার শিঙে আটকে যেতেই সেগুলি সমেত সে পালিয়ে গেছে। আপনারা ছাড়া সেগুলি উদ্ধার করবার আর কোনো আশা নেই। হায় হায়! সব কাজ বুঝি আমার পণ্ড হল, যজ্ঞও বুঝি নষ্ট হল।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির তখুনি ভাইদের নিয়ে রওনা হলেন হরিণের খোঁজে। কিছুদূর গিয়ে হরিণের দেখা পেতেই তাঁরা ছুটলেন তার পিছনে। নানারকম বাণ ছুঁড়তে লাগলেন সবাই মিলে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! একটা বাণও হরিণের গায়ে লাগল না। ছুটতে ছুটতে সে প্রবেশ করল এক মহারণ্যে, তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর সে মহারণ্য। সেখানে পাতি পাতি করে খুঁজেও পাঁচ ভাই কোথাও হরিণের দেখা পেলেন না। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে শেষে এক বট গাছের ছায়ায় এসে তাঁরা বসলেন। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে—প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে নকুল বললেন—"দাদা, আমাদের বংশে কখনো ধর্মের হানি হয় নি। কুড়েমি করে কোনো কাজ কখনো আমরা ফেলে রাখিনি, এবং কোনো কাজে বিফলও হইনি কখনো। তাছাড়া কেউ কিছু প্রার্থনা করলে তাকেও কখনো আমরা ফিরিয়ে দিইনি। তবু কেন আমাদের সকল চেষ্টা-যত্ন আজ এমনভাবে ব্যর্থ হল? কেন এমন ঘটল?"

---

*পুরাকালে বর্তমানের মত আগুন জ্বালার ব্যবস্থা ছিল না। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালা হত। একখানা কাঠের সঙ্গে আর একখানা কাঠের দণ্ড মন্থন করতেই আগুন জ্বলে উঠত। নীচের কাঠকে বলা হত 'অরণি', উপরের কাঠকে বলা হত 'মন্থদণ্ড'। অরণি ও মন্থদণ্ড সেকালের লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ আশ্রমবাসীদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। এর অভাব হলে আগুন জ্বলত না। তার ফলে যাগযজ্ঞ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও অচল হয়ে পড়ত।

মৃদুস্বরে যুধিষ্ঠির বললেন—"ভাই, দুঃখ কোরো না। বিপদ যে কত রকমের আছে, তার সীমা নেই। সব বিপদের কারণও সব সময় জানা যায় না। নিজের কর্মফলই মানুষ ভোগ করে।"

উত্তেজিত হয়ে ভীম বললেন—"কথাটা ঠিক! কর্মফলই বটে। আমরা পাশাখেলায় হেরে যাবার পর দুঃশাসন যখন বস্ত্রহরণ করার জন্যে দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় টেনে এনেছিল, তখন তাকে আমি হত্যা করিনি। সেই পাপেই আজ আমাদের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।"

রাগত কণ্ঠে অর্জুন বললেন—"আমার মনে হয়, সূতের ছেলে কর্ণ সেই সভার মধ্যে অপমানজনক যে সব হীন কটু কথা আমাদের বলেছিল, নীরবে সে সব সহ্য করার ফলেই আজ আমাদের এই দশা হয়েছে।"

সহদেব বললেন—"আমার বিশ্বাস, শকুনি যখন কপট পাশাখেলায় আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল, তখন তাকে হত্যা করা আমার উচিত ছিল। তা করিনি বলেই আজ আমাদের কষ্টের সীমা নেই।"

যুধিষ্ঠির কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলেন। ভাইদের খেদোক্তি শেষ হলে বললেন—"নকুল, সবারই বড় পিপাসা পেয়েছে। একবার গাছে উঠে দেখো তো কাছাকাছি কোথাও জল আছে কিনা।"

যুধিষ্ঠিরের কথামত নকুল গাছে উঠে একটু পরেই বললেন—"ওই ওদিকে কিছু দূরে এমন সব গাছ দেখা যাচ্ছে, যেগুলো শুধু জলের ধারেই জন্মায়। সারসের কলরবও ভেসে আসছে সেখান থেকে। ওখানে নিশ্চয়ই কোন জলাশয় আছে।"

যুধিষ্ঠির বললেন—"তাহলে এক কাজ কর, ভাই। এখনি তুমি একবার যাও। এই তূণগুলিতে করে জল ভরে নিয়ে এস।"

গাছ থেকে নেমে নকুল তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেলেন এক নির্মল সরোবর। তাড়াতাড়ি সরোবরে নেমে তিনি জলপান করতে যাবেন, এমন সময় শুনলেন অন্তরীক্ষ থেকে কে যেন বলছে—"দাঁড়াও নকুল, জলপান কোরো না। আমিই এ সরোবরের কর্তা। আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও, তার পরে জলপান করো।"

জল দেখে নকুলের পিপাসা তখন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আকাশবাণী তিনি গ্রাহ্য করলেন না—জল মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন তিনি। মৃত্যুও ঘটল সঙ্গে সঙ্গে।

নকুলের দেরি দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে তাঁর খোঁজে পাঠালেন। সরোবরের কাছে এসে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃতদেহ দেখে সহদেব শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিপাসাও যেন শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি জলে নামতেই

আবার সেই আকাশবাণী হল। তা গ্রাহ্য না করে তিনি জল মুখে দিতেই নকুলের মত তাঁরও মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এদিকে সহদেব ফিরছেন না দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে পাঠালেন। কিন্তু অর্জুনও যখন ফিরে এলেন না, তখন নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে তিনি ভীমকে পাঠালেন সকলের খোঁজে।

কিন্তু যে যায়, সে আর ফেরে না। ভীমও ফিরলেন না। বেলা গড়িয়ে এল। শেষে ভাইদের জন্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আর স্থির থাকতে না পেরে যুধিষ্ঠির নিজেই রওনা হলেন তাঁদের খোঁজে। কিছুসময় পরে নির্জন সেই মহারণ্যে সরোবরতীরে আসতেই তিনি হঠাৎ আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দেখলেন মর্মভেদী এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। তাঁর মহাবল পরাক্রান্ত চার ভাই ধুলোয় পড়ে আছে। দেহ তাঁদের প্রাণহীন।

বিহ্বল যুধিষ্ঠির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপরেই হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।—

কে তাঁর এমন সর্বনাশ করল? নিমেষে কে নির্মূল করে দিল তাঁর সব সহায়-সম্বল, সমস্ত আশা-ভরসা? এক এক ভাইয়ের কাছে যুধিষ্ঠির যান, আর আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন।

ভাইদের গায়ে অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন নেই, মাটিতেও কোনো পায়ের চিহ্ন নজরে পড়ে না। তাহলে অশরীরী কোনো দুষ্ট ভূতই কি তাদের হত্যা করল? না, এটা দুর্যোধন-শকুনির কাজ? তারাই কি এ সরোবরের জল বিষাক্ত করে রেখে গেল?

হায় হায় করে কাঁদছেন যুধিষ্ঠির, চোখের জলে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন ভাইদের। শেষে পাগলের মত হয়ে তিনি সরোবরের জলে নামতেই, অন্তরীক্ষ থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"থামো যুধিষ্ঠির, জল পান কোরো না। আমি জলচর বক পাখি, এই সরোবরের মালিক। আমিই তোমার ভাইদের যমালয়ে পাঠিয়েছি। আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। তার জবাব না দিয়ে তুমিও যদি জল খাও, তাহলে তোমারও ভাইদের মত দশা ঘটবে।"

জনশূন্য নিবিড় মহাবন। যুধিষ্ঠিরের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অভিভূতের মত তিনি বললেন—"কে আপনি, মহাবল? দেব দানব গন্ধর্ব রাক্ষসও যাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন, মহাপর্বতের মত আমার সেই চার ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। এটা কখনো সামান্য জলচর পাখির কর্ম নয়। আপনি নিশ্চয়ই মহাশক্তিশালী কোনো দেবতা। আপনার উদ্দেশ্য কি, বুঝতে না পেরে আমার বড়ই ভয় হচ্ছে, উদ্বিগ্ন বোধ করছি। দয়া করে বলুন আপনি কে?"

যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে আসতেই অদূরে মহাভয়ংকর এক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। [পৃষ্ঠা ৭৬]

অন্তরীক্ষ থেকে উত্তর এল—"ঠিকই বলেছ যুধিষ্ঠির। আমি যক্ষ—জলচর পাখি নই।"

যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে আসতেই অদূরে মহাভয়ংকর এক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখলেন সূর্যের মত তেজস্বী ভীষণ-দর্শন এক বিশালকায় পুরুষ গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মেঘের মত গর্জন করে তিনি বললেন—"যুধিষ্ঠির, তোমার ভাইদের আমি বার বার নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য না করে তারা জলপান করেছিল বলেই তাদের হত্যা করেছি। এখন তোমাকেও বলছি, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল পান করো।"

যুধিষ্ঠির বললেন—"যক্ষ, আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার জিনিসে হাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। আপনি প্রশ্ন করুন, সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করব।"

যক্ষ খুশি হয়ে বললেন—"বেশ। আচ্ছা, বলো তো—কি করলে ব্রাহ্মণ দেবত্ব লাভ করেন? কোন্ ধর্ম পালন করলে তাঁরা সাধু হন? তাঁদের মধ্যে মানুষের মত বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি? এবং কি কাজ করলে তাঁরা অসাধু হন?"

যুধিষ্ঠির উত্তর করলেন—"বেদপাঠ করলে ব্রাহ্মণ দেবত্ব লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা লাভ করেন সাধুতা। মানুষের মত তাঁদের মৃত্যু হয় বলেই তাঁরা মানুষ। আর পরনিন্দা-পরচর্চা করলে তাঁরা অসাধু হন।"

যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন—"কোন কাজ করলে ক্ষত্রিয় দেবত্ব লাভ করেন? তাঁদের পক্ষে কোন্‌টি সাধু-ধর্ম। মানুষের মত বৈশিষ্ট্য তাঁদের কোন্‌টি? আর কোন্‌টিই বা তাঁদের পক্ষে পাপ কাজ?"

যুধিষ্ঠির বললেন—"অস্ত্রচালনায় দক্ষ হলে ক্ষত্রিয়েরা দেবত্ব লাভ করেন। যজ্ঞই তাঁদের সাধু-ধর্ম? ভয় তাঁদের মনুষ্যভাব। আর শরণাগতকে আশ্রয় না দেওয়া তাঁদের পক্ষে মহাপাপ।"

একটু চুপ করে থেকে যক্ষ আবার জিজ্ঞেস করলেন—"পৃথিবীর চেয়ে কে বড়? কে-ই বা বেশি পূজনীয়? আকাশের চেয়ে কে উঁচু? বাতাসের চেয়ে কে দ্রুতগামী? আর তৃণের চেয়েও কার সংখ্যা বেশি?"

যুধিষ্ঠির বললেন—"মা পৃথিবীর চেয়ে বড়, পৃথিবীর চেয়েও তিনি পূজনীয়। বাবা আকাশের চেয়ে উঁচু। বাতাসের চেয়ে মন দ্রুতগামী। আর চিন্তা তৃণের চেয়েও সংখ্যায় বেশি।"

যক্ষ আবার প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, তাড়াতাড়ি বলো তো—ঘুমোলেও কে চোখ বন্ধ করে না? জন্মেও কে স্পন্দিত হয় না। কার হৃদয় নেই? এবং কে, যতই বেগ বাড়তে থাকে, ততই বৃদ্ধি পায়?"

যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"মাছ ঘুমিয়েও চোখ বন্ধ করে না। জন্মাবার পর ডিম স্পন্দিত হয় না। পাষাণের হৃদয় নেই। এবং বেগ যতই বাড়তে থাকে, নদীও ততই বৃদ্ধি পায়?"

যক্ষ বললেন—"প্রবাসী, গৃহস্থ, রোগী আর মুমূর্ষু ব্যক্তির বন্ধু কে, বলতে পারো?"

যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন—"প্রবাসীর বন্ধু সঙ্গী। গৃহস্থের বন্ধু স্ত্রী। রোগীর বন্ধু চিকিৎসক। আর মুমূর্ষুর বন্ধু দান-কর্ম।"

যুধিষ্ঠিরের গভীর পাণ্ডিত্য দেখে যক্ষ মুগ্ধ হলেন। বললেন—"বেশ। আচ্ছা যুধিষ্ঠির, কি ত্যাগ করলে সকলের প্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে শোক হয় না? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনশালী হতে পারে? আর কি ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—"অভিমান ত্যাগ করলে সকলের প্রিয় হওয়া যায়। রাগ ত্যাগ করলে কোন শোক হয় না। কামনা ত্যাগ করলে মানুষ অর্থশালী হতে পারে। এবং লোভ ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়।"

স্নেহভরা চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যক্ষ বললেন—"যুধিষ্ঠির, লোকে বলে, তুমি মহাজ্ঞানী। দেখলাম, সত্যিই তুমি তাই। তবু আরো দু'একটি প্রশ্ন তোমায় করব। বলো তো—মানুষের কোন্ শত্রু দুর্জয়? কোন্ ব্যাধি অনন্ত? কোন্ জাতীয় লোক সাধু? আর কারাই বা অসাধু?"

যক্ষের প্রশংসায় শোকদগ্ধ যুধিষ্ঠিরের মনে কোনই ভাবান্তর এল না। গম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—"ক্রোধ মানুষের দুর্জয় শত্রু। লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্বজনের হিতকারী, তিনিই সাধু। আর নিষ্ঠুর ব্যক্তিরাই অসাধু।"

যক্ষ আবার জিজ্ঞেস করলেন—"প্রিয় মিষ্টি কথা বললে, বিবেচনার সঙ্গে কাজ করলে, বন্ধুর সংখ্যা বেশি হলে আর ধর্মে অনুরক্ত থাকলে কি লাভ হয়?"

যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন—"প্রিয়ভাষী যাঁরা তাঁরা সকলেরই প্রিয় হন। যে ব্যক্তি যত বেশি বিবেচক, কাজকর্মে তিনি তত বেশি সফল হন। বন্ধুর সংখ্যা বেশি হলে মানুষ সুখী হয়। এবং ধর্মে অনুরক্ত থাকলে সদ্গতি লাভ হয়।"

এই ভাবে আরও বহুক্ষণ ধরে প্রশ্নোত্তর চলল। একের পর এক যক্ষ আরও বহু প্রশ্ন করলেন। শান্ত সংযত কণ্ঠে তাঁর প্রত্যেকটিরই যথাযোগ্য উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির। যক্ষ শেষে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"যুধিষ্ঠির, তোমার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখে বড় সুখী হয়েছি। বর চাও তুমি। তোমার

ভাইদের মধ্যে একজনের নাম কর, যাকে তুমি বাঁচাতে চাও। আমার বরে সে প্রাণ ফিরে পাবে।"

যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন—"তাহলে নকুলকে বাঁচিয়ে দিন।"

যক্ষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কেন বল তো? ভীমসেন বা অর্জুনকে তুমি বাঁচাতে চাইছ না কেন? ভীম তোমার অত্যন্ত প্রিয়, দশহাজার হাতির বল তার গায়ে! আর মহাবীর অর্জুন! বলতে গেলে, সে-ই তোমাদের একমাত্র অবলম্বন! তবু এদের বদলে নকুলকে তুমি বাঁচাতে চাইছ কেন?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠির বললেন—"যক্ষ, আপনি যা বললেন, সবই সত্যি। তবু আরো কথা আছে। সকলেই আমায় ধর্মপরায়ণ বলে জানে। আমি কখনও জ্ঞানতঃ কোন অধর্ম করিনি—এখনও করব না। কুন্তী ও মাদ্রী, দুজনেই আমার জননী। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না—কুন্তী আমার, ভীম ও অর্জুনের গর্ভধারিণী, আর মাদ্রী আমাদের বিমাতা! নকুল ও সহদেব তাঁর আপন সন্তান। আমি বেঁচে থাকলে কুন্তী তবুও পুত্রবতী থাকবেন। কিন্তু মাদ্রীর যে কেহই রইল না! যক্ষ, যে কথা আপনি বলছেন, সে হল স্নেহের বা স্বার্থের কথা। কর্তব্যের বা ধর্মের কথা নয়। অন্যায় স্নেহ বা স্বার্থের তাগিদে—তা-সে দুঃখ-জ্বালা যতই আসুক না কেন—অধর্ম আমি করতে পারব না। আমি চাই, জননী কুন্তীর মত মাদ্রীও পুত্রবতী থাকুন। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা, মাদ্রীর জ্যেষ্ঠ সন্তান নকুলকে বাঁচিয়ে দিন।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে স্নিগ্ধ হাসিতে যক্ষের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সস্নেহে তিনি বললেন—"যুধিষ্ঠির, মানুষের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি অতুলনীয়; তোমার চার ভাইকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম।"

যক্ষের কথা শেষ হতে না হতেই পাণ্ডবেরা চারজন আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলেন, যেন ঘুম থেকে উঠলেন এইমাত্র। সচকিত হয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন, যক্ষ সরোবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। করজোড়ে যুধিষ্ঠির বললেন—"সত্যি কথা বলুন আপনি কে? আপনি যক্ষ নন—নিশ্চয়ই কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা। তাছাড়া আপনি আমাদের পরম সুহৃৎ।"

যক্ষ হেসে বললেন—"আমি তোমার দেব-পিতা ধর্ম। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই এসেছিলাম। তোমার পাণ্ডিত্য, ধর্মনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছি। তোমাদের কল্যাণ হোক। বর চাও তুমি।"

ধর্মরাজকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম জানিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন—"ব্রাহ্মণের

যে অরণি ও মন্থদণ্ড হরিণ নিয়ে গেছে, তিনি যেন আবার সেগুলি ফিরে পান, এই আমার প্রার্থনা।"

ধর্মরাজ বললেন—"তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যে আমিই হরিণের বেশ ধরে সেগুলি চুরি করেছিলাম। এই নাও। আর কোনও বর চাও তুমি।"

যুধিষ্ঠির বললেন—"বারো বৎসর বনবাসের কাল আমাদের শেষ হয়েছে। এখন এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। বর দিন—যেখানেই আমরা থাকি না কেন, কেউ যেন আমাদের চিনতে না পারে।"

ধর্মরাজ বললেন—"তাই হবে বৎস। তোমরা যদি ছদ্মবেশ না-ও গ্রহণ করো, তাহলেও ত্রিভুবনে কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না। অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর তোমরা বিরাট নগরে কাটাবে। এবং আমার বরে যে যেমন ইচ্ছা করেছ, সে তেমনি ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবে।"

যুধিষ্ঠিরকে এইরকম আরো নানা বর দিয়ে ধর্ম বিদায় নিলেন। যুধিষ্ঠিরও খুশি মনে চার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কুটিরে ফিরে এলেন। আর ব্রাহ্মণ ফিরে পেলেন তাঁর অরণি ও মন্থদণ্ড।

সেকালের বারাণসী। বারাণসীর অদূরে এক ছুতোর-পল্লী। কাঠের কাজ করে ছুতোরদের সংসার চলে।

একদিন এক ছুতোর কুড়ুল করাত নিয়ে বনে চলেছে কাঠ কাটতে। বনের ভেতর দিয়ে পায়ে-চলা সরু পথ। গাছ পরীক্ষা করতে করতে নিবিষ্ট মনে ছুতোর চলেছে। এমন সময় সে থমকে দাঁড়ালো ঃ কী ও! কান পেতে সে শুনলো, কোথা থেকে ভেসে আসছে এক ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

কন্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুতোর এগিয়ে গেল।

সামনেই এক গর্ত। শব্দ আসছে তার ভেতর থেকে। শুয়োরছানার গলা মনে হয়। এক মুহূর্ত ছুতোর কি ভাবলো, তার পরেই নেমে পড়লো গর্তের মধ্যে।

সত্যিই তাই। এক শুয়োর-ছানা পড়ে আছে সেখানে। বড় অসহায়। না খেতে পেয়ে ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাপ-মাকে হারিয়ে কদিন ওখানে পড়ে আছে, কে জানে!

আহা!

ছুতোর পরম যত্নে ছানাটিকে বুকে তুলে নিলে। তারপর তাড়াতাড়ি খানকয়েক কাঠ যোগাড় করে ফিরলো বাড়ির দিকে।

ছুতোর নিঃসন্তান। শুয়োর-ছানাটাই যেন তার সন্তান, তার ধ্যান-জ্ঞান—সব। ছুতোর তাকে লালনপালন করে নিজের ছেলের মতো। আদর করে তার নাম রেখেছে 'অনাথ'। অনাথকে সে সব সময় চোখে চোখে রাখে। অনাথের কখন কি বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে ছুতোরের দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

অনাথ বড় হয়। যত দিন যায়, ততই তার আকার বাড়তে থাকে। দেশের মানুষ—যে তাকে দেখে—সে-ই অবাক হয়। সবাই বলাবলি করে, আর কত বড় হবে হে শুয়োরটা!

ছুতোরও অবাক হয়, আর ততই অঢেল স্নেহ দিয়ে অনাথকে সে আড়াল করতে চায় লোকের লোলুপ কুদৃষ্টি থেকে।

শেষ পর্যন্ত অনাথ এক মহাকায় বরাহ হয়ে দাঁড়ালো। যেমন প্রকাণ্ড তার শরীর, তেমনি ভয়ংকর দুই বাঁকানো দাঁত—দেখলে বুক কাঁপে। গায়ের জোরও তার তেমনি। অন্য শুয়োর বা কুকুর-বেড়াল তো দূরের কথা, মোষের মতো বড় বড় জানোয়ারও ভয়ে তার কাছে ঘেঁষে না।

কিন্তু চেহারা ওরকম হলে কি হয়, অনাথের স্বভাব ভারি মিষ্টি। যেমন সে ধীর-শান্ত তেমনি বুদ্ধিমান। কারো অনিষ্ট সে ভুলেও করে না। কোন কথা একবার বললেই বুঝে নেয়।

ছুতোরের পেছনে সে ঘোরে ছায়ার মতো, কাজে কর্মে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করে। সবাই জানে—যেখানে ছুতোর, সেখানেই অনাথ।

ছুতোর যখন কাঠের কাজ করে, অনাথ মুখ দিয়ে তার যন্ত্র-পাতি—বাইস, বাটালি, কুড়ুল, হাতুড়ি, মুগুর, ইত্যাদি এগিয়ে দেয়। ছুতোর যখন সুতো দিয়ে কাঠের মাপ নেয়, অনাথ তখন সুতোর আর একটা দিক মুখ দিয়ে টেনে ধরে।

অনাথ এক দণ্ড চোখের আড়াল হলে ছুতোর জগৎ অন্ধকার দেখে। গাঁয়ের বদ লোকদের কানাঘুষো তার কানে এসেছে। অনাথের নাদুস নুদুস দেহের নরম মাংসের ওপর তাদের বড় লোভ। সুযোগের অপেক্ষায় তারা ওৎ পেতে আছে। তাই অনাথের জন্যে দুশ্চিন্তায় ছুতোরের রাতের ঘুম নষ্ট হবার মতো।

যত দিন যায়, নানাজনের নানান শলা-পরামর্শ ছুতোরের কানে আসে, আর ততই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সে ছটফট করে।

ছুতোর দিন রাত ভাবে। কিন্তু ভেবে কূলকিনারা পায় না।

শেষে একদিন সে মনস্থির করলো—"নাঃ! অনাথকে বনে ছেড়ে দেব। মানুষের সংসারে অনাথ বাঁচবে না।"

স্থির করলো বটে, কিন্তু মনের কথা মনেই থেকে যায়, কাজে আর হয়ে ওঠে না। চিরকালের জন্যে অনাথ চলে যাবে ভাবতেই, মন তার হু-হু করে ওঠে, ব্যথায় বুক ফেটে যায়। 'আজ যাব,' 'কাল যাব' করে তাই যাওয়া আর হয় না।

কিন্তু এভাবেই বা ক'দিন চলে। অবস্থা শেষে এমনি ঘোরালো হয়ে উঠলো যে, যে-কোন সময় অনাথের বিপদ ঘটতে পারে।

নিরুপায় অবস্থা। ছুতোর তাই মন শক্ত করে একদিন অনাথকে নিয়ে রওনা হলো বনের দিকে। পথে যেতে যেতে নিজের মনে সে বকে চলে:

অনাথকে কত উপদেশ দেয়, কত রকমে তাকে সাবধান করে। অনাথ কি বোঝে কে জানে!

বনের প্রান্তে, এসে ছুতোরের চোখের জল আর বাধা মানে না। অনাথের গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে—"বাপ, আর কেউ না জানুক, তুই তো জানিস, আমার কতখানি তুই জুড়ে ছিলি। আজ তোরই মঙ্গলের জন্যে মানুষের মধ্যে তোকে রাখতে পারলাম না। আজ থেকে তোর ভার তোকেই নিতে হবে।"

তারপর আকাশের দিকে যুক্তকর তুলে ছুতোর কেঁদে উঠলো—"হে ভগবান! হে বনের দেবতা। কোনো ভাল কাজ আমি কোন দিন যদি করে থাকি, তাহলে তার সবটুকু পুণ্য আজ অনাথকে দিলাম। দেখো দেবতা, ওর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

তারপর অনাথের চোখে মুখে মাথায় চুমু খেয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে ছুতোর তাকে বিদায় দিলে।

অনাথ পালকপিতার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। দুই চোখ যেন টলটল করছে। একটিবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি যেন বলতে চাইল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হলো বনের দিকে।

গহন অরণ্যের ভিতর দিয়ে অনাথ চলেছে। ভয়-ডর কাকে বলে সে জানে না। তবু অপরিচিত দেশ, অজানা বনভূমি। পালকপিতার উপদেশ সে শুনেছে। তাই এগোয় সতর্ক পদক্ষেপে—চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে। নিরাপদে বাস করার মতো জায়গা সে খুঁজছে, কিন্তু মনের মতো তেমন স্থান নজরে পড়ে না।

দূরে দেখা যায় বিরাট এক পর্বতশ্রেণী—আকাশের গায়ে কালো ঢেউ তুলে দিগন্তে মিশে গেছে।

অনাথ একসময় সেখানে এক পর্বতের নীচে এসে পেঁছালো। পাহাড়ে ঘেরা এক পর্বত-উপত্যকা, ফুলে ফলে ভরা। পাশেই এক প্রকাণ্ড গুহা, বাস করা ও আত্মরক্ষার মতো উপযুক্ত জায়গা বটে। খাবারের কোন অভাব নেই। ফলমূল-কন্দের ছড়াছড়ি। প্রকৃতি যেন ছবির মতো করে সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে। জায়গাটা অনাথের বড় ভালো লাগলো। কিন্তু বড় নির্জন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ জীবনের ছক আঁকছে, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতেই চকিতে সে ফিরে দাঁড়ালো।

অবাক কাণ্ড। কোথা থেকে শ'য়ে শ'য়ে শুয়োরের পাল আসছে। বনের ভেতর থেকে, পাহাড়-পর্বতের আড়াল থেকে মেয়েমদ্দা, জোয়ানবুড়ো কাচ্চাবাচ্চা দলে দলে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

অনাথ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো তাদের দিকে।

শেষে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে অভ্যর্থনা জানালো—"এস ভাই, এস। ভাবছিলাম, একলা থাকবো কি করে। তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। মিলেমিশে সবাই একসঙ্গে থাকা যাবে। তা, তোমরা থাক কোথায় ?"

দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দলের এক বুড়ো শুয়োর বললে—"ঐ ওখানে। কিন্তু তুমি কে ?"

অনাথ নিজের পরিচয় দিলে। তারপর আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতে সে বললে—"কিন্তু ভাই, এ জায়গাটা দেখছি ভারি সুন্দর, আমার বড় পছন্দ হয়েছে। সবাই মিলে এখানেই যদি থাকি তো ক্ষতি কি ?"

বুড়ো শুয়োরটা বললে, "জায়গাটা সুন্দর বটে, কিন্তু বাস করা চলে না। জায়গাটা ভারী বিপদজ্জনক।

"বিপদ ?"—অবাক হয়ে অনাথ জিজ্ঞেস করলে ঃ "কিসের বিপদ ?"

"বাঘের !"—বুড়ো শুয়োর বিমর্ষ কণ্ঠে বললে ঃ "সাংঘাতিক বাঘের অত্যাচার এখানে। বাঘ সকালবেলায় এসে যাকে পায়, তাকেই নিয়ে যায়। আমাদের কত মেয়েমদ্দা কাচ্চাবাচ্চা যে তার পেটে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কি করে বাঁচবো, জানি নে। পালিয়েও নিস্তার নেই। দুর্দান্ত জানোয়ার সেখানেও গিয়ে হাজির হয়। তাই কেঁদেই আমাদের দিন কাটে।"

বলতে বলতে বুড়ো শুয়োরের গলা ধরে এল। দলের আর সকলেরও চোখ ছলছল করে এল। ওদের দুঃখে অনাথের বুকও ব্যথায় টনটন করে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করে—"বাঘ কোন্ কোন্ দিন আসে ?"

"রোজই আসে।"

"বাঘ কয়টা ?"

প্রশ্ন শুনে শুয়োরের পাল শিউরে উঠলো—"কয়টা মানে ? একটার দাপটেই আমাদের এই অবস্থা ! 'কয়টা' হলে শুয়োর-বংশে বাতি দেবার কেউ কি আর এত দিন থাকতো, মনে করো ?"

অনাথ বোকার মতো হাঁ করে ওদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বললে—"ভাই, ঠিক বুঝতে পারছি নে। বাঘ বলছো একটা, আর তোমরা দেখছি এতজন—অথচ তার ভয়ে তোমরা এত অস্থির। কেন বলো তো ? তোমরা সকলে মিলে কি একটা বাঘের সঙ্গে পেরে ওঠ না ?"

শুয়োরের দল হতভম্ব। অনাথের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তারা শেষে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো—"এ্যাঁ ! পাগল নাকি ? কি বকছো আবোল-তাবোল ?"

দলের ভেতর থেকে একজন টিপ্পনী কাটলে,—"আরে ধ্যেৎ ! ওর

কথায় কান দাও কেন ? সারা জীবন যে মানুষের মধ্যে কাটালো, সে কি করে জানবে, বাঘ কাকে বলে। তাই তো অমন আবোল-তাবোল বকছে। শুয়োর কিনা বাধা দেবে বাঘকে ! ওটা একেবারেই যা-তা !"

টিপ্পনী শুনে অনাথ যেন কেমন হয়ে যায়। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে একবার, তারপর সামলে নিয়ে ধীর সংযত কণ্ঠে সে বললে—"ভাই, তোমরা আমাকে যা খুশি ভাবতে পার, আমার কিছু বলার নেই। এর পর হয়তো এখান থেকে চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু তোমরা আমার স্বজাতি, জ্ঞাতিগোষ্ঠী—বিষম বিপদের মধ্যে আছ। এতদিন তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, জানতামও না কিছু। কিন্তু আজ সব জেনে শুনে তোমাদের ফেলে চলে যেতে মন চাইছে না।

"ভাই, আমার কথাটা তোমরা আবার একটু ভেবে-দেখ। আমরা এত জন, শক্তিমান জোয়ানের সংখ্যাও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট, তবু কেন একটামাত্র বাঘের সঙ্গে আমরা পারবো না ? একজনের পক্ষে যা হয়তো পারা অসম্ভব, একশো জন একসঙ্গে দাঁড়ালে আর মাথা খাটিয়ে চললে তা কি পারা যায় না ? আমার স্থির বিশ্বাস, নিজেদের মধ্যে বুদ্ধি আর একতা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই বাঘকে রুখতে পারবো, বাঘ হেরে যাবে।"

অনাথের কথার আন্তরিকতা ও দৃঢ়তায় শুয়োরদের মধ্যে অনেকেরই এবার কেমন যেন ভাবান্তর দেখা দেয় ঃ কথাটা নতুন হলেও ভাববার মতো। সবাই চুপ হয়ে গেছে। ফিসফাস আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে।

শেষে হঠাৎ একজন বলে উঠলো—"কিন্তু—যদি বাঘ না হারে ?"

দৃপ্ত কণ্ঠে অনাথ বললে—"তাতেই বা এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে আমাদের ? এমনিতেই তো মরছি তার হাতে এবং মরবোও সবাই, হাজার কান্নাকাটি করলেও সে ছেড়ে দেবে না,—তখন সে যদি না-ই হারে তো, নতুন করে আমাদের কি আর এমন লোকসান হবে ? কিন্তু আমার ধারণা, সে নিশ্চিত ভয় পাবে, হারবেও। কারণ এমন ঘটনা সে জীবনে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি।"

দলের মাঝে এবার আলোড়ন শুরু হয়। বিশেষত জোয়ান শুয়োরদের মনে অনাথের কথাটা বেশ দাগ কেটে গেছে।

তারা বললে—"সত্যিই তো, কথাটা তো মিথ্যে নয় ! নতুন ভায়া ঠিক কথাই বলছে। এমনিতেও বাঘের হাতে আমাদের মরতে হবে, তার চেয়ে সবাই মিলে লড়াই করে মরা অনেক ভাল। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?"

কিন্তু বৃদ্ধ প্রবীণদের মধ্যে দোমনা ভাব। জীবনে তারা কত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। তাদের

আগে সন্ন্যাসী পেছনে শুয়োর। সন্ন্যাসী ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে, আর পেছনে হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে আসছে শুয়োরের দল। [পৃষ্ঠা ৯২]

একজন মাথা নেড়ে নেড়ে বললে—"ধ্যেৎ ধ্যেৎ। গোঁয়ার গোবিন্দের কথায় বোকারাই নাচে। বাঘের কাছে কোন গোঁয়াতুমিই খাটে না। কে কবে শুনেছে, শুয়োরের পাল লড়াই করেছে বাঘের সঙ্গে? ছোঃ!"

এর ফলে, দলে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এক দিকে জোয়ানের দল, অন্য দিকে বুড়োরা। দলের মধ্যে চললো হইচই চেঁচামেচি। অনেকে আবার দোদুল্যমান, মনস্থির করতে পারছে না। অনাথ প্রাণপণে বোঝায় সবাইকে।

সে বললে—"বন্ধুগণ, একটু শোন—নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করলে আমাদেরই ক্ষতি, বাঘের তাতে আরো সুবিধে হবে। প্রবীণ বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতা আমাদের খুব দরকার, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে তাঁদের আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি—আজ যে কাজ আমি করতে বলছি, এত কাল তা কখনো ঘটেনি বলেই কি সেটা খারাপ হবে? না-ঘটার ফলে আমাদের ভাল কিছু হয়েছে কি? এতদিন তো বাঘকে বাধা দেওয়া হয়নি, আমরা নীরবে মরেছি, তবুও কি সে আমাদের কিছুমাত্র দয়া করেছে? এভাবে চুপ করে থাকলে আমরা একজনও কি বাঁচবো? তাই বৃদ্ধদের কাছে আমার আবেদন—হয় তাঁরা আমাদের সঠিক কোন বাঁচার পন্থা বলে দিন, নয়তো আসুন সবাই একসঙ্গে মিলে একমন হয়ে নিষ্ঠুর শয়তানটাকে বাধা দেই। আমি বলছি, তাতে ফল ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।"

শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক, আলোচনার পর অনাথের যুক্তি ও আবেদনে বুড়োদের মন নরম হলো। তার কথায় বুড়োরা সায় দিলেন। সবাই একমত হয়ে অনাথকে দলপতি নির্বাচন করলো।

সভা যখন ভাঙলো, পশ্চিম আকাশ আঁধার করে বনের বুকে তখন সাঁঝের ছায়া নামছে। স্থির হলো, সন্ধ্যার পরে আবার সবাই সেখানে এসে মিলিত হবে।

অস্পষ্ট জোছনায় বনের বুকে আবছা অন্ধকার। গুহার সামনে শুয়োরদের সভা বসেছে। সবাই উপস্থিত। অনাথ তাদের শেখাচ্ছে—যুদ্ধ করতে হলে কিভাবে ব্যূহ রচনা করতে হয়, ব্যূহ না করলে কেন জয়লাভ অসম্ভব, কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় আর আক্রমণই বা করতে হয় কিভাবে। বিপুল উৎসাহে দলের মধ্যে চলেছে মহড়া আর আলোচনা, আলোচনা আর মহড়া।

শেষ কালে অনাথ বললে—"আমরা তাহলে বুঝতে পারছি, আমরা যে ধরনের যুদ্ধ করবো, তাতে তিন রকমের ব্যূহ সুবিধাজনক: পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ। আমরা পদ্মব্যূহ তৈরি করে শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া

করবো। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। এবার ভাল একটা জায়গা আমাদের বেছে নিতে হবে।"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পছন্দমতো একটা জায়গা পাওয়া গেল। সেখান থেকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ, দুই-ই ঠিকমতো চলতে পারে। অনাথ সেখানে তৈরি করলো পদ্মব্যূহ—ঠিক যেন পাঁপড়ি-মেলা এক পদ্ম।

পদ্মের ঠিক মাঝখানে কেন্দ্রস্থলে রাখা হলো দুগ্ধপোষ্য কচি বাচ্চা আর তাদের মায়েদের। তাদের ঘিরে রইল প্রথমে বন্ধ্যা শুয়োরীর দল, তার পরে রইল যারা কিশোর, কিশোরদের ঘিরে দাঁড়ালো তরুণ যুবকেরা, তরুণদের পরে রইল মাঝারি আকারের সব দাঁতালো শুয়োর। আর সবার শেষে বাইরের সারিতে দাঁড়ালো সবচেয়ে বলবান সব যোদ্ধা সৈনিক-বাহিনী। দরকার মতো দলপতি তাদের কোথাও দশ-দশটা, কোথাও বিশ-বিশটা করে দাঁড় করিয়ে দিল। আর নিজে সে রইল সবার আগে। তার সামনে ও পেছনে অদ্ভুত দুটো গর্ত খোঁড়া হলো। সামনের গর্তটা গোল ও সোজা। কিন্তু পেছনেরটা বাঁকা ও গভীর—দেখতে কতকটা কুলোর মতো।

এই ভাবে ব্যূহ তৈরি করে ও বাহিনী সাজিয়ে অনাথ ষাট-সত্তরটা জোয়ান শুয়োরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো, ব্যূহের কোন অংশে কোন অসুবিধা বা দুর্বলতা আছে কিনা। প্রত্যেককে সে আশ্বাস দেয়, সাহস দেয় আর বলে—"বাঘকে দেখে ককখনো ঘাবড়ে যেও না। আমরা এত জন আজ একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি, বাঘের সাধ্য কি আমাদের ক্ষতি করে! মনে রেখ, আমরা একটা প্রাণীও আজ এখান থেকে এক পা পিছু হটবো না। আর তাহলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

শুয়োরদের মধ্যে যখন এই রকম কর্মচাঞ্চল্য চলেছে, তখন বাঘ কিন্তু পাহাড়ের ওপারে নিজের গুহায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিভোর। তার নাকের ডাকে গুহা গম্ গম্ করছে।

ভোর হলে সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। ক্ষিদেয় যেরকম পেট জ্বলছে, তাতে এক-আধটা শুয়োরে আজ আর চলবে না। ক্ষিদের তাড়নায় বাঘের মেজাজ গরম হয়ে উঠলো।

দ্রুতপদে সে রওনা হলো শুয়োরদের আস্তানার দিকে।

দূর থেকে বাঘকে আসতে দেখে শুয়োরের দলে সাড়া পড়ে যায়। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো, বাচ্চারা তো ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকালো। আর ভিতুর দল চেঁচাতে লাগলো—"সর্দার, সর্দার, বাঘ আসছে—বাঘ!"

অনাথ ব্যূহের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আবার সবাইকে অভয় দিয়ে বললে,—"শোনো, কয়েকটা সংকেত তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। সময় সময় আমি এই

সব সংকেত করবো, আর তোমরাও তকখুনি সেই সংকেত মতো কাজ করবে ঃ ভুল কোরো না যেন।"

সংকেত কয়টি অনাথ সবাইকে বুঝিয়ে দেয়।

বাঘ ততক্ষণে সামনের পর্বতের নীচে এসে গেছে। অবাক হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঃ ব্যাপার কি! শুয়োরের পাল দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তাকে দেখে পালানো দূরে থাক, একটু নড়ছে না পর্যন্ত।

ভাল করে নজর করতে সে আরো অবাক হয় ঃ ব্যূহ? শুয়োরের পাল ব্যূহ তৈরি করেছে?

বাঘ একটু হকচকিয়ে গেল ঃ ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে!

অন্য দিন হলে এতক্ষণে সে লাফিয়ে পড়তো শুয়োরদের মধ্যে, কিন্তু আজ একটু সাবধানে চলা দরকার।

ওদের দিকে সে তাকালো কটমট করে।

অনাথ সংকেত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের দলও ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকালো বাঘের দিকে,—যদিও বুক তাদের ভয়ে দুরু দুরু করছে ঃ এই বুঝি বাঘ রেগে দিলে লাফ।

কিন্তু বাঘ আরো ঘাবড়ে যায় ঃ তাই তো! হলো কি? চিরকাল যারা টু শব্দ না করে পড়ে পড়ে মরলো, আজ তাদের হলো কি?

তবু, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে সে মস্ত এক হাই তুললে।

অনাথের সংকেত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরেরাও সশব্দে হাই ছাড়লে নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গী করে।

কী! শুয়োরে ভেংচি কাটছে!—বাঘ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।

কিন্তু এগোতে তার সাহস হয় না। তাই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে গোঁ গোঁ করে মারলো এক লাফ।

তৎক্ষণাৎ শুয়োরের পালেও সাড়া পড়ে গেল। ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দা, সবাই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে লাফিয়ে উঠলো। বাঘের হাবভাব দেখে ওদের সাহস বেড়ে গেছে।

রাগে দিশেহারা হয়ে বাঘ এবার গর্জন করে উঠলো। ভয়ঙ্কর গর্জনে বনভূমি যেন কাঁপতে থাকে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে তার প্রতিধ্বনি।

সে গর্জনে শুয়োর তো দূরের কথা, বড় বড় জানোয়ার পর্যন্ত আতঙ্কে কুঁকড়ে যায়, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে পথ পায় না।

কিন্তু আজ পালানো দূরে থাক, শুয়োরের দলও সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়লো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। তাদের হাজার কণ্ঠের মিলিত হুঙ্কারে বাঘের গর্জনও ডুবে গেল।

বাঘের বুক কেঁপে ওঠে। কোথায় উবে গেল তার শক্তি সাহস পরাক্রম। ভয়ে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে ঃ যা অবস্থা তাতে ওদের পক্ষে দল বেঁধে তাকে আক্রমণ করাও বিচিত্র নয়!

সুতরাং—

এক পা দু পা করে পিছু হটে পেছনে ফিরেই বাঘ অদৃশ্য হলো পাহাড়ের আড়ালে।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের দল আনন্দে যেন ফেটে পড়লো। তারা ভাবতেই পারেনি, এত সহজে বাঘ পালাবে। তাদের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে অরণ্য-পর্বত মুখরিত হয়ে উঠলো।

দলের আনন্দে অনাথেরও চোখমুখ উদ্ভাসিত। সবাই আজ সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর,—এ কি কম কথা!

বাঘ যেদিকে গেছে, সেদিকে চোখ রেখে হাসিমুখে অনাথ বললে—"ভাই, আনন্দে আত্মহারা হয়ো না। মনে রেখ, শত্রু এখনো অক্ষত দেহে বেঁচে আছে। আমাদের অসতর্ক দেখলেই সে আক্রমণ করবে। খুব সাবধান—ব্যূহ যেন না ভাঙে।"

গুটিসুটি মেরে বাঘ তখন বাসার দিকে ফিরে চলেছে—চলেছে সন্ন্যাসীর কাছে পরামর্শ নিতে। যে গুহায় সে থাকে, তার কাছেই এক সন্ন্যাসী বাস করে। কিন্তু আসলে সে সন্ন্যাসীই নয়—সন্ন্যাসীর মুখোশপরা এক ভণ্ড শঠ। নিজের ভণ্ডামি ও শঠতা লুকোনোর জন্যে সে মাথাভরা লম্বা জটাজুট আর গালভরা দাড়িগোঁফ রেখেছে। বাঘ দৈনিক যে শুয়োর মেরে আনে, তার একটা মোটা অংশ সে পায়। বাঘের সে পরামর্শদাতা। সেই বাঘকে বুঝিয়েছে, কচি বাচ্চা আর বড় বড় মোটা শুয়োরের মাংসই সবচেয়ে সুস্বাদু। বাঘ তাই রোজ বেছে বেছে শিশু আর জোয়ান শুয়োরদের হত্যা করে।

সেদিনও সন্ন্যাসী সকালবেলায় বাঘের পথ চেয়ে বসে আছে, এমন সময় শুকনো মুখে বাঘ ফিরে এল। সন্ন্যাসীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। খানিকক্ষণ হাঁ করে বাঘের দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞেস করলে—"কী হে, ব্যাপার কি? খালি মুখে ফিরে এলে যে?"

বাঘ নির্বাক। মুখ নীচু করে বসে রইল। সন্ন্যাসী আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আরে কথা বলছো না কেন? হয়েছে কি? তোমার শুকনো মুখ আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, খুব ভয় পেয়ে গেছ। খুলে বলো, কি হয়েছে। বনে তোমার চেয়েও শক্তিমান কেউ এসেছে নাকি?"

মুখ কাঁচুমাচু করে বাঘ তখন খুলে বললে সব কথা। বললে—"ঠাকুর, যে শুয়োরের পাল আমায় দেখলেই ভয়ে আধমরা হতো, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে

দিশে পেত না, আজ কিন্তু তাদের মধ্যে কি এক ব্যাপার ঘটে গেছে। আজ আমাকে দেখে পালানো দূরে থাক্, ব্যূহ রচনা করে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সে চেহারা দেখে আমার আর এগোনোর সাহস হলো না।"

সন্ন্যাসী যেন আকাশ থেকে পড়লো। জানোয়ারটা বলে কি? শূয়োরের পাল ব্যূহ তৈরি করেছে। আর তাই দেখে হতভাগাটা বাঘ হয়েও কিনা পালিয়ে এল! অবস্থাটা কল্পনা করে হঠাৎ সে হেসে ফেললে। বললে—"তোমায় কি যে বলবো, ভেবে পাচ্ছি নে! সত্যিই আমায় অবাক করেছ! শূয়োরের ভয়ে বাঘ পালিয়ে এল, এমন উদ্ভট কাণ্ড কোনো কালে কেউ শুনেছে? ছিঃ ছিঃ! ভাবতেও ঘেন্না করে।"

বাঘেরও এবার বড় লজ্জা হয়। সত্যিই তো! হঠাৎ এভাবে পালিয়ে আসাটা তার পক্ষে খুবই খারাপ হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে সন্ন্যাসী আবার বললে—"আচ্ছা, পালিয়ে আসার আগে একবারও কি তোমার মনে হয়নি যে—তুমি বাঘ, বনের রাজা, তোমার ভয়ে বড় বড় জন্তু-জানোয়ার পালায়, শূয়োর তো কোন্ ছার? একবারও কি ভেবেছো, আজকের এই লজ্জাকর ঘটনা শুনলে বনের আর সব পশুরা কি ভাববে? আর কি তারা তোমায় গ্রাহ্য করবে?"

বাঘ আর সহ্য করতে পারে না। সামনের দুই থাবা জোড় করে সে বললে—"ঠাকুর, ক্ষমা দিন, আর বলবেন না। সত্যিই, হঠাৎ একটা ঘেন্নার ব্যাপার ঘটে গেছে। শূয়োরদের লম্ফঝম্প দেখে আমার মাথাটা তখন কেমন যেন বিগড়ে গিয়েছিল। এখন বলুন, কি করতে হবে। আমায় ভয় দেখানোর মজাটা সুদে আসলে ওদের টের পাইয়ে দেব।"

বাঘের কথা শুনে সন্ন্যাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। একগাল হেসে বললে—"বেশ বেশ, এই তো বাঘের মতো কথা। গতস্য শোচনা নাস্তি—যা হবার হয়ে গেছে। এখন যা বলি, মন দিয়ে শোন। এখুনি ফিরে যাও। গিয়েই প্রথমে দেখবে, ওদের সর্দার কে। নিশ্চয়ই নতুন কোন শূয়োর এসেছে। তারই পরামর্শমতো ওদের এত লম্ফঝম্প। গর্জন করে প্রথমে তারই ঘাড়ে তুমি লাফিয়ে পড়বে। তাহলে সে তো মরবেই, আর সেই সঙ্গে শূয়োরের পালও ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারে, ছুটে পালানোর পথ পাবে না। যাও। ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই।"

নতুন উৎসাহ নিয়ে বাঘ তখুনি রওনা হয়।

দূর থেকে বাঘকে আসতে দেখে শূয়োরের দল চেঁচিয়ে ওঠে—"সর্দার, দেখ দেখ, বাঘটা আবার ফিরে আসছে।"

অনাথ জানতো, বাঘ ফিরে আসবেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরবে, ভাবেনি। সে বুঝলো, বাঘের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার আর দেরি নেই। সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে, নিজেও সে মনে মনে তৈরী হলো। পালকপিতার কথা তার মনে পড়ছে বারবার।

ইতিমধ্যে বাঘ এসে দাঁড়িয়েছে সামনের পর্বতের নীচে। একটু লক্ষ্য করতেই সে দেখলো, বিরাট এক দাঁতালো শুয়োর উঁচু একটা ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে অন্যদের কি যেন সব বলছে।

ওটাই তাহলে পালের গোদা—যত নষ্টের মূল ?

এমনিতেই বাঘ অপমানের জ্বালায় জ্বলছে, তার ওপর সর্দারকে দেখে বিষম রাগে সে গর্জন করে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে দৃক্পাত না করে প্রচণ্ড লাফ দিল অনাথকে লক্ষ্য করে।

অনাথ ইচ্ছে করেই বাঁকা গর্তটার কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল। বাঘকে লাফ দিতে দেখে সে চোখের পলকে ঘাড় নীচু করে সামনের গোল গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেল। আর বাঘ নিজের বেগ সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বাঁকা গর্তের মধ্যে। অনেক ভেবেচিন্তে অনাথ গর্তটা তৈরি করিয়েছিল। বাঘ তার মধ্যে এমনভাবে আটকে গেল যে, নড়াচড়াও বন্ধ।

বিদ্যুদ্বেগে অনাথ গোল গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ংকর হুংকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের ওপর। বাঘের উরুতে দাঁত বসিয়ে তার তলপেট সে ফেঁড়ে ফেললে, তারপর দাঁত দিয়ে মাথার খুলি ভেঙে ফেলে তাকে গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললে—"এই নাও তোমরা যমের বাহনকে পাঠিয়ে দাও যমের কাছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় আক্রোশে শুয়োরের পাল ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর।

তারপর সে কী বাঁধভাঙা আনন্দ-হুল্লোড়! পাশে বসে অনাথ বিশ্রাম করছে, তারও আনন্দের সীমা নেই। এমন সময় কয়েকটি বুড়ো শুয়োর এগিয়ে এল, সর্দারের ওপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাদেরও অন্তর উদ্বেলিত, বললে—"সর্দার, সবাই আনন্দ করছে বটে, কিন্তু প্রধান বিপদ এখনো কাটে নি। বাঘ মরলেও আসল শত্রু এখনো বেঁচে আছে। ইচ্ছে করলে সে ওরকম দশটা বাঘ এনে হাজির করতে পারে। আনন্দের আতিশয্যে সে কথা ওরা ভুলে গেছে।"

অনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"সে কি! আসল শত্রু তাহলে বাঘ নয়? কে সে?"

বুড়োরা বললে—"সে এক ভণ্ড তপস্বী। মূর্তিমান শয়তান—মানুষের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তারই পরামর্শমতো বাঘ

আমাদের বড় বড় জোয়ান আর কচি বাচ্চাদের বেছে বেছে খুন করতো। সে-ই-হলো বাঘের গুরু ও মন্ত্রণাদাতা। বাঘের গুহার কাছেই সে থাকে।"

"বটে! একথা আমায় আগেই বলা উচিত ছিল।"—বলতে বলতে অনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়লো: "বন্ধুগণ, আনন্দ করার সময় এখনো আসেনি। তোমরা কি ভুলে গেলে, প্রধান শত্রু এখনো বেঁচে আছে? সে বেঁচে থাকতে আমাদের বিশ্রাম নেই। সেই ভণ্ড তপস্বীর সঙ্গে এবার আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে। এখ্খুনি যেতে হবে, সে যেন পালিয়ে না যায়।"

নিজের কুঁড়েয় বসে তপস্বী ভাবছে। মনে নানা দুশ্চিন্তা: বাঘের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কোনো ঝঞ্ঝাট বাধলো না তো?

শেষ পর্যন্ত তপস্বী উঠে দাঁড়ালো। চুপচাপ বসে থাকা কাজের কথা নয়। এত বেলা হলো, ব্যাপারটা একবার দেখা দরকার। এক পা দু পা করে সে এগোলো শুয়োরদের আস্তানার দিকে।

কিন্তু কিছুদূর যেতেই সে চমকে উঠলো—এ্যাঁ! কী ব্যাপার! শ'য়ে শ'য়ে শুয়োর আসছে! ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে! সর্বনাশ! ভয়ংকর সব দাঁতালো শুয়োর!

আতংকে তপস্বীর প্রাণ উড়ে গেল। পেছন ফিরেই সে দৌড়ল কুঁড়ের দিকে। তারপর চোখের নিমেষে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার দিল ছুট।···

আগে সন্ন্যাসী, পেছনে শুয়োর। সন্ন্যাসী ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে, আর পেছনে হুংকার দিয়ে তেড়ে আসছে শুয়োরের দল। ব্যবধান ক্রমেই কমে আসে।

সন্ন্যাসী দৌড়য় আর পেছনে তাকায়। আর নিস্তার নেই! কাছেই ছিল এক যজ্ঞডুমুরের গাছ। তল্পিতল্পা ফেলে মরিবাঁচি করে সন্ন্যাসী তরতর করে তার আগডালে উঠে গেল।

শুয়োরের দল এসে দাঁড়ালো গাছতলায়। এখন কি করা?

অনাথ বললে—"কোন চিন্তা নেই। গাছে উঠেও শয়তান নিস্তার পাবে না। যা বলি, সেইমতো কাজ করো।"

দলকে সে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে বললে—"শোন, মেয়েরা জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালবে। ছোকরার দল গাছের গোড়ার সেই ভিজে মাটি খুঁড়বে। আর দাঁতালো জোয়ানেরা গাছের শিকড় কাটবে। বাদ বাকি সবাই গাছের চারদিক ঘিরে থাকবে, শয়তানটা যেন গাছ থেকে নেমে পালাতে না পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হলো।

শুয়োরীর দল গাছের গোড়ায় জল দিতেই মাটি নরম হয়ে গেল। অমনি মহা উৎসাহে কাজে লাগলো ছোকরার দল। গোড়া খুঁড়ে ফেলতেই শিকড় বেরিয়ে পড়লো।

গাছের ওপরে সন্ন্যাসীর চোখ তখন আতঙ্কে কপালে উঠে গেছে।

এবার এগিয়ে এল দাঁতালো জোয়ানেরা। তাদের দাঁতের এক-একটা ঘায়ে গাছ থরথর করে কেঁপে ওঠে, আর এক-একটা শিকড় কাটা যায়। গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে সন্ন্যাসী তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে আর আকুল হয়ে ডাকছে ভগবানকে।

একে একে সব শিকড় কাটা হয়ে যায়। কিন্তু মূল শিকড়টা বেশ মোটা, কেউ আর কাটতে পারে না।

অনাথ এতক্ষণ সকলের কাজের তদারক করছিল। এবার সে এগিয়ে এল। তারপর লোকে যেমন কুড়ুলের কোপ মারে গাছের গোড়ায়, তেমনিভাবে ছুটে গিয়ে সে দাঁতের ঘা মারলো শিকড়ের উপর। ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে শিকড় দু খান।

মড়মড় শব্দে গাছ ভেঙে পড়লো। আর্তনাদ করে উঠলো সন্ন্যাসী। চোখের পলকে শুয়োরের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

তার পর!

পরম স্বস্তি। অনাথের নেতৃত্বে এবার থেকে তাদের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন—শুধু নাচ আর গান আর আনন্দ-ফূর্তি।

নানা জাতের ভিক্ষুকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে—কাশীরাজ্যের সে এক বিচিত্র উপনিবেশ। বাসিন্দারা সবাই ভিক্ষুক।

অদ্ভুত এ উপনিবেশ—যেন অভিশপ্ত। যেমন নোংরা, তেমনি দুঃস্থ। রোগে শোকে আর অভাবের তাড়নায় অবিরাম ধুঁকছে। তার ওপর, এত দিন সেখানে যেটুকু বা শান্তি ছিল, আজ তা-ও নেই। হতভাগা ছেলেটির জ্বালায় সারাক্ষণ হইচই মারামারি লেগেই আছে। কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। উপনিবেশের অন্য সব ছেলেমেয়ে তাকে ভয় করে যমের মতো।

বাবা-মা আদর করে তার নাম রেখেছিল মিত্রবিন্দক। কিন্তু কেন কে জানে—মিত্রবিন্দকের জন্মের পর থেকে তাদের সংসারে দুঃখকষ্ট-অভাবের যেন শেষ নেই। আগে ভিক্ষা যত কমই জুটুক, দু বেলা দু মুঠো অন্নের অভাব কখনো হতো না। কিন্তু ছেলের জন্মের পর থেকে প্রায়ই তাদের আধপেটা দিন কাটে, মাঝে মাঝে নিরম্বু উপবাসেও থাকতে হয়। আর ভিক্ষার সময় মিত্রবিন্দক সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই, শত চেষ্টাতেও একমুঠো ভিক্ষা মেলে না।

কিন্তু তাতেও দুঃখ ছিল না, ছেলে যদি ওরকম না হতো। মিত্রবিন্দক যেন জন্মবিদ্রোহী—যেমন ডানপিটে, তেমনি দুর্দান্ত। কেউ তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। সবাই দূর দূর করে। বলে—"ছেলেটা অপয়া, জন্ম-অভাগা। অমঙ্গল ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে!"

বাবা-মা ছেলেকে কত বুঝায়, উপদেশ দেয়, সময় সময় শাসনও করে। শেষে নিজের মনকে তারা প্রবোধ দেয়—"আহা, হাজার হোক ছেলেমানুষ! বড় হলে সব শুধরে যাবে।"

কিন্তু শোধরানো দূরের কথা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রবিন্দক আরো দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। যেমন সে নিষ্ঠুর, তেমনি স্বার্থপর। নিজে সে কোনো দিন পেট ভরে খেতে পায়নি, তবু অন্যের দুঃখকষ্ট অভাবে তার এতটুকু দয়া হয় না, উল্টে পরের মুখের গ্রাস মেরেধরে কেড়ে খায়।

আর সারা উপনিবেশ জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বলে। এমন দিন নেই, যে দিন ছেলের জন্যে বাবা-মাকে অপমান সহ্য করতে না হয়।

বাবা এক একদিন ছেলেকে মেরে আধমরা করে। মিত্রবিন্দকের চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়ে না, গলা দিয়ে একটু শব্দ বেরোয় না। শেষ পর্যন্ত মা আর সহ্য করতে না পেরে স্বামীর হাত থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। চোখের জল মুছতে মুছতে ছেলেকে কোলের কাছে বসিয়ে তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তার কপালের উপর থেকে উদ্ধত চুলের গোছা সরিয়ে দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—"তুই কি শান্ত হবি নে, বাবা? এত বড় হলি, আর কবে তোর সুবুদ্ধি হবে? দেখছিস তো, তোর জন্যে কত অপমান আমাদের? যে যা মুখে আসে, তাই বলে যায়। বল্ তো বাবা, এভাবে কি করে চলে? আমার গা ছুঁয়ে আজ তুই প্রতিজ্ঞা কর্, আর কখনো এমন কাজ করবি নে। বল্, বাবা..."

মায়ের কোলে মাথা রেখে মিত্রবিন্দক চুপ করে শুয়ে থাকে। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে হিংস্র শ্বাপদের মতো। মা নিজের মনে বকে যায়। ছেলের কানে তার কতটুকু ঢোকে, ভগবানই জানেন। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন তাকে দেখে মনেই হয় না, আগের দিন তাকে নিয়ে গুরুতর কোন কিছু ঘটেছে।

কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলে!

সেদিন এক প্রতিবেশীর ঘরে পিঠে হয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটি কত দিন থেকে আবদার ধরেছে, পিঠে খাবে। বাবা-মা তাই কম খেয়ে অতি কষ্টে ভিক্ষার চাল থেকে কিছু কিছু জমিয়ে সেদিন পিঠে করেছিল।

ছেলেমেয়ে দুটি এতক্ষণ নেচেকুঁদে আনন্দে বাড়ি মাথায় করেছে। পিঠে হতেই দুজনে পিঠে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলো। খুশিতে ভাইবোন যেন উপচে পড়ছে। এমন সময় কোথায় ছিল মিত্রবিন্দক, বাঘের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের উপর। ভাইবোন চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। বাধা দিতে গিয়ে পিঠে তো গেলই, উলটে দু জনে জখমও হলো একটু; এবং অবস্থা চরমে উঠলো, যখন ছেলেমেয়েদুটিকে নিয়ে ক্ষিপ্ত উপনিবেশ এসে চড়াও হলো মিত্রবিন্দকের বাবা-মার ওপর।

হতভাগা ছেলেটার জন্যে এত অপমান আর কাঁহাতক সহ্য হয়! বেদম মারতে মারতে বাবা ছেলেকে দূর করে দিল বাড়ি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উপনিবেশও তাকে তাড়া করলো কুকুরের মতো। মুহূর্তের জন্যেও মিত্রবিন্দক কোথাও তিষ্ঠোতে পারলে না।

বিতাড়িত মিত্রবিন্দক পথে এসে দাঁড়ায়। সারা অঙ্গে তার প্রহারের

জ্বালা। শুধু কি বাবাই মেরেছে! ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাকে তাড়া করেছিল উপনিবেশের ছেলেবুড়ো—সবাই। ঢিলের ঘায়ে মাথা কেটে রক্ত ঝরছে। রক্ত ঝরছে দেহের কয়েক জায়গা থেকে।

সামনে প্রসারিত আঁকাবাঁকা পথ। অজানা শঙ্কায় কিশোরের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কোথায় গেছে ও পথ? ত্রস্তচকিত চোখে সে তাকালো পিছনে—দূরে যেখানে দেখা যায় উপনিবেশ।

শ্রাবণের অপরাহ্ণ। মেঘে আকাশ থমথম করছে। বর্ষণক্লান্ত ধূসর দিগন্ত। উপনিবেশের মাথায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ভ্রূকুটি। আবছা উপনিবেশ যেন দাঁতে দাঁত চেপে ক্রূর চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

এমন সময় আচমকা চারিদিক কাঁপিয়ে আকাশ গর্জন করে উঠলো। চমকে উঠলো মিত্রবিন্দক। আতঙ্কিত বালকের মনে হলো, উপনিবেশই বুঝি গর্জন করে ছুটে আসছে তার দিকে। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে সে ছুটলো পথ বেয়ে।

অজানা পৃথিবীর বুকে শুরু হলো নিঃসঙ্গ কিশোরের পথ চলা।

তারপর কত দিন কেটে যায়।

কত দেশ পিছনে ফেলে মিত্রবিন্দক চলেছে। অজানা দেশ। অজানা পথঘাট। মানুষও অজানা। মরণ যেন পথের বাঁকে বাঁকে ওৎ পেতে থাকে। সময় সময় অল্পের জন্যে সে মরতে মরতে বেঁচে যায়। পথে কখনো সাথী জোটে। কখনো নিঃসঙ্গ একলা।

সময় সময় পথ যায় ভয়ঙ্কর মরুর ভিতর দিয়ে। বালিয়াড়ির সীমাহীন স্তব্ধতায় বালক পথ হারায়। এক ফোঁটা জলের জন্যে আর্তনাদ করে।

সময় সময় বনের মাঝে সন্ধ্যা নামে। নিষ্কম্প বনের বুকে নামে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। উপবাসী বালক আতঙ্কে গাছের মাথায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। গভীর রাতে বনের বুকে কারা যেন ছায়ার মতো আনাগোনা করে। তাদের হাঁকডাক হুঙ্কারে সারা বন কেঁপে কেঁপে ওঠে। মৃত্যুর সামনে মিত্রবিন্দক আচ্ছন্নের মত গাছের ডাল জড়িয়ে থাকে। স্বপ্নের মতো বাবা-মার কথা মনে পড়ে—সেই পুরনো দিনের স্মৃতি। মার কথা মনে পড়ে বারবার।

গ্রামে গ্রামে সে ভিক্ষা করে। কখনো বা হাতে-পায়ে ধরে গৃহস্থ বাড়িতে দাসের কাজ নেয়। কখনো আবার দিনমজুরিও করে। কিন্তু স্থায়ী আশ্রয় মেলে না কোথাও। সময় সময় কোন কাজ জোটে না। ভিক্ষাও মেলে না। অনাহার চলে দিনের পর দিন। গৃহস্থবাড়ির আঙিনার পাশে বা গাছতলায় সে পড়ে থাকে অবসন্নের মতো।

সময় সময় নটের দলের সঙ্গে তার দেখা হয়। আমোদে-উৎসবে নটেরা

নানারকম খেলা দেখায়—নাচগান, ভোজবাজি দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। তাদের দলে মিশে মিত্রবিন্দকও ঘোরে দেশে দেশে।

একদিন আবার সে আশ্রয়ও টুটে যায়। আবার শুরু হয় তার নিঃসঙ্গ পথ-চলা।

এমনি করে দিন মাস বছর কেটে যায়। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কোথাও দাঁড়াবার মতো এতটুকু আশ্রয় সে খুঁজে পায় না। মানুষের সংসারের আশে পাশে স্নেহকাঙাল মন তার মাথা কুটে মরে।

সেদিন এক জনবিরল দেশের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। কোন্ সকালে পিছনে ছেড়ে এসেছে শেষ লোকালয়। তারপর মানুষের বসতি আর চোখে পড়লো না কোথাও।

সূর্য অস্তে চলেছে—দিন শেষ হতে আর দেরি নেই। মিত্রবিন্দক ছুটতে শুরু করলো। বিজন দেশে রাতের আতঙ্ক তাকে যেন পেয়ে বসে।

হঠাৎ পথের এক মোড় ঘুরতেই সে থমকে দাঁড়ালো। পথের পাশে অনেক তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর ভিতরে বাইরে বহু লোকজন, আর তাঁবুগুলিকে ঘিরে দুর্গের মতো সাজানো রয়েছে অসংখ্য গরুর গাড়ি।

কারা ওরা? বণিক?

মিত্রবিন্দক পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, বণিকই বটে। দূর বারাণসী নগরে তারা বাণিজ্য করতে চলেছে। সঙ্গে মূল্যবান অজস্র পণ্যসম্ভার। তাই দস্যু-তস্করের ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে তারা পথ চলে।

মিত্রবিন্দক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

তাঁবুগুলির মাঝখানে বড় এক তাঁবুর সামনে বসে দলপতি সার্থবাহ কথা কইছেন দলের কয়েকজন বণিকের সঙ্গে। মিত্রবিন্দক তাঁর সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

নির্জন দেশে দীনহীন কিশোর বালককে দেখে সবাই অবাক। করুণ কণ্ঠে মিত্রবিন্দক বললে—"একটু আশ্রয় দিন আমায়। আমার কেউ নেই, কোথাও আশ্রয়ও নেই। এই বিজন দেশে রাত হয়ে আসছে। আমি কোথায় যাব? আপনাদের সব কাজ আমি করে দেব, শুধু দু বেলা দু মুঠো খেতে দেবেন। আমাকে দয়া করুন।"

বণিকেরা না করতে পারলে না। বিশেষ করে সার্থবাহের দয়ায় মিত্রবিন্দক আশ্রয় পেল।

তারপর নানা দেশ ঘুরে বণিকের দল একদিন এসে পৌঁছালো বারাণসী নগরে। বণিকদের আশ্রয় মিত্রবিন্দকের আর ভাল লাগছে না। নগরে পৌঁছে গোপনে সে একদিন ওদের সঙ্গ ত্যাগ করলো।

কিন্তু স্বভাবদোষে আশ্রয় মিললো না কোথাও। অনাহারে অর্ধাহারে ভিক্ষা করে বারাণসীর পথে পথে সে ঘুরতে লাগলো।

কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসী। অনাথ-আতুরের সেখানে সেবার অভাব নেই। নাগরিকদের অকৃপণ দানে কত অনাথ-আশ্রম চলে। নিরাশ্রয় অনাথ ছেলেদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে সেখানে।

এমনি এক আশ্রমের অধ্যাপক হলেন বোধিসত্ত্ব। আত্মভোলা আচার্যের প্রতি বারাণসীর ধনী-দরিদ্র বালক-বৃদ্ধ সকলের শ্রদ্ধার অন্ত নেই। আচার্যের স্নেহচ্ছায়ায় পাঁচশো অনাথ ছেলে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া শিখছে।

ঘুরতে ঘুরতে নানা ঘটনাচক্রে একদিন মিত্রবিন্দক এসে উপস্থিত হলো সেই আশ্রমে। আর সেই থেকে শুরু হলো তার নতুন জীবন। আচার্যের কাছে সে ছাত্র-জীবনে দীক্ষা নিল।

শিষ্যের মেধা দেখে আচার্য চমৎকৃত হন। তার বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে বোধিসত্ত্বের মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। এমন ছাত্র লক্ষেও একটি মেলে কিনা সন্দেহ। পিতার মতো স্নেহে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে ধরেন তার সামনে।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আশ্রম-জীবনে মিত্রবিন্দক যেন হাঁপিয়ে ওঠে। দুঃসহ অবস্থা—পদে পদে নিয়মকানুনের শৃঙ্খল, ছকে-আঁটা একঘেয়ে জীবন! শুধু কি তাই? তার আগে যারা আশ্রমে এসেছে, সেই সব সহপাঠীদের তার সমীহ করে চলতে হয়। সময় সময় তাদের ফাইফরমাশ খাটতে হয়, আদেশও মানতে হয়।

অসহ্য লাগে মিত্রবিন্দকের।

ধীরে ধীরে ছাত্র-জীবনে তার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। লেখাপড়ায় আর মন নেই। সহপাঠীদের সঙ্গে শুরু হলো তার ঝগড়াবিবাদ, মারামারি।

প্রথম প্রথম সমস্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে সে ছিল একা। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকে কুটিল পথে যার যাত্রা শুরু হয়েছে, আশ্রমে যে এসেছে নিষ্করুণ জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে, সে কেন পিছু হটবে? তাই দেখতে দেখতে ছাত্রদের সে একতা কোথায় উবে গেল! ঈর্ষা দ্বেষ দলাদলিতে আশ্রম-জীবন যেন বিষিয়ে উঠলো।

মেধাবী ছাত্রের স্বভাবের এই ভয়ঙ্কর দিকের পরিচয় পেয়ে অধ্যাপক স্তম্ভিত। দিনের পর দিন মিত্রবিন্দককে তিনি কত উপদেশ দিলেন। বললেন, —"বাবা, জীবনে এত আঘাত এত বেদনা পেয়েছ। আজো কি বুঝলে না, অন্যায়ের কি ফল, কুটিল স্বভাবের কি পরিণতি? একদিকে শিক্ষাদীক্ষাহীন অন্ধকার জীবনের দুঃখকষ্ট, অন্য দিকে বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের বিপুল

প্রতিষ্ঠা—এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা মানুষের কাম্য, একটু ভাল করে ভেবে দেখ, বাবা।”

কিন্তু এসব কথা মিত্রবিন্দকের কানেও ঢুকলো না। শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব তাকে কঠিন শাস্তিও দিলেন। কিন্তু শিষ্য নির্বিকার—বেপরোয়া।

বোধিসত্ত্বের স্নানাহার, চোখের ঘুম ঘুচে গেল। আশ্রমের চিন্তায় তিনি তখন পাগলের মতো। শিক্ষার পরিবেশ নেই সেখানে—সর্বক্ষণ শুধু অশান্তি আর ঝগড়াবিবাদ। আশ্রম বুঝি আর টেকে না। তার নিন্দা ও অখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে।

মিত্রবিন্দকেরও এটা বুঝতে না পারার কথা নয়। সুতরাং আর কেন?

জীবনের ওই অধ্যায়ের উপর শেষ যবনিকা টেনে দিয়ে গোপনে সে একদিন আশ্রম ছেড়ে পালালো।

আবার সেই নিরাশ্রয় জীবন। দেশ-দেশান্তরে ঘোরে মিত্রবিন্দক। নিরুদ্দেশ পথ—কোথায় চলেছে, সে নিজেই জানে না। অনাহারে অনিদ্রায় আর পথের শ্রান্তিতে প্রথম যৌবনের উত্তেজনা তার ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। দেহ যেন আর বইতে চায় না। তবু দুর্ভাগ্য তাকে স্থির থাকতে দেয় না—ঠেলে নিয়ে চলে কোন্ এক রহস্যময় পরিণতির দিকে।

এমনি করে দিন মাস বছর পিছনে ফেলে শেষে একদিন সে এসে থামলো কাশীরাজ্যের শেষ প্রান্তে—সীমান্তের এক ছোট গ্রামে।

কিন্তু এখানেও সেই একই অবস্থা। মাসের পর মাস কেটে যায়—শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন স্থায়ী কাজ সে জোটাতে পারে না। বেঁচে থাকার তার একমাত্র উপায়—হয় ভিক্ষা, না হয় দিনমজুরি।

সীমান্ত-গাঁয়ের এই মানুষদের সে দেখে। শহর থেকে অনেক অনেক দূরের বাসিন্দা তারা। শিক্ষা-দীক্ষা তাদের খুবই কম—পাকা বুদ্ধিরও একান্ত অভাব। এমন কি গাঁয়ে একটা পাঠশালা পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেজন্যে ওদের দুঃখও নেই! সহজ সরল মানুষগুলি পুত্রকন্যা পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করে।

মিত্রবিন্দক দেখে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার বিপর্যস্ত দেহমন একটু আশ্রয় চায়, একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্যে আকুপাকু করে।

সে আকাশ-পাতাল ভাবে।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যায়, মিত্রবিন্দকের ভাষা বদলে গেছে, চেহারা পালটে গেছে।

আশ্রমে আচার্যের কাছে থেকে, সামান্য হলেও, সে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। তখন কি সে কল্পনাও করেছিল যে, আচার্যের এই যৎসামান্য

দান পরবর্তী কালে তার এত বড় উপকারে লাগবে ? আজ বাঁচার তাগিদে ওইটাই তার জীবনের একমাত্র পুঁজি হয়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একদিন তিলক-চন্দন কেটে সে বড় বড় তত্ত্বকথা আওড়াতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা অবাক হয়। আর মিত্রবিন্দক ততই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ফাঁক পেলেই যখন-তখন গ্রামবাসিদের সে শ্লোক শোনায়, সারগর্ভ নীতিবাক্য কয়, যার বেশির ভাগ অর্থ সে নিজেই জানে না। গ্রামবাসিরাও বোঝে না কিছু। আর বোঝে না বলেই তাদের আরো চমক লাগে। ভক্তি কণ্টকিত চিত্তে হাঁ করে তারা মিত্রবিন্দকের কথা শোনে।

দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে তোলপাড় শুরু হলো। সকলেরই মুখে এক কথা—ছদ্মবেশে তাদের মাঝে কত বড় একজন মহাপণ্ডিতই না এসেছেন! পণ্ডিতের মতো পণ্ডিত না হলে এমন হয় কখনো ?—কেমন নিরহংকার, কেমন নিঃস্বার্থ।

এখন কি করা ?

কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে গাঁয়ের সভা বসলো। সবাই এক বাক্যে বললে,—"এমন সুযোগ হারানো কোন কাজের কথা নয়।"

সর্বসম্মতিক্রমে মিত্রবিন্দককে তারা গাঁয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করলো। সম্মিলিত চাঁদায় পাঠশালা-ঘর উঠলো। আর সেই সঙ্গে পণ্ডিতের জন্যে উপযুক্ত বাড়ি আর বেতনেরও ব্যবস্থা হলো।

এত দিন পরে নিশ্চিন্ত মিত্রবিন্দক। এখন থেকে নিরাপদ স্বচ্ছন্দ জীবন।

অল্পদিনের মধ্যেই সে বিয়ে করে সংসার পাতলো। ক্রমে ক্রমে দুটি ছেলে হলো তার। শিশুর কলহাস্যে, শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যে ছোট সংসারটি ভরে উঠলো। মিত্রবিন্দক বড় সুখী।

কিন্তু গাঁয়ের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আগে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু কোন অশান্তিও ছিল না। মিলেমিশে সুখে শান্তিতে সবাই ঘর-সংসার করতো, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীকে বুক দিয়ে সাহায্য করতো। কিন্তু আজ ? মিত্রবিন্দকের আসার কিছুকাল পর থেকে অশান্তি যেন গাঁয়ে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে। আর শিক্ষা ? সে তো তারা মর্মে মর্মে লাভ করছে। এত সাধের পাঠশালাই কিনা আজ তাদের কাল হলো! যত কিছু শয়তানী মতলব আর সর্বনাশা পরামর্শ, সে-সবেরই জন্ম হয় ঐ পাঠশালা-ঘরে।

কিন্তু মুখ ফুটে কারো কিছু বলারও সাহস নেই। আগে নিয়মিত গাঁয়ের সভা বসতো। সর্বসাধারণের স্বার্থ নিয়ে সভায় আলোচনা হতো। এক হয়ে সবাই কাজ করতো। কিন্তু এখন পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, দলাদলি

মিত্রবিন্দক দেখে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার বিপর্যস্ত দেহমন একটু আশ্রয় চায়, একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্যে আঁকুপাঁকু করে। [পৃষ্ঠা ৯৯]

ও অবিশ্বাস এমন পর্যায়ে উঠেছে যে, কেউ কারো কাছে মুখ খোলে না ; কোন কাজে একমত হওয়া তো দূরের কথা, বহুকাল সভাই বসে না।

দুঃখে ও অশান্তির আগুনে গাঁয়ের মানুষ কাঁদে। উঠতে বসতে মিত্রাবিন্দককে তারা অভিসম্পাত দেয় আর মনে মনে গজরায়—কুচক্রী ভণ্ড শয়তান! দিন এলে এর বিচার হবে।

কিন্তু কোন সুরাহা হয় না। প্রকাশ্যে সবাই মিত্রবিন্দককে গাঁয়ের নেতা বলে মানতে বাধ্য হয়।

এমনি করে আট ন বছর কেটে গেল।

কিন্তু আর চলে না। এই কয় বছরে সর্বনাশ ও মৃত্যু যেন গ্রামখানাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

সাত-সাতটা বছর অনাবৃষ্টিতে পুড়ে সব খাক হয়েছে। সেচের যে ব্যবস্থা ছিল, নজর না দেবার জন্য তাও বিপর্যস্ত। চাষবাস তাই বন্ধ। কুয়োপুকুর শুকিয়ে ফুটিফাটা। সাত-সাতবার সারা গাঁ সর্বস্বান্ত হলো আগুনে পুড়ে। কত জন মরলো রোগে আর অনাহারে। কত জন গ্রাম ছাড়লো। তার উপর সবার বড় সর্বনাশ—রাজার কোপদৃষ্টি পড়েছে গাঁয়ের ওপর। সাত-সাতবার তারা রাজদ্বারে কঠিন শাস্তি পেয়েছে। কি তাদের অপরাধ, কেন এই শাস্তি—আজো তারা তা জানতে পারলো না।

ছন্নছাড়া সর্বস্বান্ত মানুষ আর চুপ করে থাকতে পারে না।

যে প্রশ্ন এত দিন সবার মনে গুমরে ফিরেছে, ক্রমে ক্রমে তা মুখর হয়ে ওঠে। অল্পকালের মধ্যেই তা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে বৈশাখী দাবানলের মতো। দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নির্জীব গ্রামখানা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, গর্জন করে উঠলো,—"বিচার চাই—কেন, কেন আমাদের এই নিদারুণ শাস্তি! কার দোষে এত বড় সর্বনাশ হলো আমাদের!"

চমকে ওঠে মিত্রবিন্দক। বিরোধী জনমত স্তব্ধ করার চেষ্টা সে করে প্রাণপণে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দিনে দিনে অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মিত্রবিন্দকের নাওয়া-খাওয়া, চোখের ঘুম বন্ধ। কোন ষড়যন্ত্র, ফন্দিফিকির আজ আর কাজে এল না। বহুকাল পরে আবার গাঁয়ের সভা বসলো।

আতঙ্কে বুক শুকিয়ে এল মিত্রবিন্দকের।

কয়েক মুহূর্তের সভা। মানুষের এতদিনকার পুঞ্জীভূত বেদনা ও আক্রোশের স্তূপে যেন বিস্ফোরণ ঘটে। সভা গর্জন করে উঠলো—'দূর করো—এখখুনি দূর করো ওই কুচক্রী অলক্ষুণে শয়তানকে।'

সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোটা, হাতের কাছে যে যা পেল, তাই নিয়ে ছুটলো দলে

দলে। সপরিবারে মিত্রবিন্দককে তারা মারতে মারতে দূর করে দিলে গ্রামের ত্রিসীমানা থেকে।

হতবিহ্বল মিত্রবিন্দক—দিশেহারা। এ কী হলো! অদৃষ্টের এক নির্মম আঘাতে সব কিছু চুরমার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে!

স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে বিমূঢ়ের মতো।

আগে সে ছিল একা। আজ স্ত্রী ও দুইটি অবুঝ কচি সন্তান সঙ্গে। নিষ্পাপ তিনটি জীবনের সে-ই একমাত্র অবলম্বন।

কি সে করবে এখন? কোথায় যাবে? নিঃসম্বল, কপর্দকশূন্য সে—কি দিয়ে বাঁচাবে এদের? কোথায়ই বা মিলবে আশ্রয়?

নিরুপায় ছোট সংসারটির হাত ধরে অজানা ভবিষ্যতের দিকে সে পা বাড়ায়।

চলেছে তো চলেছেই। স্বামী-স্ত্রীর প্রায়ই খাওয়া জোটে না। যেদিন জোটে, সেদিনও আধপেটা। কচি সন্তান দুটির মুখে নিজেদের মুখের গ্রাস তুলে দেয়।

মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় অধিকাংশ দিন তাদের রাত কাটে। আশ্রয় মেলে না কোথাও।

ধীরে ধীরে বসতি ক্রমেই কমে আসে।

শেষে একসময় লোকালয় শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। ভয়ংকর—দেখলে বুক কাঁপে। জল নেই, গাছপালা নেই, পাথরের মতো শুকনো মাটি।

নিরুপায় দুটি মানুষ দুটি শিশু সন্তান নিয়ে চলেছে। মাথার উপরে অগ্নিবর্ষী সূর্য। পায়ের তলায় আগুনের মতো উত্তপ্ত পৃথিবী। শিশু দুটিকে কোলে পিঠে করে স্বামী-স্ত্রী অগ্রসর হয় রোদ-ঝলসানো দিগন্তের দিকে। এক ফোঁটা জলের জন্য অন্তরাত্মা আকুলি-বিকুলি করে। ছেলে দুটি এতক্ষণ ছটফট করে এখন ধুঁকছে। কান্নারও শক্তি নেই।

সারা পৃথিবী যেন আগুনের গোলা।

আকুল চোখে তারা তাকায় দিগন্তের পানে: আর কত দূর? কোথায় লোকালয়?

অনেকক্ষণ পরে ভয়ংকর প্রান্তর শেষ হলো এক সময়। দেখা দিল ছোটখাট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। আর এক জলাশয়।

আঃ!

সবাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

স্ত্রীর আর চলার শক্তি নেই। ক্ষতবিক্ষত পা দুটো ফুলে গেছে। পথের কষ্ট আর অনাহারের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে নিষ্করুণ চিহ্ন রেখে গেছে।

মিত্রবিন্দক ব্যস্ত হয়ে উঠলো। থামলে তো চলবে না। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বেলা থাকতেই জঙ্গল পার হতে হবে। জঙ্গলের পরেই মিলবে লোকালয়।

মিলবে? লোকালয় মিলবে? আবার মিলবে মানুষের সংসার? স্ত্রী অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালো।

আর মিত্রবিন্দক ছেলে দুটিকে কাঁধে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে ঝোপঝাড়-কাঁটাবন ভেঙে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু এ কী! জঙ্গল যে ক্রমেই ঘন হয়ে আসে! বড় বড় গাছপালা শুরু হয়েছে। অতি বৃদ্ধ সব বনস্পতি যেন নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

বিহ্বল চোখে মিত্রবিন্দক এদিক-ওদিক তাকায়। কোন্ দিকে চলেছে তারা?

যত তারা এগোয়, বন ততই গভীর হয়। কোথায় পথ? মিত্রবিন্দকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। হা ভগবান! এ কী হলো?

অরণ্যের মাথায় অপরাহ্নের আলো তখন পাতায় পাতায় শেষ আলাপ সেরে বিদায় নিচ্ছে। নীচে নামছে থমথমে অন্ধকার। শব্দহীন নিষ্কম্প অরণ্য যেন কি এক আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আছে।

পথহারা চারটি প্রাণীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কারো মুখে কথা নেই। চোখে নেমেছে অশ্রুর বন্যা। ছেলে দুটিও চুপ করে গেছে।

দেখতে দেখতে বনের বুকে নেমে এল অমানিশার অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ে না। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে তারা বসে পড়লো। চারিদিক নিথর নিঝুম। জোরে নিশ্বাস ফেলতেও যেন ভয় হয়।

এমন সময় ও কী! তারা চমকে উঠলো: ও কিসের গর্জন? বহুদূরে কোন্ অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে প্রলয় গর্জনের মতো?

গর্জন তড়িৎ বেগে ছুটে আসছে, স্পষ্ট থেকে ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে।

ক্ষণেকের জন্যে মিত্রবিন্দক যেন পাথর হয়ে গেল। পরক্ষণে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো পাগলের মতো। অরণ্যও বুঝি হাহাকার করে উঠলো।

"রাক্ষস! রাক্ষস! রাক্ষসের বনে আমরা ঢুকেছি। পালাও; পালাও! আর রক্ষে নেই!"

কিন্তু কোথায় পালাবে? অন্ধকারে কে কোথায় ছিটকে পড়লো! অল্পের জন্যে মিত্রবিন্দক রক্ষা পেল বটে, কিন্তু স্ত্রী ও সন্তান দুটি হারিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

তারপর কত দিন কেটে গেছে।

এক পাগল ঘুরছে পথে পথে। স্মৃতিভ্রষ্ট বদ্ধ উন্মাদ। মাথাভরা

লম্বা রুক্ষ চুলে জট পাকিয়ে গেছে। মুখভরা দাড়িগোঁফ। পরনে শতছিন্ন ময়লা কাপড়।

পাগল নিজের মনে বিড় বিড় করে। কখনো হাসে। কখনো কি এক অসহ্য ব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদে। কখনো আবার হাহাকার করে ছোটে কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুর দিকে।

গ্রাম-জনপদ পার হয়ে, পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে পাগল কোথায় চলেছে? কত কাল কেটে গেছে, তার খেয়াল নেই।

এমনি করে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সে চমকে উঠলো। কোথা থেকে ভেসে আসছে এক মহা গর্জন! সে চিৎকার করে উঠলো—"রাক্ষস! রাক্ষস!"

হিংস্র আক্রোশে সে ছুটলো, গর্জন আসছে যেদিক থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে এল তার স্মৃতিশক্তি, তার অতীত ও বর্তমান।

থমকে দাঁড়ালো মিত্রবিন্দক: সমুদ্র! সামনে তার সীমাহীন নীল জলরাশি। ফেনিল তরঙ্গমালা উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে এদিক-ওদিক তাকায়। দূরে দেখা যায় কোন্ এক পত্তন বা বন্দর।

এ সে কোথায় এল? কি করে এল? কোথায় আর সবাই?

নিষ্পলক চোখে সে দাঁড়িয়ে থাকে। শূন্য দৃষ্টি তার দিগন্তে প্রসারিত, আকাশ যেখানে সাগরকে আলিঙ্গন করছে।

কোথায়? কোথায় তারা? স্ত্রী···ছেলে দুটি?

জনহীন রুক্ষ বন্ধুর উপকূল। জলকণার ঝাপটা এসে লাগছে তার চোখে মুখে। পাগলা হাওয়ায় রুক্ষ চুলদাড়ি উড়ছে। স্মৃতির সমুদ্র তোলপাড় করে পাগলের মতো কি খুঁজছে মিত্রবিন্দক?···

ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করে তার মনের দিগন্তে ছবি ভেসে ওঠে। টুকরো টুকরো ছবি—সীমান্ত-গ্রাম···সংসার···স্ত্রী···দুই ছেলে···মহারণ্য···ভয়ংকর রাত্রি···তারপর···তারপর···

মিত্রবিন্দকের মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। চেতনা হারিয়ে সে আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে।

ধীরে ধীরে সূর্য বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। নেমে আসে ধূসর ম্লান গোধূলি। দূরে বন্দরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো—শত শত জোনাকির মতো।

আর নির্জন উপকূলে পড়ে রইল নিঃসঙ্গ মিত্রবিন্দক—সংজ্ঞাহীন।

সময় যায়। আঁধার আরো গাঢ় হয়। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসে মিত্রবিন্দকের! সে উঠে বসলো। অস্থির পদে উঠে দাঁড়ালো। চারিদিকে একবার তাকিয়ে চললো বন্দরের দিকে।

বন্দরের নাম গম্ভীরা।

বন্দরের পথ দিয়ে মিত্রবিন্দক চলেছে। পথে পথে ঘুরছে। হঠাৎ এক সময় তার কানে এল, কে যেন ঘোষণা করছে—"অলকানন্দা নামে এক জলযান আগামীকাল ভোরে সমুদ্র-যাত্রা করবে। অলকানন্দায় কাজের জন্যে একজন লোকের প্রয়োজন। কে যেতে চাও, এস। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে।"

মিত্রবিন্দক নীরবে শুনলো সে ঘোষণা···এক বার···দু বার···তিন বার।

তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল ঘোষকের কাছে।

সমুদ্রজীবন—মিত্রবিন্দকের নতুন অভিজ্ঞতা। নীচে আদিঅন্তহীন জল আর জল—শান্ত নীল সমুদ্র। আর উপরে অনন্ত নীল আকাশ। রৌদ্রস্নাত হাসিমাখা দিনের পরে আসে তারায় ভরা মনোরম রাত্রি। দুঃখ নেই, জ্বালা নেই কোথাও—সব কিছু যেন আনন্দময়। মিত্রবিন্দকের দগ্ধ মনের উপর ধীরে ধীরে শান্তির প্রলেপ পড়ে।

জাহাজ চলেছে। মুক্তপক্ষ শুভ্র মরালের মতো পাল তুলে অলকানন্দা চলেছে দূর লক্ষ্যের দিকে। স্বচ্ছন্দগতি। নাবিকদের দাঁড় নামছে, উঠছে গানের তালে তালে। সবাই উৎফুল্ল।

এক দিন, দু দিন করে সাত দিন কাটতে চললো। বাধা নেই, বিপত্তি নেই কোথাও।

এমন সময় হঠাৎ সবাই চমকে উঠলো। জাহাজ নিশ্চল হয়ে গেছে। সর্বনাশ! সমুদ্রমগ্ন কোনো পর্বত-চূড়ায় জাহাজ আটকে গেল না তো! সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু নাঃ! তাও তো নয়!···তাহলে?

তন্ন তন্ন করে সব কিছু পরীক্ষা করা হলো। কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

এখন উপায়?—সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এমন অঘটন তো কেউ কখনো শোনে নি!

হঠাৎ একজনের মনে পড়লো, জাহাজে একজন ভাল গণৎকার আছেন। সবাই গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলো। গণৎকার বললেন, "অলকানন্দায় মনে হয় অলক্ষুণে এমন কেউ আছে, যার জন্যে এই বিপত্তি ঘটেছে।"

তিনি গণনায় বসলেন। ঘুঁটি ফেলা হলো। দেখা গেল, নাম উঠেছে সেই স্বল্পভাষী নবাগত লোকটির, যে নীরবে কাজ করে যায়, আর মাঝে মাঝে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে দূর দিগন্তের দিকে।

মিত্রবিন্দকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার নাম উঠেছে। বজ্রাহতের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল।

গণৎকার আবার দান ফেললেন। এবারও নাম ওঠে মিত্রবিন্দকের। অসহায় ব্যাকুল চোখে সে আশেপাশে তাকায়। নির্মম কঠিন সব মুখ!—মমতার শেষ বিন্দুটুকু কে যেন মুছে নিয়েছে।

গণৎকার সাত-সাতবার দান ফেললেন। প্রতিবারই সেই এক নাম উঠলো।

সুতরাং সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়?

তৎক্ষণাৎ সবাই লেগে গেল ভেলা তৈরি করতে। মিত্রবিন্দক জনে জনে সকলের হাতে পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু কে কান দেবে তার কথায়! কাজ শেষ হতেই কিছু পানীয় জল আর খাবার দিয়ে সবাই ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে দিল ভেলার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও দুলে উঠলো। সকলের সোল্লাস জয়ধ্বনির মাঝে অলকানন্দা কিছুক্ষণের মধ্যে দিগন্তরেখায় মিলিয়ে গেল।

কূলকিনারাহীন অথই সমুদ্র। সমুদ্রে সামান্য ভেলা ভাসছে। ভেলার উপরে বিমূঢ় মিত্রবিন্দক। কোনো জাহাজ নজরে পড়ে না। ডাঙারও চিহ্ন নেই কোথাও।

ভেলা ভেসে চলে।

দিন যায়, রাত্রি আসে। দিনের বেলায় সূর্য অগ্নি বর্ষণ করে, আর রাতে নির্মেঘ আকাশে তারার মেলা বসে।

সময় সময় ভেলার আশে পাশে হাঙর-কুমীর ঘোরে। আতঙ্কে মিত্রবিন্দক দাঁড় টানে আর প্রাণপণে যুঝতে থাকে তাদের সঙ্গে। তাদের লেজের ঝাপটায় ভেলা এক-একবার উলটে যায় আর কি!

কয়েক দিনের মধ্যেই খাবার ফুরিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল পিপাসার জল। তৃষ্ণায় মিত্রবিন্দক ছটফট করে। চারিদিকে এত জল। অথচ তার এক ফোঁটা সে মুখে তুলতে পারে না—এমনি লোনা।

দাঁড় টানার শক্তি তার ফুরিয়ে আসে। সে বসে থাকে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো। আর বুঝি স্বপ্ন দেখে। শৈশব-কৈশোর···আচার্যের আশ্রম···সীমান্ত-গ্রাম···সব ফিরে আসে।···স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, ছেলে দুটি খেলা করছে···।

'রাক্ষস! রাক্ষস!' বলে সে চিৎকার করে জেগে ওঠে। অবসন্নের মতো তাকায় চারিদিকে।

জীবনে এই বুঝি প্রথম মিত্রবিন্দক আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে।

একদিন এমনিভাবে জেগে উঠে দিগন্তের দিকে তাকাতেই সে সজাগ হয়ে উঠলো। দূরে বহুদূরে জাহাজের মতো কি যেন একটা দেখা যায়!

স্বপ্ন নয় তো! মিত্রবিন্দক চোখ রগড়ে, নড়ে চড়ে বসে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আবার তাকালো। না, স্বপ্ন নয়! সত্যিই জাহাজ একখানা।

দেহে যেন তার নতুন বল ফিরে আসে। সে দাঁড় টানে প্রাণপণে।

ভেলা যত এগোয়, ততই সে অবাক হয়। জাহাজের কাছে গিয়ে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক জাহাজ নয়, জাহাজের মতো অপূর্ব রথ একখানা, আগাগোড়া স্ফটিকের তৈরী—জলের উপর সেটা স্থির হয়ে আছে। রথ যে এত সুন্দর হতে পারে, তা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে মিত্রবিন্দক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল।

তারপর এক সময় চমক ভাঙতে সন্তর্পণে সে রথের কাছে গিয়ে ভেলাটাকে লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে রথের উপর উঠে পড়লো।

ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করে। আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সে এগোয় আর অবাক হয়। জগতের কোথাও যে বিলাস-ব্যসনের এত আয়োজন থাকতে পারে, তা কল্পনাতীত। এ সে কোথায় এল?

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই সে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো। অদূরে চারজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ সুন্দরী। এত সুন্দরী যে চোখ ফেরানো যায় না।

বিমূঢ়ের মতো মিত্রবিন্দক দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে সে ঘেমে উঠেছে। সারা দেহ কণ্টকিত।

তরুণীরা মৃদু হেসে মধুর কণ্ঠে বললে,—"ভাই অতিথি, তুমি কি ভয় পেয়েছ? কোনো ভয় নেই। আমরা দেবকন্যা। অন্যায় করেছিলাম, তাই দেবরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে এখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি। থাকবে তুমি আমাদের সঙ্গে? তোমাকে দেখে আমরা বড় খুশি হয়েছি। থাকো ভাই এখানে।"

আনন্দে মিত্রবিন্দকের ইচ্ছা হলো ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। দেবকন্যারা তাকে ওদের সঙ্গে এমন জায়গায় থাকতে অনুরোধ করবে,—এ সৌভাগ্য সে কি কোনো দিন ভাবতে পেরেছে?

সে রয়ে গেল সেখানে। কথাবার্তায় সে আরো পরিচয় পেল দেবকন্যাদের। দেবরাজ্যের আনন্দসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েও ওরা নিস্তার পায়নি। এখানকার এই স্বল্প সুখও তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে পারে না। এক সপ্তাহ তারা সুখ ভোগ করে, পরের সপ্তাহ দুঃখে কাটায়। আর সে-সময় তারা এখানে থাকতে পারে না, অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে তারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

রথের উপরে মিত্রবিন্দকের দিন কাটে যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। আনন্দবিলাসের সীমা নেই—না চাইতেই সব যেন তার হাতের কাছে এসে জড়ো হয়।

এমনি করে সাত দিন কেটে গেল। কোথা দিয়ে যে কাটলো, মিত্রবিন্দক টেরই পায় নি। তার চমক ভাঙলো, যখন এক সন্ধ্যায় ছলছল চোখে

দেবকন্যারা এসে বললে—"ভাই, কাল থেকে আমাদের দুঃখের সপ্তাহ শুরু হবে। সাত দিনের জন্য অন্যত্র যেতে হবে আমাদের।"

পরদিন ভোরে বিদায় নেবার সময় মিত্রবিন্দককে তারা বারবার সাবধান করে দিয়ে বললে—"ভাই, রথ ছেড়ে কোথাও যেও না কিন্তু। তাহলে বিপদ ঘটবে। একটু অসুবিধা ঘটলেও আমরা না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থেক। বুঝলে?"

মিত্রবিন্দক হাঁ-না কিছুই বললে না। দেবকন্যারা চলে যেতেই সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেঃ ছোঃ! বয়ে গেছে তার এখানে থাকতে!

এই কয় দিনে দেবকন্যাদের সঙ্গে কথাবার্তায় সে পরিষ্কার বুঝেছে, সামনে কোথাও এর চেয়েও ভাল জায়গা আছে।

মুহূর্ত দেরি না করে গোপন স্থান থেকে সে ভেলা টেনে বের করলো।

আবার সেই অকূল সমুদ্র। দেখতে দেখতে স্ফটিকের রথ কোথায় মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে দূরে দিগন্তরেখায় দেখা দিলে আর একখানা রথ। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। রথের কাছে গিয়ে মিত্রবিন্দকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রূপোর তৈরী এ দেবযান—স্ফটিক-রথের চেয়ে শতগুণ সুন্দর।

আগের মতোই ভেলা লুকিয়ে রেখে মিত্রবিন্দক রথে উঠলো।

এখানে বাস করে আটজন দেবকন্যা। এদেরও অবস্থা আগেকার দেব-কন্যাদের মতো। মিত্রবিন্দককে পেয়ে তারাও খুব খুশী।

দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে যায়। দেবকন্যাদের এবার দুঃখের সপ্তাহ শুরু হবে। পরদিন বিদায় নেবার সময় স্ফটিক-রথের কন্যাদের মতো তারাও বারবার সাবধান করে গেল মিত্রবিন্দককে, কোথাও যেন সে না যায়।

কিন্তু কে শুনবে সে কথা! মিত্রবিন্দকের ভেলা আবার সমুদ্রে ভাসলো। দেবকন্যাদের কথাবার্তা থেকে সে বুঝেছে, সামনে কোথাও এর চেয়েও আরামের জায়গা আছে।

বহুক্ষণ পরে তার দৃষ্টির সামনে দিগন্তরেখায় আবার একখানা রথ জেগে উঠলো। অপূর্ব সে রথ—মণিময়। তার গা থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ছে।

এখানে বাস করে ষোলজন দেবকন্যা। এদেরও জীবন আগের কন্যাদের মতোই। এরাও মিত্রবিন্দককে সাদরে গ্রহণ করলো।

তারপর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এখানকার দেবকন্যারাও দুঃখের সপ্তাহে অন্যত্র যাবার আগে মিত্রবিন্দককে কোথাও না যেতে বারবার নিষেধ করে গেল।

কিন্তু ফল যা হবার তাই হলো। মিত্রবিন্দক আবার ভেলা ভাসালো সমুদ্রে। এর চেয়েও ভাল স্থান যে সামনে আছে, তা সে আগেই জেনেছে।

কতক্ষণ পরে—হঠাৎ একসময় বহুদূরে চোখ পড়তেই সে চমকে উঠলো। সমুদ্রের এক কোণে আগুন লেগেছে, মনে হয়। দিগন্ত আলোয় আলোময়।

কাছে গিয়ে সে যা দেখলে, তা মানুষের স্বপ্নেরও বাইরে। এক অদ্ভুত দেবযান, ত্রিভুবনে যার শোভার তুলনা নেই! স্বর্ণময় সে রথ মণিমাণিক্যে ঝলমল করছে।

এখানে বাস করে চব্বিশজন দেবকন্যা। আগের কন্যাদের মতো এদেরও অভিশপ্ত জীবন।

দেবভোগ্য অফুরন্ত আনন্দ-সুখ এখানে। সব কিছু যেন স্বর্গের সুষমা দিয়ে তৈরী। সাতটা দিন মিত্রবিন্দকের যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। এবার বিদায়ের পালা। দেবকন্যারা জনে জনে মিত্রবিন্দককে বারবার সাবধান করে বললে—"ভাই, খুব সাবধানে থেক। রথ ছেড়ে কোথাও যেও না। তাহলে কিন্তু নিশ্চিত বিপদ ঘটবে।"

মিত্রবিন্দক মনে মনে হাসে ঃ হুং, সবারই ওই এক কথা! আরে বাপু, তোমাদের কথা শুনলে এত সুখ আমি কোথায় পেতাম? ওসব ভয় দেখানো কথা অনেক শুনেছি।

সুতরাং আবার সে রওনা হয়। এবার সে চলেছে হীরক-রথের উদ্দেশ্যে। এ রথের কথা সে অবশ্য কারো কাছে শোনেনি। এটা তার ধারণা। সেখানকার সুখের কল্পনায় সে তখন বিভোর।

কিন্তু যত দেরি হয়, ততই সে সচকিত হয়ে ওঠে। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয় ঃ তাই তো! কি হলো? সেই কোন্ ভোরে রওনা হয়েছে, সূর্য এখন প্রায় মাথার উপরে। এত দেরি হবার তো কথা নয়। সেই সকাল থেকে এক ফোঁটা জল বা দানা পেটে পড়েনি। সঙ্গেও আনেনি কিছু। ফিরে যাবে, তারও উপায় নেই। স্বর্ণরথ কোথায় হারিয়ে গেছে!

স্রোতের টানে পাক খেতে খেতে ভেলা ভেসে চলে। ভেলার উপরে মিত্রবিন্দক ক্ষুধা তৃষ্ণা আর উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ এক সময় সে দেখে, দূরে—বহু বহুদূরে কি যেন দেখা যায়!…না, রথ নয়—এক স্থলভাগ। তার কালো উপকূল-রেখা মেঘের মতো দিগন্তে মিশে আছে।

স্থলভাগ ক্রমেই স্পষ্ট হয়।…

এক অজানা দেশ—বহু দ্বীপের সমষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, জন-মানবের সাড়া নেই কোথাও। একটা প্রাণীও চোখে পড়ে না।

ভেলা তখন দ্বীপগুলির ভিতর দিয়ে চলেছে। একটা বড় দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিত্রবিন্দক হঠাৎ বহুদূরে এক সুন্দর প্রাসাদ দেখতে পায়।

কোন রাজপুরী হয়তো। তাড়াতাড়ি এক ঝোপের আড়ালে ভেলা বেঁধে সে নেমে পড়লো। দ্রুত পা চালিয়ে দিলে রাজপুরীর দিকে। একবারও সে ভাবলে না যে, অমন সুন্দর বিশাল রাজপ্রাসাদ যে দেশে, সেখানে মানুষ নেই কেন? বহু দূর থেকে হলেও প্রাসাদ কেন ওরকম নির্জন পরিত্যক্ত মনে হয়?

মিত্রবিন্দক দ্রুত এগিয়ে চলে নরখাদক যক্ষদের পুরীর দিকে।

কিছুদূর যেতেই দেখে, অদূরে একটা ছাগল চরছে।

ক্ষিদেয় তখন পেট জ্বলছে। হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি ছাগলটাকে দেখে তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রাজপুরী তখনো অনেক দূর। তাই ছাগলটাকে দিয়েই আগে ক্ষিদেশান্তি করা যাক।

পা টিপে টিপে সে এগিয়ে যায়। ছাগলটা পিছন ফিরে চরছে। মিত্রবিন্দক অতি সন্তর্পণে গিয়ে হঠাৎ খপ্ করে তার পিছনের একখানা ঠ্যাং চেপে ধরলো।

ছাগলটা আসলে ছাগলই নয়—এক যক্ষিণী ছাগলের মূর্তি ধরে চরছে সেখানে। মিত্রবিন্দক হঠাৎ ঠ্যাং চেপে ধরতেই সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। ফিরে তাকানোর কথা মাথায়ও এল না। নিদারুণ ভয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সে মারলো এক লাথি।

কথায় বলে, যক্ষিণীর লাথি! সে কি আর যা-তা ব্যাপার! লাথির চোটে মিত্রবিন্দক ছিটকে আকাশে উঠে গেল। তারপর ঘুরপাক খেতে খেতে তীরবেগে উড়ে চললো আকাশপথে—কখনো উপুড় হয়ে, কখনো কাৎ হয়ে, কখনো বা চিৎ হয়ে। মাথা তার কখনো নীচের দিকে নামে, কখনো বা ওঠে উপরে। কখনো সে সংজ্ঞাহীন, কখনো বা ক্ষণেকের জন্যে সংজ্ঞা ফিরে আসে। দুঃসহ যন্ত্রণায় সারা দেহ তার থরথর করে কাঁপছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করে মিত্রবিন্দক।

এমনিভাবে কত দণ্ড, কত প্রহর, কত সময় কেটে যায়! কত দেশ-দেশান্তর, সাগর-মহাসাগর, অরণ্য-পর্বতের উপর দিয়ে আকাশপথে ছুটে চলে মিত্রবিন্দক।

শেষে এক সময় সে ধপাস করে মাটিতে এসে পড়লো। তার ভাগ্য ভাল বলতে হবে—যেখানে পড়লো, সেখানটা বড় বড় ঘাস, লতাপাতা আর কাঁটা ঝোপঝাড়ে ভরতি। তাই কাঁটায় গা হাত পা ছড়ে গেল বটে, কিন্তু প্রাণটা রক্ষা পেল।

ধীরে ধীরে মিত্রবিন্দক চোখ মেলে। বড় দুর্বল, বড় ক্লান্ত সে। সর্ব

শরীর ব্যথায় টনটন করছে। খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থেকে যেমন সে উঠতে যাবে অমনি আবার সে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো নীচের দিকে। কোথায় চললো এবার? পাতালে বোধ হয়!

কিন্তু না—কয়েক মুহূর্ত পরে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ায়।

অপরিচিত এক দেশ।

হঠাৎ পিছনে একটা খসখস শব্দ কানে যেতেই সে ফিরে দাঁড়ালো। দেখে, অল্প দূরে এক পাল ছাগল চরছে।

ছাগল!—মিত্রবিন্দক চমকে উঠলো। চকিতে তার মনে পড়ে সেই দ্বীপের কথা। একটা ছাগলের লাথির ঘায়ে সে এখানে এসেছে, এদের একটার পা ধরলে হয়তো আবার সেই দেবকন্যাদের কাছে গিয়ে পড়বে।

ছুটে গিয়ে সে বড় একটা ছাগলের পা জড়িয়ে ধরলে। ছাগলটা ভয় পেয়ে ভ্যা করে উঠতেই কোথায় ছিল একদল লোক, ছুটে এসে জাপটে ধরলো মিত্রবিন্দককে।

ছাগলগুলো ছিল কাশীরাজের। মিত্রবিন্দক যেখানে এসে পড়েছে, সেটা বারাণসী নগরীর উপকণ্ঠ—নগর-প্রাকারের গড়খাই। কিছুকাল যাবৎ রাজার ছাগল চুরি যাচ্ছে বলে পাহারাদাররা চোর ধরার জন্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। মিত্রবিন্দক তাদের হাতেই ধরা পড়েছে।

মারতে মারতে পাহারাদাররা বললে—"ব্যাটা, এতকাল তাহলে রাজার ছাগল তুই-ই চুরি করছিলি?"

মিত্রবিন্দক প্রথম দিকে কিছু বুঝতে না পেরে মার খাচ্ছিল আর কাঁদছিল, পাহারাদারদের কথা শুনে চমকে উঠলো। হাউমাউ করতে করতে বললে—"কি বলছো তোমরা? আমি এদেশে ছিলাম না, এদেশের লোক আমি নই। রাজার ছাগলও আমি চুরি করতে আসিনি।

হি-হি করে হেসে উঠলো পাহারাদাররা। তার গালে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিয়ে একজন গর্জন করে উঠলো—"তবে কি করতে এসেছিলি রে, শয়তান? ছাগলের পা ধরেছিলি কি ওকে পুজো করার জন্যে?"

মিত্রবিন্দককে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে তারা নিয়ে চললো রাজার কাছে।

শাস্তির কথা ভেবে মিত্রবিন্দক তখন হাউ-হাউ করে কাঁদছে। ছাগল চুরির অপরাধে আজ তাকে শূলে যেতে হবে। কে বিশ্বাস করবে তার কথা?

কাঁদতে কাঁদতে ক্ষীণকণ্ঠে সে যত বলে—"আমি চোর নই, আমায় ছেড়ে দাও···"

পাহারাওয়ালারা ততই মারে আর বলে—"তবে তুই কি রে, ব্যাটা? রাজবাড়ির গুরুদেব?"

রাজপথে কত লোক যাতায়াত করে। পাহারাওয়ালাদের কথা শুনে সবাই হাসে, টিটকারি দিতে দিতে চলে যায়।

মিত্রবিন্দক আর দাঁড়াতে পারছে না। তার পা টলছে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, চোখ-মুখ ফুলে গেছে। মারের চোটে এক-একবার সে চোখে আঁধার দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। পাহারাওয়ালারা অমনি টেনে তোলে। বলে—"বদমাস, চালাকি পেয়েছিস? ভেবেছিস, এই সব ন্যাকামিতে আমরা ভুলবো?"

সে সময় পাঁচ শো শিষ্য সঙ্গে নিয়ে আচার্য বোধিসত্ত্ব সে পথে নদীতে চলেছেন স্নান করতে। মিত্রবিন্দককে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। মিত্রবিন্দকেরও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো: আর রক্ষা নেই! রাজার কাছে এবার তার পুরনো দুষ্কর্মও ফাঁস হবে।

মিত্রবিন্দকের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বোধিসত্ত্ব পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করলেন—"একে মারছো কেন, বাপু? নিয়েই বা চলেছ কোথায়?"

সসম্ভ্রমে পাহারাওয়ালারা বললে—"প্রভু, এ ব্যাটা চোর। কিছু দিন ধরে রাজার ছাগল চুরি যাচ্ছিল বলে আমরা লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম। এ ব্যাটা হঠাৎ কোথা থেকে চুপিসাড়ে এসে বড় ছাগলটার পা ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়। তাই ওকে মহারাজের কাছে নিয়ে চলেছি।"

মিত্রবিন্দকের দিকে তাকিয়ে আচার্য জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে বাপু, ওরা যা বলছে, তা কি সত্যি? মিথ্যে বলো না।"

কাঁপতে কাঁপতে মিত্রবিন্দক আচার্যের পদতলে বসে পড়লো, ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "না গুরুদেব, আমি চোর নই। জীবনভোর অনেক অন্যায় করেছি, দুঃখও পেয়েছি তার শতগুণ, কিন্তু কখনো চুরি করিনি, মিথ্যেও বলিনি। গুরুদেব, বিশ্বাস করুন—এদেশে আমি ছিলাম না, কিছুক্ষণ আগে এসেছি। চুরি করার জন্যে ছাগলের পা ধরিনি, ধরেছিলাম অন্য কারণে। ওরা কেউ তা শুনলে না। শুনলেও তা বিশ্বাস করতো না। আপনি বিশ্বাস করুন, গুরুদেব।"

তার কথা শুনে পাহারাওয়ালারা 'বটে রে!' বলে ডাণ্ডা ওঠাতেই বোধিসত্ত্ব বাধা দিলেন। বললেন—"শোন বাপু, তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে···"

পাহারাওয়ালারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো—"এ কি বলছেন, গুরুদেব? আপনি আমাদের অনুরোধ করবেন কি? আদেশ করুন।"

মৃদু হেসে বোধিসত্ত্ব বললেন—"বেশ বেশ, তাই হলো। তা দেখ, এ লোকটা এককালে আমার শিষ্য ছিল। ওকে তোমরা আমার হাতে দিয়ে যাও। আমিই ওকে শাসন করবো। চিরকাল ও আমার দাস হয়ে থাকবে।"

পাহারাওয়ালারা আর দ্বিরুক্তি করলো না। মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হাতে দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিল।

আশ্রমে এসে সেই যে মিত্রবিন্দক এককোণে আশ্রয় নিয়েছে, আর ওঠেনি— স্নান করেনি, খায়নি। কত জনে কত অনুরোধ করছে, সাধ্যসাধনা করছে। কিন্তু মিত্রবিন্দক যেন নিশ্চল পাষাণ। দৃষ্টি তার বহু দূরে পিছনে চলে গেছে।

সেই আশ্রম! কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যেখানে সে আশ্রয় পেয়েছিল, স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিল, পেয়েছিল নতুন জীবনের আস্বাদ—অতীতের কত স্মৃতিঘেরা সেই আশ্রম! সেই গুরুদেব!

ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়, সূর্য ডোবে পশ্চিমে। আপন আপন নীড়ে ফেরে সবাই। মিত্রবিন্দক বসে আছে—বাহ্যজ্ঞানরহিত।

সন্ধ্যার পর বোধিসত্ত্ব এলেন। তার মাথায় হাত রেখে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন—"মিত্রবিন্দক, সারাটা দিন একভাবে বসে রইলে?"

মিত্রবিন্দক একবার নড়ে উঠলো। মমতাভরা চোখে বোধিসত্ত্ব বললেন— "বাবা, এ কয় বছরে তোমার জীবনে কি ঘটেছে, জানি নে। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, অনেক দুঃখবেদনা তুমি পেয়েছ। সেসব কথা এখন থাক, বাবা। যা চলে গেছে, শত কাঁদলেও তা আর ফিরে আসবে না। এখন ওঠ।···কথা শোন, বাবা। আমি তো শুধু তোমার গুরু নই, তোমার পিতৃসমও বটে।"

হায় হায় করে ডুকরে কেঁদে উঠলো মিত্রবিন্দক, আচার্যের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বললে—"গুরুদেব, আমি···আমি···আমায় একটু আশ্রয় দিন গুরুদেব··· আমার সব গেছে···বাকি জীবন আপনার দাস···"

বলতে বলতে সে জ্ঞান হারায়।

সর্বহারার বুকফাটা কান্নায় অন্ধকারও যেন গুমরে ওঠে।

সজল চোখে গুরুদেব তার মাথায় হাত রাখলেন।

কত বড় রাজা ব্রহ্মদত্ত। তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কত মন্ত্রী কোটাল সভাসদ্। সিপাহীসান্ত্রী সৈন্যসামন্তে জমজম করে রাজপুরী!

এত বড় রাজ্যের এত বড় রাজা—ব্রহ্মদত্ত! কিন্তু তাঁর ছেলে মাত্র একটি!

রাজা-রানীর সে চোখের মণি, আদরের দুলাল। তার আবদার রাখতে সমস্ত দাসদাসী—মায় সারা রাজপুরী হিমসিম খেয়ে যায়। ছেলে তো নয়, যেন মূর্তিমান বিচ্ছু। রাজা-রানী আদর করে তার নাম রাখেন দুষ্টকুমার।

নামের সঙ্গে স্বভাবের ওরকম মিল কদাচিৎ চোখে পড়ে। দুষ্টকুমার যত বড় হয়, রাজ্যের লোক ততই হাড়ে হাড়ে টের পায় এটা। রাজার ছেলে হয়েও শাস্ত্র বা শস্ত্রবিদ্যা কোন বিদ্যাই সে শিখলো না। রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ তার অত্যাচারে।

তার কাছে ছোটবড় সবাই সমান—লোকের মানপ্রতিপত্তি বা বয়সের বাচবিচার নেই। যাকে তাকে যখন তখন সে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করে, রেগে গেলে সময় সময় উত্তম-মধ্যম দিতেও ছাড়ে না। ফলে, তাকে আসতে দেখলে লোকে যেন রাক্ষস দেখেছে—এমনিভাবে পালিয়ে প্রাণ ও মান দুই-ই বাঁচায়। কারো কিছু বলারও উপায় নেই। রাজার ছেলে! —তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেছো কি, সোজা গর্দান! তাই মুখ বুজে সবাইকে সব সইতে হয়।

এর ফলে, রাজা-রানী ছাড়া রাজ্যে এমন একটি সৎ লোক নেই, যে তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে, সারাক্ষণ তার মৃত্যু কামনা না করে।

এমনি করে সবাই যখন জ্বলছে, তখন হঠাৎ একদিন দুষ্টকুমারের শখ হলো, নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটবে। হাজার রকমের শখ, হাজার রকমের খেয়াল তার। আর তা পূরণ হতে মুহূর্তেরও তর সয় না।

সুতরাং ইয়ারবন্ধু, চাকরবাকর নিয়ে, চারিদিক সচকিত করে দুষ্টকুমার গেল নদীতে।

সাঁতার কাটতে কাটতে আবার একসময় তার কি খেয়াল হলো, চাকরদের ডেকে বললে—"এই হতভাগার দল, শোন্—নদীর মাঝখানে আমায় নিয়ে চল্, ওখানে গিয়ে সাঁতার কাটবো।"

পাহাড়ী নদী—মাঝ নদীতেও জল অল্প, বড় জোর মাথা জল। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দুষ্টকুমার খেলায় মেতে উঠলো।

কোনো দিকে কারো খেয়াল নেই।

হঠাৎ একসময় মেঘের গর্জন কানে যেতেই তারা চমকে উঠলো। দেখলো, চারিদিক অন্ধকার করে এসেছে। কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। রুদ্ধ আক্রোশে তারা ফুঁসছে—উন্মত্ত দানব বুঝি ছাড়া পেয়ে দাপাদাপি শুরু করেছে।

দেখতে দেখতে আকাশ যেন ভেঙে পড়লো মাথার উপর। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। আর সেইসঙ্গে ঘনঘন মেঘ-গর্জন, বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ভ্রূকুটি। এক হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না—এমন নিকষকালো অন্ধকার।

পরক্ষণে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে কানে এল এক প্রলয়ের মহা গর্জন। অন্ধকারে সকলে চেঁচিয়ে উঠলো—'বন্যা! বন্যা!'

মরিবাঁচি করে প্রাণের দায়ে সবাই ছুটলো তীরের দিকে। দুষ্টকুমারের আর্তনাদ শোনা গেল—"গেলাম! গেলাম!"

অন্ধকারে আর আতঙ্কে তার দিক ভুল হয়ে গেছে। চিৎকার করে সে ডাকতে লাগলো বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকরদের।

কিন্তু কোথায় কে? ততক্ষণে বন্ধুবান্ধবের দল উধাও। চাকরবাকরও পালিয়েছে। তার জন্যে কে যাবে প্রাণ দিতে? বরং সে মরলে সবার হাড় জুড়োয়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্যা এসে আকাশসমান ঢেউয়ের তোড়ে দুষ্ট-কুমারের আর্তনাদ স্তব্ধ করে দিল।

তীরে দাঁড়িয়ে ছিল বন্ধুবান্ধবের দল। চাকররা ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলে—"রাজকুমার কই?"

চাকররা যেন আকাশ থেকে পড়লো, বললে—"তা তো বলতে পারি নে। আমরা ভাবলাম, রাজকুমারকে নিয়ে আপনারা বুঝি আগেই চলে এসেছেন। হায় হায়! কি হবে এখন?"

বন্ধুরা চুপ। অন্ধকারে নদীর তীরে তীরে তারা খুঁজতে লাগলো রাজকুমারকে, তার নাম ধরে কত ডাকলো। শেষে একজন বললে—"কুমার হয়তো আগেই বাড়ি চলে গেছেন।"

শুকনো মুখে তারা ফিরে এল রাজপুরীতে।

লোকজন নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠায় রাজা সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওরা

আসতেই জিজ্ঞেস করলেন—"কই, কুমার কোথায়? তোমরা এলে, সে কোথায়?"

মাথা হেঁট করে বন্ধুরা বললে—"আমরাও তো তাকে খুঁজছি, মহারাজ। নদীতে সে নেই; তাই মনে করলাম, হয়তো আগেই প্রাসাদে ফিরে এসেছে।"

রাজা-রানী অস্থির হয়ে পড়লেন। সেই বিষম দুর্যোগ মাথায় করে লোকলস্কর নিয়ে রাজা ছুটলেন নদীতে। তারপর কত খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি।

রাজপ্রাসাদ কান্নায় ভেঙে পড়লো।

এদিকে হাবুডুবু খেতে খেতে দুষ্টকুমার ভেসে চলেছে। ঢেউয়ের তোড়ে সে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে—ডুবছে, ভাসছে আর আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করছে—'বাঁচাও! বাঁচাও!'

চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কালো কালি দিয়ে কে যেন সব লেপে দিয়েছে—নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। হঠাৎ দুষ্টকুমারের হাতে কি যেন ঠেকলো। হাত বুলিয়ে বুঝলে—প্রকাণ্ড এক কাঠের গুঁড়ি।

দুষ্টকুমার প্রাণপণে সেটা জড়িয়ে ধরলো, তারপর সব শক্তি জড়ো করে উঠে বসলো তার মাঝখানে।

গুঁড়ির উপরে কিন্তু আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছিল আরো তিনটি প্রাণী—এক সাপ, এক ইঁদুর আর এক শুকপাখি।

আগের জন্মে সাপ ছিল মহা ধনবান এক বণিক—অফুরন্ত ধন সম্পদের মালিক। চোরের ভয়ে চল্লিশ কোটি সোনার মোহর সে ওই নদীর ধারে এক জায়গায় পুঁতে রেখেছিল। ধনদৌলতের উপর তার এমনি লোভ ছিল যে, মৃত্যুর পরেও সে মুক্তি পেল না। সাপ হয়ে ওই ধনভাণ্ডারের কাছেই এক গর্তে এসে বাসা নিল।

সাপের মতো ইঁদুরও আগের জন্মে ছিল আর এক বণিক। সে-ও ত্রিশ কোটি সোনার মোহর পুঁতে রেখেছিল ওই নদীর কূলে আর এক জায়গায়। সম্পদের ওপর তারও লোভ ছিল অসীম। তাই মৃত্যুর পরে ইঁদুর হয়ে ধনভাণ্ডারের কাছেই এক গর্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

ওদিনের মতো এমন ঝড় বৃষ্টি বন্যা তারা জীবনে দেখেনি। বানের জল গর্তে ঢুকতেই প্রাণের দায়ে তারা বেরিয়ে এল। চারিদিক তখন জলে জলময়। সাঁতার কাটতে কাটতে কাঠের গুঁড়িটা সামনে পেতেই তার উপর তারা চড়ে বসেছিল—সাপ একদিকে, ইঁদুর অন্যদিকে।

শুকপাখি বাস করতো ওই নদীর ধারে এক শিমুল গাছে। ঝড়ে গাছটা উপড়ে পড়তেই শুক উড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুদূর

যেতে না যেতেই ঝড়ে আর বৃষ্টির ঝাপটায় আছাড় খেয়ে পড়েছিল গুঁড়িটার উপর।

এমনি করে অসহায় চারটি প্রাণী একখণ্ড কাঠ আশ্রয় করে ভেসে চললো। আর অবিরাম চেঁচিয়ে চললো দুষ্টকুমার—'ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও বাঁচাও! রক্ষা করো!'

যে সময়ের কথা বলছি, তখন বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন নিরাসক্ত—সংসারবিরাগী। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে তাঁর মন তো বসলোই না, বরং বৈরাগ্য আরো বেড়ে চললো। শেষে একদিন সবকিছু ত্যাগ করে জীবনে পরম সত্য লাভের আশায় তিনি সন্ন্যাস নিলেন; এবং নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে কুটির বাঁধলেন ওই নদীর বাঁকে এক বনস্থলীতে।

সেদিন নিশীথ রাত্রি, পৃথিবীর বুকে বিষম তাণ্ডব। ঘনঘোর অমানিশার অন্ধকারে আকাশ ও পৃথিবী একাকার। সন্ন্যাসী বোধিসত্ত্ব কুটিরের সামনে পায়চারি করছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে এল অসহায় মানুষের আর্ত কণ্ঠ, 'ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও বাঁচাও! রক্ষা করো।'

বোধিসত্ত্ব সচকিত হয়ে উঠলেন: বিপন্ন জীব! বন্যাকবলিত বিপন্ন মানুষ ডাকছে।

'ভয় নেই' বলতে বলতে তিনি জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিলেন দুরন্ত বন্যায়।

দেহে তাঁর হাতির জোর। মনের জোর আরো বেশি। আর্ত জীবকে বাঁচানোর চিন্তায় সে জোর যেন শতগুণ বেড়ে গেল। হিংস্র বন্যা তাঁকে রুখতে পারলো না, দুরন্ত স্রোত হার মানলো তাঁর কাছে। ঢেউয়ের উপর দিয়ে তীরের মতো সাঁতরে গিয়ে তিনি কূলে টেনে আনলেন গুঁড়িটাকে।

দুষ্টকুমারকে কোলে তুলতে গিয়েই তাঁর নজরে পড়লো আরো তিনটি প্রাণী—এক সাপ, এক ইঁদুর আর এক শুকপাখি মরার মতো পড়ে আছে গুঁড়ির উপর।

বোধিসত্ত্ব সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কুটিরে ফিরে আগুন জ্বালালেন।

ইতর প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর বড় কষ্ট হলো। আহা! স্বল্পপ্রাণ অবোলা জীব! না জানি কত কষ্ট হচ্ছে—বলতে পারছে না! শীতে এখনি হয়তো মরে যাবে। তাই আগে তিনি ওদের সযত্নে আগুনে সেঁকলেন, সেবাশুশ্রূষা করলেন। তারপর নজর দিলেন দুষ্টকুমারের দিকে। খাওয়ার বেলাতেও সেই ব্যবস্থা—আগে ইতর প্রাণীদের, তারপর দুষ্টকুমারের।

ধীরে ধীরে জন্তুগুলো সুস্থ হয়ে উঠলো। দুষ্টকুমারও সুস্থ হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্বের ব্যবহারে তার সারা অন্তর বিষিয়ে গেছে, নিজের

প্রথম চৌমাথায় এসে রাজ-অনুচরেরা বোধিসত্ত্বকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করালে। তারপর শুরু করলে কশাঘাত—অবিশ্রান্ত, বৃষ্টিধারার মতো।

[পৃষ্ঠা ১২৪]

মনে সে ফুঁসছে : কোথাকার এক নগণ্য সন্ন্যাসী! তার এত স্পর্ধা যে, ইচ্ছে করে তাকে অপমান করে! সে রাজপুত্র—তার সেবা আগে না করে ভিখিরী শয়তানটা পরিচর্যা করছে কিনা ওই ইতর জন্তুগুলোর!

মনে মনে সে স্থির করলে, 'দিন এলে সুদে আসলে এর শোধ তুলবো।'

কয়েক দিন পরে বন্যার জল নেমে যেতে, তারা একে একে এসে বিদায় নিল সন্ন্যাসীর কাছে।

প্রথমে সাপ এসে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে—"বাবা, আপনার জন্যে প্রাণ ফিরে পেয়েছি, একথা চিরকাল মনে থাকবে। এ ঋণ আমি কোন দিনই শোধ করতে পারবো না। তবু বাবা, আমি গরীব নই। আমার গর্তের কাছে মাটির নীচে চল্লিশ কোটি সোনার মোহর পোঁতা আছে, এত দিন আমিই তার মালিক ছিলাম। আজ থেকে সে সবই আপনার। যত শীঘ্র সম্ভব সম্পদের ঐ বোঝা থেকে আমায় আপনি মুক্তি দিন। যখনই ওটা আপনার দরকার হবে, আমার বাসার কাছে গিয়ে একবার শুধু 'দীঘা' বলে ডাকবেন, আমি তখখুনি বেরিয়ে এসে সমস্ত ধনভাণ্ডার আপনাকে দেখিয়ে দেব। বলুন বাবা, আপনি যাবেন?"

সহাস্যে বোধিসত্ত্ব কথা দিতে সাপ মহানন্দে নিজের বাসার ঠিকানা জানিয়ে বিদায় নিল।

এবার ইঁদুর এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললে—"বাবা, আপনার দয়াতেই মরতে মরতে বেঁচে গেছি। এ উপকার আমি ভুলতে পারবো না। আমিও নিতান্ত নির্ধন নই। আমারও গর্তের কাছে মাটির নীচে তিরিশ কোটি সোনার মোহর পোঁতা আছে। সে ধন আপনাকে দিয়ে আমি মুক্তি পেতে চাই। দরকার হলেই আপনি দয়া করে আমার গর্তের কাছে গিয়ে একবার কেবল 'মুষিক' বলে ডাকবেন, আমি তখখুনি সমস্ত ধন আপনার হাতে তুলে দেব।"

ইঁদুর চলে যেতেই শুক এগিয়ে এল, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললে—"বাবা, যত দিন বাঁচবো আপনার দয়া ও মহত্ত্বের কথা ভুলতে পারবো না। কিন্তু বাবা, আমার তো দেবার মতো টাকাপয়সা সোনাদানা নেই। একটা কাজ আমি করতে পারি। আপনার যদি কখনো ভাল ধানের দরকার হয় তো আমি যে গাছে থাকবো, তার কাছে গিয়ে একবার শুধু 'শুক' বলে ডাকবেন—আমি তখখুনি জ্ঞাতিবন্ধুদের নিয়ে আপনার জন্যে পৃথিবীর সেরা ধান গাড়ি গাড়ি এনে দেব।"

এই বলে নিজের গাছের ঠিকানা দিয়ে শুক চলে যেতেই দুষ্টকুমার এসে প্রণাম করলো। মুখে হাসি টেনে বললে—"প্রভু, আমি বারাণসীর রাজা হলে দয়া করে আমার কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেবেন। সাধ্যমতো উপচারে আপনার পুজো করবো।"

প্রশান্ত হেসে সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলেন

তারপর কত দিন কেটে গেছে !

ইতিমধ্যে ব্রহ্মদত্ত মারা গেছেন। বারাণসীর রাজা হয়েছে দুষ্টকুমার।

প্রায়ই বোধিসত্ত্বের মনে পড়ে দুষ্টকুমার, সাপ, ইঁদুর ও শুকের কথা। শেষে একদিন তিনি স্থির করলেন, 'বন্যার পর বিদায় নেবার সময় ওরা প্রত্যেকেই তো বড় বড় প্রতিজ্ঞা করে গেছে। এখনো সেসব কথা মনে রেখেছে কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

প্রথমেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন সাপের গর্তের কাছে। ডাকলেন, "দীঘা-আ—"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দীঘা দ্রুত বেরিয়ে এল। বোধিসত্ত্বের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বললে, "মনে পড়লো বাবা এতকাল পরে ? আপনার পথচেয়ে দিন গুণছিলাম। আপনার ধন এবার আপনি গ্রহণ করে ও-দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দিন। ঐ ওখানে রয়েছে সেই চল্লিশ কোটি মোহর—তুলে নিয়ে যান।"

সাপের কথায় বোধিসত্ত্বের মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"বেশ বাবা, বেশ। তোমার কল্যাণ হোক। কিন্তু এখন তো আমার ধনদৌলতে কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

সেখান থেকে তিনি গেলেন ইঁদুরের কাছে। তার গর্তের কাছে গিয়ে 'মুষিক' বলে ডাক দিতেই চোখের নিমেষে ইঁদুর বেরিয়ে এল। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে হাসিমুখে বললে,—"এসেছেন বাবা এতকাল পরে, অধমকে নিষ্কৃতি দিতে ? ওই দেখুন—ওখানে রয়েছে সেই ধনভাণ্ডার, নিয়ে যান দয়া করে।"

সস্নেহ হাসি হেসে বোধিসত্ত্ব বললেন—"থাক বাবা, থাক। তোমার কথা শুনে বড় সুখী হলাম। কিন্তু ধনভাণ্ডার নেবার জন্যে আমি এখন আসিনি। এসেছি তোমাদের দেখতে। যখন সময় হবে, ও ধন আমি নিয়ে যাব।"

এবার তিনি রওনা হলেন শুকের উদ্দেশে। নির্দিষ্ট গাছতলায় এসে ডাকলেন, 'শু-উ-উ-ক'।

গাছের মাথায় কোন্ পাতাঝোপের আড়ালে শুক বসে ছিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনেই শশব্যস্তে গাছ থেকে নেমে এল। গড় হয়ে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে উৎফুল্লকণ্ঠে বললে—"আপনার পদধূলি পেয়ে ধন্য হলাম বাবা। আদেশ করুন, কি ধান দরকার। যত চাইবেন, আমি তা জ্ঞাতিবন্ধুদের নিয়ে আসমুদ্র-হিমাচল যেখান থেকে হোক অনায়াসে এনে দেব। বলুন বাবা, কি ধান আনবো ?"

বোধিসত্ত্বের চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। শুককে আশিস জানিয়ে বললেন—"থাক বাবা, এখন দরকার নেই। দরকার হলে তোমায় নিশ্চয়ই বলবো।"

শুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন বারাণসীর দিকে। মুখে তাঁর পরিতৃপ্তির হাসি, মনে অনাবিল শান্তি।

সুন্দর ভুবনের সব কিছু আজ সন্ন্যাসী বোধিসত্ত্বের কাছে বড় আনন্দময় লাগছে। ভাবতে ভাবতে চলেছেন তিনি—'পশুদের মাঝে যখন এত মহত্ত্ব, এমন কৃতজ্ঞতা, তখন রাজার অন্তর না-জানি কত বড়!'

বারাণসীতে যখন তিনি পৌঁছলেন, বিষণ্ণ পৃথিবীর বুকে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলো। নগরীর ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। তোরণে তোরণে সান্ত্রীর সতর্ক পাহারা।

সন্ন্যাসী রাজোদ্যানে আশ্রয় নিলেন রাত্রির মতো।

পরদিন।

রাজসন্দর্শনে ধীর মন্থর পদে চলেছেন বোধিসত্ত্ব। হাতে তাঁর ভিক্ষাপাত্র, পরনে গৈরিক বসন—সৌম্যশান্ত সন্ন্যাসী পবিত্রতার প্রতিমূর্তি যেন।

কিছুদূর যেতেই তাঁর গতিরোধ হলো। রাজপথ কাঁপিয়ে এক শোভাযাত্রা আসছে। রাজপুরুষ সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বারাণসীরাজ দুষ্টকুমার সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে নগর-ভ্রমণে বেরিয়েছে। অঙ্গে তার মণিমুক্তাহীরকখচিত রাজোচিত বেশভূষা। কিন্তু চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার ভ্রূকুটি, অবজ্ঞার হাসি। সন্ত্রস্ত পুরবাসীরা রাজপথ ছেড়ে এদিক ওদিক ছুটছে আশ্রয়ের সন্ধানে। চারিদিকে 'সামাল! সামাল!' চিৎকার।

নীরবে বোধিসত্ত্ব একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

দুষ্টকুমার হঠাৎ চমকে উঠলো: পথি পার্শ্বে কে ওই সন্ন্যাসী? এ্যাঁ সেই ভণ্ড শয়তান!

বিজাতীয় রাগে ও ঘৃণায় তার চোখমুখ বীভৎস হয়ে উঠলো। মুখে ফুটে উঠলো কুটিল ক্রূর হাসি—'শয়তান! ভেবেছিস, রাজ-প্রাসাদের আরামে বিলাসে দেহের মেদ বৃদ্ধি করবি! সেদিনের সে অপমানের প্রতিফল আজ তোকে কড়ায় গণ্ডায় পেতে হবে। আমাকে অপমান করার শাস্তি কি, তোকে দিয়েই তা সবাইকে বুঝিয়ে দেব।'

ভয়ঙ্কর কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠলো, "বন্দী কর্ ওই ভণ্ড তপস্বীকে —ওই যে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে! আমাকে ও এককালে বিষম অপমান করেছিল। বন্দী কর্ ওকে! খবরদার! ও যেন আর এক পা-ও এদিকে না আসে। পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ওকে মশানে নিয়ে যা। যাবার পথে

প্রতি চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে সাধ্যমতো চাবুক মারবি। তারপর মশানে নিয়ে ওর মুণ্ডচ্ছেদ করে ধড়টা শূলে চাপিয়ে দিবি।"

শোভাযাত্রার মাঝে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। মন্ত্রী, কোটাল, সিপাহী-সান্ত্রী—সবাই স্তম্ভিত। এ কী সাংঘাতিক নৃশংস আদেশ!

দুষ্টকুমার গর্জন করে উঠলো—"সাবধান! আমার হুকুমের এতটুকু নড়চড় যেন না হয়! তাহলে রক্ষা থাকবে না।"

সবাই শিউরে উঠলো।

বোধিসত্ত্ব নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনভোলা সন্ন্যাসীর খেয়াল নেই কোনদিকে। হয়তো ভাবছিলেন, কিভাবে রাজার দৃষ্টিপথে আসবেন। এমন সময় সিপাহীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর, পিঠমোড়া দিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেললো।

বোধিসত্ত্ব হতভম্ব: এ কী ব্যাপার!

সিপাহীরা গলায় দড়ি বেঁধে টান মারতেই তাঁর চমক ভাঙলো। ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোথাও কোন গুরুতর ভুল হয়েছে। তাই অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন—"বাবা, কেন আমাকে এভাবে লাঞ্ছিত করছো? তোমরা ভুল করছো। আমি তো কোন অপরাধ করিনি!"

সিপাহীদের সর্দার হাতজোড় করে বললে—"ঠাকুর, আমাদের অপরাধ নেবেন না। আমরা নিরুপায়। ভুল করিনি, রাজাদেশ পালন করছি মাত্র।"

"রাজাদেশ! কেন?"

সবিনয়ে সর্দার বললে—"তা জানি নে, প্রভু। তবে শুনলাম, আপনি নাকি আমাদের রাজাকে কবে অপমান করেছিলেন।"

"রাজাকে অপমান করেছিলাম? আমি? ভুল!—তোমাদের রাজা নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।"—বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে বিব্রত বোধিসত্ত্ব বললেন।

সর্দার বললে—"তা বলতে পারবো না, ঠাকুর। তবে মনে হয়, মহারাজ ভুল করেননি, জেনে-শুনেই এ আদেশ দিয়েছেন।"

বোধিসত্ত্ব নির্বাক হয়ে গেলেন। গলার দড়ি ধরে রাজার লোক তাঁকে টেনে নিয়ে চললো হিড়হিড় করে।

বোধিসত্ত্বের চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তাঁর অন্তর তোলপাড় করছে: এ কী জগতের চেহারা, প্রভু? পশুর মধ্যে দেবতা, মানুষের মধ্যে শয়তান!

নীরবে চললেন তিনি মাথা হেঁট করে। ধীরে ধীরে মন তাঁর শান্ত হয়ে এল, মুখে আবার ফুটে উঠলো বৈরাগ্যের সেই প্রশান্ত হাসি।

দেখতে দেখতে এ সংবাদ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো নগরময়। বোধিসত্ত্বকে নিয়ে রাজার ভৃত্য যত অগ্রসর হয়, ততই বাড়ে নগরবাসী

কৌতূহলী জনতার সংখ্যা। তাদের মধ্যে বিস্ময়ের গুঞ্জন: এমন কি অপরাধ করেছেন সন্ন্যাসী, যেজন্যে এত বড় দণ্ড তাঁকে পেতে হলো ?

প্রথম চৌমাথায় এসে রাজ-অনুচররা বোধিসত্ত্বকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করালে। তারপর শুরু করলে কশাঘাত—অবিশ্রান্ত, বৃষ্টিধারার মতো।

কিন্তু সন্ন্যাসী নির্বাক অচঞ্চল। যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ নেই, মুখে প্রশান্ত মৃদু হাসি।

অভিভূত জনতার মাঝে গুঞ্জন থেমে যায়। অনুচররাও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা নিরুপায়। নতুন রাজার আদেশ—ন্যায় হোক অন্যায় হোক নির্বিচারে পালন করতে হবে। অমান্যকারীর শাস্তি কি ভয়ঙ্কর, তারা জানে।

হঠাৎ জনতা সচকিত উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। শুনলো. কণ্ঠে সন্ন্যাসী আবৃত্তি করছেন:

"অমানিশার অন্ধকার, নদীর বুকে বান,
কাঠের উপর আর্ত মানুষ, দেখে কাঁদে প্রাণ।
লোকে বলে, মানুষ ফেলে কাঠ তুলে নাও ঘরে.
এ যে কত দারুণ সত্য, বুঝছি অনেক পরে।
বাঁচাও যদি মানুষকে, সে মহা শত্রু হবে,
কাঠের গুঁড়ি তুললে ঘরে বহু কাজ পাবে॥"

অদ্ভুত শ্লোক! কী এর অর্থ? নগর-জনতা, রাজার ভৃত্য—সবাই বিস্মিত।

সন্ন্যাসীকে নিয়ে ভৃত্যেরা আবার অগ্রসর হয় শ্মশানের দিকে। আর পিছনে অনুসরণ করে বিশাল জনসমুদ্র। উদ্বেলিত নগর যেন ভেঙে পড়েছে।

একদিকে রাজার ভয়ঙ্কর আদেশ, অপর দিকে সন্ন্যাসীর হাস্যময় প্রশান্ত মুখচ্ছবি, সর্বোপরি তাঁর অপরূপ কণ্ঠের রহস্যময় আবৃত্তি—সব মিলে জনতাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। অনাচারী নিষ্ঠুর নতুন রাজার কথায় তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। সন্ন্যাসীর পিছনে চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

আবার চৌমাথা। অনুচররা আগের মতোই আবার বোধিসত্ত্বকে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করালে। তারপর শুরু হলো আবার সেই নির্মম কশাঘাত।

সন্ন্যাসীর গলায় দড়ির বন্ধন, দুই হাত পিছনে বাঁধা। তাঁর দেহের বসন ছিন্নভিন্ন, মাথার জটাজুট আলুথালু। বুকে পিঠে মাথায় শিলাবৃষ্টির মতো কশাঘাত পড়ছে। সর্বাঙ্গে রক্তের স্রোত বইছে। তবু অবিচল সন্ন্যাসী। চোখে মুখে যন্ত্রণার আভাস পর্যন্ত নেই।

হঠাৎ জনসমুদ্র আবার সচকিত হয়ে উঠলো। সন্ন্যাসী আবার সেই কবিতা আবৃত্তি করছেন।

বিচলিত জনতা আর যেন সহ্য করতে পারে না। তারা দুলছে, ফুঁসছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। সন্ন্যাসীর আবৃত্তি শেষ হতেই তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন বৃদ্ধ পুরবাসী এগিয়ে এলেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন,—"মহাভাগ, আপনার এই অমানুষিক লাঞ্ছনা আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে বলুন—আমাদের রাজার কাছে এমন কি গুরুতর অপরাধ আপনি করেছিলেন, যার জন্যে এই নিদারুণ শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হচ্ছে। আপনার ওই শ্লোকের মর্মও আমরা বুঝতে পারছি না।"

বোধিসত্ত্ব নিরুত্তর। আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে কি যেন ভাবছেন তিনি। সবিনয়ে পুরবাসীরা আবার অনুরোধ করে,—"বলুন প্রভু, অনুগ্রহ করে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"

তবুও নিরুত্তর বোধিসত্ত্ব। বিপুল জনসমুদ্র তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদেরও চোখেমুখে সেই একই মিনতি. সেই একই জিজ্ঞাসা।

শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্বকে বলতে হলো। শান্ত কণ্ঠে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে শেষে তিনি বললেন,—"তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, প্রবাদ বাক্য সে সময় গ্রাহ্য করিনি বলেই কি এই শাস্তি আজ আমায় পেতে হলো?"

নগর-জনতা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল সে-নিষ্ঠুর বিবরণ। সন্ন্যাসী চুপ করতেই সমুদ্রে যেন ঝড় উঠলো। নতুন রাজার কুশাসন ও অত্যাচারে এমনিতেই তাদের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল, সন্ন্যাসীর কথায় সেখানে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সর্বশ্রেণীর সেই জনসমুদ্র ক্ষোভে ও আক্রোশে গর্জন করে উঠলো,—"নিপাত করো! দুর্জনকে নিপাত করো। ও রাজা থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে।"

বলতে বলতে ছুটলো জনতা। তীর, শক্তি, পাথর, মুদ্গর—যে যা পেল, তাই নিয়ে ছুটলো হাজার হাজার মানুষ। রাজার সিপাহীশাস্ত্রী সভাসদ,—কোথায় কে ছিটকে পড়লো প্রাণের দায়ে। দুষ্টকুমার একা। প্রাণ দিল জনতার হাতে।

বোধিসত্ত্ব তখন বিচিত্র জীবন-রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে বারাণসী ছেড়ে ফিরে চলেছেন বনস্থলীর কুটিরে—আপন সাধনক্ষেত্রে। নগরীর সিংহ-দ্বারের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় তাঁর কানে এল জনতার বিপুল জয়ধ্বনি। দেখতে দেখতে পুরবাসী জনতা আবার এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো, সবিনয়ে প্রার্থনা জানালে—"প্রভু, রাজাহীন রাজ্য চলে না, তাই বারাণসীর রাজমুকুট আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।"

বোধিসত্ত্ব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সে কি! বিব্রত কণ্ঠে বললেন,—"না, না, এ কী বলছো তোমরা? এ হতে পারে না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আমি। রাজসিকতায় আমার মোহ নেই, রাজপাটেও লোভ নেই। রাজ্য-শাসনের সময়ই বা কই আমার? তাছাড়া এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাও নেই কিছু। তোমারা অন্য কাউকে নির্বাচন করো।"

কিন্তু জনতা তাঁর কোন যুক্তিতর্কই শুনলো না, নগর-প্রধানেরা তাঁর পদতলে বসে পড়লো।

শেষ পর্যন্ত নাগরিকদেরই জয় হলো। বোধিসত্ত্ব গ্রহণ করলেন বারাণসীর রাজপাট।

সিংহাসনে বসে তাঁর মনে পড়লো সাপ, ইঁদুর ও শুকের কথা। নিজে গিয়ে তাদের তিনি নিয়ে এলেন, আর নিয়ে এলেন সেই বিপুল ধনভাণ্ডার। সাপের বসবাসের জন্যে তিনি তৈরি করিয়ে দিলেন এক সোনার নল, ইঁদুরের জন্যে এক স্ফটিক-গুহা আর শুকের জন্যে এক সোনার খাঁচা।

তারপর?

তার পর থেকে রাজ্যময় শুধু হাসি আনন্দ উৎসব।

রাজার একশো ছেলে। তাঁদের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ছিলেন সকলের ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কি হয়, বিদ্যাবুদ্ধি আর চরিত্রগুণে তিনি ছিলেন সকলের বড়।

রাজবাড়ীতে সাধুসন্ন্যাসীদের অবারিত দ্বার—সত্যিকারের যাঁরা জ্ঞানীগুণী সাধু ও সজ্জন, তাঁদের জন্যে রাজভবনে ছিল আহারাদির রাজসিক ব্যবস্থা। আর এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব। এ দায়িত্ব তাঁর উপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি, তিনি স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিচালনার গুণে সাধুসন্ন্যাসীদের কোন অসুবিধা ছিল না, তাঁদের পরিচর্যা ও আদর-আপ্যায়নে এতটুকু ত্রুটি ঘটতো না। ফলে, বোধিসত্ত্বকে তাঁরা প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।

বেশ শান্তিতেই বোধিসত্ত্বের দিন কাটছিল—কোন অভাব ছিল না, মনে কোন অতৃপ্তি বা অভাব-বোধও ছিল না।

কিন্তু কিছুদিন থেকে কি হয়েছে, বোধিসত্ত্ব নিজেই বুঝে পান না—মাঝে মাঝে ছোট্ট এক টুকরো চিন্তা এসে তাঁকে আনমনা করে তোলে, ভবিষ্যতের এক অন্ধকার ছবি মনের মাঝে বারে বারে উঁকিঝুঁকি মারে, কে যেন অন্তর থেকে বলে—বোধিসত্ত্ব! তুমি রাজকুমার হলে কি হবে, বড় ভাইয়েরা থাকতে এখানকার রাজপাট তোমার কপালে জুটবে না। ভেবে দেখ, বোধিসত্ত্ব!

কি ভাববেন বোধিসত্ত্ব? এ তো তাঁর অজানা নয়। তাই তিনি ছটফট করতে থাকেন এ দুষ্ট চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে। কিন্তু যত দিন যায়, ততই মনের দিগন্তে ছোট এক খণ্ড কালো মেঘ একটু একটু করে ডানা মেলতে থাকে। পরিণাম ভেবে বোধিসত্ত্ব শিউরে ওঠেন।

শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে একদিন তিনি ঠিক করলেন—'সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে আমার জীবনের পথরেখা। এভাবে চললে কারো মঙ্গল নেই।'

সেদিন আহারাদির পর সন্ন্যাসীরা বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় বোধিসত্ত্ব গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে একপাশে বসলেন, একথা-সেকথার পর সলজ্জ কণ্ঠে

ধীরে ধীরে খুলে বললেন তাঁর গোপন চিন্তার কথা, শেষে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, এ পাপ চিন্তার হাত থেকে কি আমার নিস্তার নেই ? অন্যায়ভাবে কোন রাজপাট আমি চাই না। দয়া করে বলুন, আমার ভাগ্যে কি রাজ্যলাভ আছে ?"

সন্ন্যাসীরা নির্নিমেষ চোখে বোধিসত্ত্বের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কি দেখলেন কে জানে। শেষে একজন বললেন, "আছে, কিন্তু এ নগরে নয়। এ রাজ্যের সিংহাসন তুমি পাবে না। এখান থেকে দুই হাজার যোজন দূরে গান্ধার দেশ, সেখানে তক্ষশিলা নামে এক নগরী আছে। তক্ষশিলায় যদি যেতে পার, তাহলে আজ থেকে সাত দিনের দিন সেখানকার রাজ্য পাবে তুমি। কিন্তু—"

সন্ন্যাসী থেমে যেতেই বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কি, প্রভু ? দয়া করে সব খুলে বলুন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "তক্ষশিলায় যাবার দুটো পথ আছে ঃ একটা সোজা পথ, অন্যটা ঘুরপথ। সোজা পথে গেলে পথে পড়ে এক মহা বন। গহন গভীর সে মহারণ্যে নানা রকম ভয়ংকর বিপদ-আপদের ভয় আছে। বনপথ ছেড়ে অবশ্য ঘুরপথেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে একশো যোজন পথ বেশি পড়ে। সে পথে গেলে সাত দিনের মধ্যে তক্ষশিলায় তুমি পেঁাছতে পারবে না।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, "সে মহারণ্যে কিসের ভয়, প্রভু ?"

"যক্ষের। নরমাংসাশী মায়াবী যক্ষেরা সেখানে বাস করে। কোন পথিক আসছে দেখলে, যক্ষিণীরা মায়াবলে পথের দুধারে মাঝে মাঝে পান্থশালা তৈরি করে রাখে—পান্থশালা তো নয়, যেন মণিমুক্তাখচিত অপরূপ সব রাজপুরী। পুরীর ঘরে ঘরে স্বর্ণতারকাখচিত ঝলমলে চন্দ্রাতপ শোভা পায়, চন্দ্রাতপের নিচে থাকে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিছানো। আর যক্ষিণীরা মোহিনী রূপ ধরে পুরীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে, 'পথিক, তুমি কি খুব ক্লান্ত পিপাসার্ত হয়েছ ? তা, অত কষ্ট করবার কি দরকার ? এসো বন্ধু, ঘরে এসে একটু বসে যাও। বিশ্রাম করে আবার পথ চলো।' তাদের সেই মোহিনী রূপ আর মধু-কণ্ঠের আহ্বান এড়ানো বড় কঠিন। সব কিছু ভুলে হিতাহিত-জ্ঞানহারা মুগ্ধ পথিক তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। তারপরে যা ঘটে, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যক্ষিণীরা তাকে খেয়ে ফেলে।"

সাগ্রহে বোধিসত্ত্ব বললেন, "কিন্তু তাদের মায়ায় যদি আমি না ভুলি—"

বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "যক্ষিণীদের আরো একটা ক্ষমতা আছে। যে লোক যা ভালবাসে, তারা তাই সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় মায়াবলে বশীভূত করার ক্ষমতা আছে তাদের। কেউ হয়তো রূপের কাঙাল—রূপ ভালবাসে, যক্ষিণীরা তাকে রূপের ছটায় মোহিত করে।

আবার কেউ হয়তো তত রূপের পাগল নয়, সঙ্গীত খুব ভালবাসে, যক্ষিণীরা তাকে অনবদ্য সঙ্গীতের মূর্ছনায় বশীভূত করে। এমনি করে যে ভোজন-বিলাসী তাকে অমৃতের মতো খাদ্য দিয়ে, যে শয্যাবিলাসী তাকে দেবদুর্লভ শয্যা দিয়ে, যে গন্ধবিলাসী তাকে অলৌকিক সুগন্ধ দিয়ে তারা মোহিত করে।"

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বললেন,—"সুতরাং বাবা, বুঝতে পারছ, বিপদ কত গুরুতর। তবে মনকে বশে রাখার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, আর যদি সংকল্প করো যে, কিছুতেই ওদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাবে না, তাহলে অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নেই, সাত দিনের দিন তক্ষশিলার সিংহাসন নিশ্চয়ই তুমি লাভ করবে। মনে রেখো, কেউ যদি নিজে থেকে ধরা না দেয়, তাহলে যক্ষিণীরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারে না।"

সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে বোধিসত্ত্ব উঠে দাঁড়ালেন, যুক্তকরে বললেন, "প্রভু, আশীর্বাদ করুন, সমস্ত বিপদ পার হয়ে নির্বিঘ্নে যেন তক্ষশিলায় পৌঁছতে পারি। যে উপদেশ আপনারা দিলেন, তারপরে সহস্র যক্ষিণীর সহস্র ছলচাতুরীও আমাকে আর প্রলুব্ধ করতে পারবে না।"

সেখান থেকে তিনি বাবা-মা ও দাদাদের কাছে গিয়ে সব কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন নিজের অনুচরদের। তাদের কাছেও তিনি কোন কথা গোপন না করে শেষে বললেন, "সুতরাং আমি একাই যাব তক্ষশিলায়, তোমরা এখানে থাকবে। রাজ্য পেলে তোমাদের নিয়ে যাব।"

সবাই রাজী হলো বটে, কিন্তু পাঁচজন ঘনিষ্ঠ সহচর কিছুতেই শুনলে না; বললে, "আমরা যাব আপনার সঙ্গে।"

বোধিসত্ত্ব তাদের কত বুঝালেন, কত বিপদ-আপদের ভয় দেখালেন, কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা; বললে, "আমাদেরও তো প্রাণের মায়া আছে। যক্ষিণীদের বশীভূত হলে মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন কেন সে কাজ করবো? স্বেচ্ছায় অকারণে কেউ কি মরতে চায়?"

শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্বকে রাজী হতে হলো; বললেন, "বেশ, তাই হোক। কিন্তু সব সময় খুব সতর্ক থেকো, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেও না যক্ষিণীদের কথা। কোন বিপদ ঘটিও না কিন্তু।"

তাঁরা রওনা হলেন।

দিনে রাতে তাঁদের বিশ্রাম অতি সামান্য। পাঁচ দিনের দিন শেষ রাতে দেখা গেল সেই মহারণ্য।

সত্যিই ভয়াবহ সে মহা বন! নিস্তব্ধ গম্ভীর। যুগযুগান্তের বনস্পতির দল গায়ে গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লতায় পাতায় দুর্ভেদ্য

সে মহারণ্যের দিকে তাকালে আতঙ্কে বুক কাঁপে। দিনের বেলায়ও সেখানে গোধূলির অন্ধকার।

অনুচরদের বারবার সতর্ক করে বোধিসত্ত্ব বনে ঢুকলেন। কিছুদূর যেতেই সচকিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। দেখেন—পথের পাশে অপরূপ সব রাজপুরী, যেন স্বর্গের সুষমা দিয়ে তৈরী। পুরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপ্সরার মতো রূপসী নারীর দল। মধুঢালা কণ্ঠে তারা ওঁদের ডাকছে—সন্ন্যাসীরা ঠিক যেমনটি বলেছিলেন।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বোধিসত্ত্ব ত্বরিত পদে হাঁটছিলেন, হঠাৎ পিছনে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন: অনুচরদের একজন অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি ডাক দিলেন, "কি হলো হে দেবদত্ত, পিছিয়ে পড়ছো কেন? তাড়াতাড়ি এসো।"

দূর থেকে লোকটি উত্তর দিল, "পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, কুমার। আপনারা এগোন। পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নিয়েই আমি আসছি।"

সর্বনাশ! বোধিসত্ত্ব চেঁচিয়ে উঠলেন, "না না, কখ্খনো যেও না পান্থশালায়। শোন, শোন, একবার শোন আমার কথা। মনে করে দেখো, কি বলেছিলাম। ওরা যক্ষিণী, ওদের রূপে মুগ্ধ হয়ো না। পান্থশালায় ঢুকলে তোমার রক্ষা থাকবে না।"

কিন্তু বৃথাই আকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব। লোকটা ততক্ষণে পান্থশালার দিকে পা বাড়িয়েছে—যক্ষিণীরা তাকে বারবার ডাকছে সুধাকণ্ঠে। সে বললে, "যা-ই বলুন না কুমার, আমি আর হাঁটতে পারছি না।" বলতে বলতে পান্থশালার ভিতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

অশ্রুভারাক্রান্ত মনে বোধিসত্ত্ব এগিয়ে চললেন বাকি অনুচরদের নিয়ে। লোকটির কপালে যা ঘটবার তাই ঘটলো। কাজ শেষ করে যক্ষিণীরা আবার ছুটলো সামনের দিকে।

কিছুদূর যেতেই বোধিসত্ত্বের কানে এল এক মধুর সঙ্গীত। দেখেন, সামনে আবার এক পান্থশালা!

পান্থশালার ঘরে ঘরে অপরূপ সঙ্গীতের ঝঙ্কার—বনময় তা ছড়িয়ে পড়ছে। সারা বন যেন জীবন্ত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সুরের মূর্ছনায় অদ্ভুত কী এক মাদকতা—মন যেন আবেশে ঝিমিয়ে আসে!

কানে আঙুল দিয়ে বোধিসত্ত্ব ছুটতে থাকেন আর বারবার তাকান পিছনের দিকে। হঠাৎ এক সময় আড়ষ্টের মতো তিনি থেমে গেলেন: আবার একজন অনুচর পিছিয়ে পড়ছে!

হায় হায়! আর রক্ষা নেই! বোধিসত্ত্ব চীৎকার করে উঠলেন, অনুচরটিকে ডাকতে লাগলেন বারবার, কত চেষ্টা করলেন তাকে নিরস্ত

করতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! তারও পরিণতি ঘটলো প্রথমজনের মতো।

এমনি করে বোধিসত্ত্বের অন্য তিনজন অনুচরেরও জীবনের পরিসমাপ্তি হলো প্রথম দুইজনের মতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল গন্ধবিলাসী, একজন ভোজনবিলাসী, বাকিজন শয্যাবিলাসী।

বোধিসত্ত্ব এখন একা—প্রিয় অনুচরদের শোকে মন অভিভূত। অশ্রুসজল চোখে তিনি পথ চললেন।

যক্ষিণীদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই বুঝেছিল, এ লোককে বশীভূত করা তাদের সাধ্যের বাইরে। তারা নিরস্ত হলো। ওই একজনই কেবল বোধিসত্ত্বের পিছু লেগে রইল। মনে মনে সে বললে, "যত চরিত্রবানই তুমি হও না কেন, যত মনের জোরই তোমার থাক, তোমাকে শেষ না করে আমি ফিরছি না।"

বন ক্রমেই পাতলা হয়ে আসে। পথের পাশে কাজ করছিল কয়েকজন বনরক্ষক। অবাক হয়ে তারা দেখলে, অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী চলেছে, আর তাকে পিছনে ফেলে অনেক আগে ছুটে চলেছে এক সুন্দর যুবা। তরুণীকে তারা জিজ্ঞেস করলে, "ভদ্রে, আপনার আগে আগে ঐ যে ব্যক্তিটি দ্রুতপদে চলেছেন, উনি আপনার কে হন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণী বললে, "স্বামী।"

স্বামী! বনচরেরা এবার রুখে উঠলো বোধিসত্ত্বের উপর, "ও মশাই, শুনুন তো একটু! আপনাকে দেখে তো সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে, অথচ এ কী রকম আক্কেল আপনার? এমন স্ত্রী, যার রূপে বন আলো, তাঁকে পিছনে ফেলে আপনি কিনা ছুটছেন এভাবে! আপনার জন্যে উনি সব কিছু ত্যাগ করে এসেছেন, পথের কষ্টও গ্রাহ্য করেননি, আর তার প্রতিদানে উনি যাতে একটু স্বচ্ছন্দে ধীরেসুস্থে চলতে পারেন, সেদিকেও আপনার একটু খেয়াল নেই? আশ্চর্য!"

আরও জোরে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মিথ্যে কথা। ও আমার স্ত্রী নয়—যক্ষিণী। ওরা আমার পাঁচজন সঙ্গীকে খেয়েছে, এখন আমাকে খাওয়ার জন্যে পিছু নিয়েছে।"

যক্ষিণী কেঁদে উঠলো। কপাল চাপড়ে বললে, "হায় হায়! এই কি পুরুষ জাতের ব্যবহার? রাগ হলে নিজের স্ত্রীর নামেও কলঙ্ক রটাতে লজ্জা পায় না!"

হতভম্ব বনচরেরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বন শেষ হয়ে আসছিল। যক্ষিণী দেখে, কাছে-পিঠে কোন লোকজন

নজরে পড়ে না। চোখের নিমেষে তার কোলে এসে হাজির হলো এক দুগ্ধপোষ্য শিশু—দেখলে মনে হয়, এই মাত্র জন্মেছে। শিশুর কান্নায় বনস্থলী সচকিত হয়ে উঠলো।

চলতে চলতে দু-চার জন পথিকের সঙ্গে বোধিসত্ত্বের দেখা হয়। তারাও সচকিত হয়ে ওঠে। বনরক্ষকদের মতো তারাও রুষ্ট হয় বোধিসত্ত্বের উপর। আগের মতোই বোধিসত্ত্ব তাদের কথার জবাব দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যক্ষিণী চোখের জল ছেড়ে দেয়, বুক চাপড়ে বলে, "হায় হায়! আমার মতো অভাগিনী আর কে আছে! এমন লোকের সঙ্গে বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিলেন, যে নিজের ছেলের দিকে তাকায় না, স্ত্রীর নামে কুৎসা রটাতেও যার লজ্জা নেই!"

পথিকের দল বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে!

দূরে দেখা যায় তক্ষশিলা। যক্ষিণী দেখে, তার ছলচাতুরী সবই ব্যর্থ হলো। চোখের পলকে কোথায় মিলিয়ে গেল তার কোলের ছেলে। আগের মতোই একলা আবার সে অনুসরণ করে চললো বোধিসত্ত্বকে।

তক্ষশিলা নগরীর সিংহদ্বারের কাছে এক পান্থশালায় বোধিসত্ত্ব আশ্রয় নিলেন। যক্ষিণী খুব খুশী। যাক! এইবার সে লোকটাকে কাছে পাবে; তারপর সুযোগ বুঝে রাতেই শেষ করবে তাকে।

ভাবতে ভাবতে যক্ষিণী যেমন ভিতরে ঢুকতে যাবে, অমনি ছিটকে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তার উপরে। কোথায় মিলিয়ে গেল তার হাসি-হাসি ভাব! এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। বুঝলো, লোকটার কাছে ঘেঁষা তো দূরের কথা, তার চরিত্রের জোরে পান্থশালায় ঢোকারও তার সাধ্য নেই।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মুখ কালো করে সে গিয়ে বসলো পান্থশালার দুয়ারে। আর গালে হাত দিয়ে বসে নিজের মনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলো মাকড়সার মতো।

তখন অপরাহ্ণবেলা। সূর্যদেব বিদায় নেবার আগে তাঁর সোনালী তুলির স্পর্শে সব কিছু রাঙিয়ে দিচ্ছেন শেষবারের মতো।

তক্ষশিলার রাজা হাতির পিঠে চলেছেন রাজোদ্যানে—সঙ্গে লোকজন। তাঁরও মনে হয়তো লেগেছিল সেই তুলির স্পর্শ। পান্থশালার দুয়ারে নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন: কে ও? কে ওই অনিন্দ্যসুন্দরী নারী? মানুষীর এত রূপ হয় কখনো? না, মানবীর রূপ ধরে স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে পৃথিবীতে?

রাজা মুগ্ধ অভিভূত—চোখ ফেরাতে পারেন না।

অবাক হয়ে তারা দেখলে, অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী চলেছে, আর তাকে পিছনে ফেলে অনেক আগে ছুটে চলেছে এক সুন্দর যুবা। [পৃষ্ঠা ১৩১]

পাশের একজন অনুচরকে তিনি হুকুম দিলেন, "যাও তো তাড়াতাড়ি, গিয়ে ওই রমণীকে জিজ্ঞেস করে এসো—ওর স্বামী আছে কিনা, আর থাকলে কোথায় আছে।"

অনুচর গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই যক্ষিণী ঘরের ভিতরে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে, উনি আমার স্বামী।"

ভিতর থেকে বোধিসত্ত্ব প্রতিবাদ করলেন, "কখ্খনো না। ও আমার স্ত্রী নয়, মানুষীও নয়—ও যক্ষিণী। আমার পাঁচজন সঙ্গীকে ওরা খেয়েছে, এখন আমাকে খাওয়ার জন্যে পিছু নিয়েছে।"

বোধিসত্ত্বের কথা শেষ না হতেই যক্ষিণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হায় হায়! আমি এমনি অভাগী যে, দেবতার মতো স্বামী আমার, কোথায় আমাকে রক্ষা করবেন, তা নয় উলটে কিনা যা মুখে আসছে, তাই বলছেন। এত বড় কলঙ্কের বোঝা নিয়ে আমি কোথায় যাবো? হায় হায়, আমার কি হবে গো—"

যক্ষিণীর সে কান্না যে শুনলো, সে-ই বিচলিত হলো। বোধিসত্ত্বের প্রতি ধিক্কারে পান্থশালা মুখর হয়ে উঠলো। মুখে মুখে সে ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো নগরময়। নগরের ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, সর্বত্র চললে বোধিসত্ত্বের নিন্দামন্দ আর তীক্ষ্ন সমালোচনা।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব অবিচল, যদিও অন্তর ক্ষুব্ধ কিছুটা; কারণ এরকম বিড়ম্বনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এত দুঃখকষ্টের পরে এ কি কলঙ্ক-অপমানের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপলো?

এদিকে রাজা কিন্তু অনুচরের মুখে সব শুনে আনন্দে আত্মহারা। মেয়েটির স্বামী একটি উন্মাদ অপদার্থ—এ কি তাঁর পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা! তাড়াতাড়ি হাতি থেকে নেমে তিনি যক্ষিণীর কাছে গিয়ে তার হাত ধরলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ভদ্রে, কেঁদো না। এসো আমার সঙ্গে। আমার প্রধানা মহিষী হবে তুমি—পরম আদরে তোমায় মাথায় করে রাখবো। অমন মূর্খ অসৎ লোকের সঙ্গে ঘুরে কি লাভ?"

চোখের জল মুছতে মুছতে যক্ষিণী রাজহস্তীর পিঠে রাজার পাশে গিয়ে বসলো। লাঞ্ছিত বোধিসত্ত্ব নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

রাত্রিবেলা। প্রাসাদের সিংহদ্বারে সান্ত্রী জাগছে, দ্বারে দ্বারে জাগছে প্রহরী। রাজার শয়নাগারে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে যক্ষিণী। এমন সময় চঞ্চল পদে রাজা ঘরে ঢুকলেন।

রাজাকে দেখেই যক্ষিণী পাশ ফিরে শুলো। পরক্ষণেই রাজার কানে এল তার কান্না—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে। রাজা হকচকিয়ে গেলেন: কি ব্যাপার! হলো কি?

তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন—কি করবেন, ভেবে পান না। কান্নার হেতু জানবার জন্যে যত তিনি নতুন মহিষীর হাতে পায়ে ধরেন, অনুনয়-বিনয় করেন, ততই কান্না তার বেড়ে যায়। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে বললে, "মহারাজ, আপনার আরো অনেক মহিষী আছে। একসঙ্গে থাকতে গেলে তাদের সঙ্গে আমার যে সময় সময় কিছু কথা কাটাকাটি তর্কাতর্কি হবে না এমন নয়। সে সময় তারা রেগে গিয়ে যদি বলে, 'তোকে তো রাজা পথে কুড়িয়ে পেয়েছেন; তোর বাবা-মা জ্ঞাতি-গোত্রের খবর কেউ জানে না—তুই অজ্ঞাত-কুলশীলা,' তখন আমি কি করবো? লজ্জা রাখবার আমার যে ঠাঁই থাকবে না, মহারাজ!"

রাজা বসেছিলেন, উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, "বটে! এত বড় স্পর্ধা! কালই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি, যে তোমাকে এসব কথা বলবে, তার গর্দান যাবে।"

শুকনো হাসি হেসে যক্ষিণী বললে, "তা হয় না, মহারাজ। সবচেয়ে ভাল হয়, রাজ্যের সব ক্ষমতা যদি আমার হাতে তুলে দেন। সবার উপরে যদি আমার প্রভুত্ব থাকে, তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হই. এমন কথা কেউ মুখেও আনতে সাহস করবে না।"

ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ কণ্ঠে রাজা বললেন, "তা তো হয় না, মহিষী! তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই; কিন্তু তুমি হয়তো জানো না. রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর আমার অধিকার নেই। একমাত্র যারা রাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী, তাদেরই শুধু আমি শাস্তি দিতে পারি। আমি রাজা বটে, কিন্তু প্রজাদের মতামতের উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়।"

দরদমাখা কণ্ঠে যক্ষিণী বললে, "আহা! তা তো জানতাম না! বেশ, তাই যদি হয়, রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর উপরে প্রভুত্ব যদি না দিতে পারেন, তাহলে রাজ-অন্তঃপুরের উপর, প্রাসাদের সবার উপর আমায় কর্তৃত্ব দিন, তাহলে ওদের অন্ততঃ আমি বশে রাখতে পারবো।"

রাজা তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যক্ষিণীর মোহিনী রূপে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। তাই সোৎসাহে বললেন, "বেশ বেশ, তাই হোক। প্রাসাদের সকলের উপরে তোমায় আধিপত্য দিলাম।"

'বড় খুশি হলাম' বলে যক্ষিণী হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাজার বুকও যেন কেঁপে উঠলো কি এক অজানা শঙ্কায়।

নিশুতি গভীর রাত। পৃথিবী অন্ধকার। সুপ্তিমগ্ন রাজপুরী, সুপ্ত নগরী তক্ষশিলা। প্রাসাদের সিংহদ্বারে সান্ত্রী ঘুমায়, দ্বারে দ্বারে প্রহরী অচেতন। প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ যেন কালঘুম নেমেছে।

নিকষকালো অন্ধকারের স্রোত যেন পাক খেয়ে ফিরছে প্রাসাদ জুড়ে। এমন সময়—ও কী! অন্ধকারের মতো কালো ভীষণদর্শন কারা দলে দলে এগিয়ে এল প্রাসাদের সিংহদ্বারে! সবার আগে আগে প্রাসাদে ঢুকলো সেই যক্ষিণী—এখন সে বিকটদর্শনা ভয়ংকরী। বিকট হেসে সে গিয়ে ধরলো রাজাকে।

তারপর!—

মানুষ তো দূরের কথা, প্রাসাদের একটা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত নিস্তার পেল না যক্ষ-যক্ষিণীদের কবল থেকে। সব শেষ করে যেমন নিঃশব্দে তারা এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে শেষরাতে আবার ফিরে গেল নিজ রাজ্যে, সেই মহারণ্যে।

পরদিন। কালরাত্রির অবসানে উষার আলোয় পৃথিবী জেগে উঠলো। কিন্তু রাজভবন জাগলো না। বেলা বাড়লো। রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ তবু। তক্ষশিলা বিস্মিত। কি হলো? সিংহদ্বারে কেন উষার আগমনী গান নেই, পুরোহিতের মাঙ্গলিক পাঠ নেই, সান্ত্রীদের হাঁকই বা বন্ধ কেন? এ কী অঘটন!

মন্ত্রী এলেন, কোটাল এলেন, সেনাধ্যক্ষ এলেন, সভাসদ্‌রাও এলেন, এলেন জ্ঞানী-গুণী বয়োবৃদ্ধ সব পুরবাসী। তক্ষশিলা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রাসাদের সিংহদ্বারে। তারপর কত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি। কিন্তু নিস্তব্ধ রাজপুরী—মৃতের মতো নিষ্প্রাণ।

শেষে নিরুপায় হয়ে নাগরিকেরা খন্তা, কুড়ুল এনে ভেঙে ফেললো সিংহদ্বার। ভিতরে পা দিতেই সবাই আতঙ্কে যেন পাথর হয়ে গেল। জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। চারিদিকে হাড়গোড় ছড়ানো, জমাট রক্ত চাপ বেঁধে আছে এখানে-ওখানে। রাজা-রানী, লোকজন তো দূরের কথা, একটা প্রাণীও কোথাও নজরে পড়ে না। রাজপুরী মহাশ্মশান।

সবাই হাহাকার করে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, "পান্থশালার সেই আগন্তুক বলেছিলেন, স্ত্রীলোকটি মানুষী নয়—যক্ষিণী। তাঁর কথা যে কত সত্য, তা রাজপুরীর বাসিন্দারা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল। যক্ষিণীর রূপে ও মধুমাখা কথায় রাজার মতো আমরাও এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আগন্তুকের কথায় কেউ কান দেইনি, রাজাও দেন নি। উলটে তাঁকে ধিক্কার-বিদ্রূপে জর্জরিত করেছি। যক্ষিণীকে রাজা পাটরানী করেছিলেন। সে নিশ্চয়ই অন্য যক্ষ-যক্ষিণীদের এনে রাতারাতি সবাইকে উদরস্থ করে চলে গেছে।"

নীরবে সবাই সায় দিল মন্ত্রীর কথায়। কিন্তু এখন কি করা যায়? এভাবে বসে শোক করলে তো কেউ আর ফিরে আসবে না!

রাজভবন তারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো। ঘরদোর নতুন করে সাজালো। সুগন্ধ লেপে দিল সর্বত্র। ধূপধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধে, ফুলের সাজ পরে রাজপুরী আবার হেসে উঠলো।

সবই হলো বটে, কিন্তু রাজা কই? রাজা বিনা তো রাজ্য চলে না! কে রাজা হবে?

সভা বসলো নাগরিকদের। চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধ মন্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার মতে পান্থশালার সেই আগন্তুকই তক্ষশিলার রাজা হবার যোগ্য। তাঁর মতো জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবান পুরুষ আর কে আছে? অপ্সরার চেয়েও রূপসী নারী পিছনে পিছনে আসা সত্ত্বেও যিনি একবার তার দিকে ফিরেও তাকাননি, শত প্রলোভন-অপমানেও যিনি অবিচল থেকেছেন, তিনি শুধু জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবানই নন; আমার ধারণা, জ্ঞানে কর্মে ও মহত্ত্বেও তিনি সিংহাসনের যোগ্যতম অধিকারী।"

মন্ত্রীর কথায় সবাই জয়ধ্বনি করে উঠলো, কারণ তাদেরই অন্তরের কথার তিনি প্রতিধ্বনি করেছেন।

পান্থশালার ঘরে বোধিসত্ত্ব তখন নীরবে নতমুখে বসে আছেন, পাশে কোষমুক্ত তরবারি। রাজপুরীর ভয়াবহ ঘটনা তিনিও শুনেছেন। মন তাঁর বিক্ষুব্ধঃ হায়! কেউ শুনলো না তাঁর কথা! কেউ কান দিল না তাঁর সাবধান-বাণীতে! তাহলে তো এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই ঘটতো না!

বসে বসে এইসব ভাবছেন বোধিসত্ত্ব, এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি।

অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, কাতারে কাতারে তক্ষশিলার মানুষ আসছে পান্থশালার দিকে। সঙ্গীতবাদ্যমুখর বিশাল শোভাযাত্রার পুরোভাগে আসছে সুসজ্জিত রাজহস্তী। রাজহস্তীর পিছনে আসছেন রাজমন্ত্রী, কোটাল, সেনাধ্যক্ষ, সভাসদ্‌বর্গ, সৈন্যসামন্ত আর তক্ষশিলার বৃদ্ধ নাগরিকের দল।

শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর কথাই সত্য হলো। নগরময় অপরূপ সাজ-সজ্জা, নাচগান আর আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলার রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। সাত দিন সাত রাত্রি উৎসব-আনন্দে ডুবে রইল তক্ষশিলা।

ছেলেটির মনে কষ্ট ও অশান্তির শেষ নেই। কত সে চেষ্টা করে, তবু পড়াশুনায় মন বসাতে পারে না। অথচ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এমন যে কেন্দ্র তক্ষশিলা নগরী, তার শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের ছাত্র সে। অধ্যাপকের নামে সকলে মাথা নোয়ায়। পাঁচ শো ছাত্র তাঁর আশ্রমে লেখাপড়া শেখে, শান্তশীল পরিবেশে জ্ঞানচর্চা নিয়ে থাকে—কেবল সে ছাড়া। মনের দুঃখে সে গুম হয়ে থাকে। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতেও পারে না।

এজন্যে দায়ী তার বাবা মা। জগতে এত ভাল ভাল নাম থাকতে তাঁরা কিনা ভেবে চিন্তে তার নাম রেখেছেন 'পাপক'! এমনি নাম যে, কারো কাছে বলা তো দূরের কথা নিজের মুখেও আনা যায় না! আর সহপাঠীদের কথা না বলাই ভাল। ফাঁক পেলেই তারা পিছনে লাগে—নাম নিয়ে ছড়া কাটে, সময় অসময় নেই, যেখানে সেখানে 'পাপক। পাপক।' বলে চেঁচাতে থাকে।

প্রথম প্রথম সে চটে উঠতো, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করতো। কিন্তু এখন আর কথা বলে না। শুকনো মুখে চুপ করে থাকে। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, নামের জন্যেই জীবনটা তার মাটি হয়ে গেল। অলক্ষুণে ঐ নামটা থাকতে জীবনে তার বড় হবার কোনই আশা নেই।

দিনরাত সে ভাবে। ভেবে কূলকিনারা পায় না। আর ততই দুঃখ ও হতাশায় মন তার মুষড়ে পড়ে। কি করবে, কাকে সে বলবে তার এই মনস্তাপের কথা?

শেষে অনেক ভেবে চিন্তে একদিন সে গিয়ে হাজির হলো গুরুদেবের কাছে। সবাই চলে গেছে, কিন্তু পাপক তখনো শুকনো মুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন—"কি খবর পাপক? কিছু বলবে আমাকে?"

এই মুহূর্তে গুরুদেবের মুখেও 'পাপক' নাম শুনে লজ্জা-সংকোচে সে যেন মাটির সঙ্গে আরো মিশে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে হেঁট মাথায় সে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, গুরুদেব আবার প্রশ্ন করলেন—"কি হলো, চুপ করে রইলে যে? আমায় কিছু বলবে?"

অনেক কষ্টে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সে বললে—"হ্যাঁ গুরুদেব। অনেক দিন যাবৎ ভাবছি, আপনাকে বলবো। নিজেও অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু পথ পাইনি। আজ তাই আপনার কাছে এসেছি। গুরুদেব, আমার নামটা বড় অপয়া—অলক্ষুণে। এ নাম থাকতে জীবনে আমি কখনই প্রতিষ্ঠা পাব না। তাই আপনার চরণে নিবেদন করতে এসেছি, এই নামটা পালটে আপনি আমার অন্য একটা ভাল নাম রেখে দিন।"

পাপকের কথা শুনে গুরুদেব প্রথমে অবাক হলেন, কিন্তু শিষ্যের ব্যথা বুঝতে তাঁর দেরি হলো না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি সস্নেহে বললেন—"বেশ তো। নাম পালটাতে চাও, তাতে লজ্জার কি আছে! কিন্তু কি নাম রাখবে, ঠিক করেছ? করো নি? তা দেখ, নতুন নাম ঠিক করা কি আমার পক্ষে উচিত হবে? তার চেয়ে এক কাজ করো। লোকালয় ঘুরে তুমিই বরং একটা নাম পছন্দ করে আন, যা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হবে বলে মনে করো। তোমায় আমি কিছু দিনের ছুটি দিচ্ছি। ফিরে এসে তুমি যে নাম বলবে, সেই নামই আমি রেখে দেব।"

পাপক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। যাক্! গুরুদেব আবার কি নাম রাখতেন, কে জানে!

খুশি মনে আচার্যকে প্রণাম করে তখুনি সে বেরিয়ে পড়লো।

পাপক চলেছে।

কত গ্রাম, কত জনপদ সে ঘোরে। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়। একথা সেকথার পর তাদের সে নাম জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কোন নামই ঠিকমতো পছন্দ হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে হাজির হলো এক শহরে। রাজপথ দিয়ে চলেছে, হঠাৎ দেখে—একদল লোক এক মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে চলেছে।

নাম জিজ্ঞেস করা পাপকের তখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শ্মশানযাত্রীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললে—"দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

শ্মশানযাত্রীরা একটু আশ্চর্য হয়ে অপরিচিত তরুণ প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালে।

পাপক বললে—"আচ্ছা, যিনি মারা গেছেন, তাঁর নামটা কি ছিল।"

উদ্ভট প্রশ্ন! শ্মশানযাত্রীরা তো অবাক।

উষ্ণ কণ্ঠে একজন উত্তর দিলে—"জীবক।"

"জীবক!"—পাপক চমকে ওঠে: "জীবক নাম এঁর, তবু মরণ হলো?"

আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথায় শ্মশানযাত্রীরা এমনিতেই কাতর, তার উপর

পাপকের কথায় যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়লো। ছেলেটা এমনি বর্বর যে, শোক নিয়ে ঠাট্টা করছে!

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি দু পা এগিয়ে এসে জ্বলন্ত চোখে বললেন—"কে হে তুমি, ছোকরা? মানুষের বাচ্চা নও বোধ হয়। জীবক মরে না মানে? জীবকও মরে, অজীবকও মরে। মরা-বাঁচা নামের উপর নির্ভর করে—একথা তোমায় কে বললে, হাঁদারাম? নাম তো কেবল কোন কিছুকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। এত বয়েস হলো, এখনো এই কথাটা শেখোনি, উল্লুক?"

গাল দিতে দিতে শ্মশানযাত্রীরা চলে গেল। পাপক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়। গভীর চিন্তায় সে ডুবে গেছে। সত্যিই কি নাম কেবল কোন কিছুকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে? নামের আর কোনই মূল্য নেই?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে সে আবার চলতে শুরু করে।...

কয়েক দিন পরে—এক দুপুরবেলা। হঠাৎ এক বাড়ির সামনে হট্টগোল কান্নাকাটি শুনে পাপক থমকে দাঁড়ালো। দেখে, বাড়ির কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে তাদের এক দাসীকে বেদম মারছে।

পাপক এগিয়ে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—"এভাবে ওকে মারছেন কেন?"

তার দিকে দৃক্‌পাত না করে মারতে মারতে কর্তা বললে—"মারবো না? মারবো না তো কি ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করবো? বেটী কুঁড়ের হদ্দ—একটা পয়সাও আজ রোজগার করেনি!"

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন গরু-ঘোড়া-ছাগল-ভেড়ার মতো মানুষও হাটে-বাজারে কেনাবেচা হয়। সেসব মানুষকে বলা হয় ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী। নিজের বলতে তাদের কিছুই থাকতো না। অনেক সময় তাদের দিয়ে বাইরে থেকে উপার্জনও করাতো। সে সবই হতো মালিকের সম্পত্তি। এমন কি তাদের জীবন পর্যন্ত মালিকের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করতো।

পাপকের অভ্যাস যাবে কোথায়! কর্তার কথা শুনে সে দুম্ করে জিজ্ঞেস করে বসলে—"আচ্ছা, ওর নামটা কি?"

কর্তা-গিন্নী থতমত খেয়ে গেল। পরক্ষণে ভেংচি কেটে কর্তা বললে—"কে হে বটে তুমি? হঠাৎ এর নাম জানার কি দরকার হলো তোমার? এর নাম ধনবতী। হয়েছে? আচ্ছা, এবার আসতে আজ্ঞা হোক।"

"অ্যাঁ! ধনবতী?"—পাপক যেন আকাশ থেকে পড়েঃ "নাম ধনবতী—অথচ একটা কানাকড়ি দেবারও ক্ষমতা নেই? ভারি আশ্চর্য তো!"

কর্তা-গিন্নী একেবারেই থ। দাসী পর্যন্ত কান্না ভুলে গেছে। কর্তা এক সময় পাপকের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে হঠাৎ রুখে উঠলো গিন্নীর উপর—"কেমন? বলিনি কতবার, 'গিন্নী, দরজা খুলে কাজ কোরো না,

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি দুপা এগিয়ে এসে জ্বলন্ত চোখে বললেন, "কে হে তুমি ছোকরা ? মানুষের বাচ্চা নও বোধহয়। জীবক মরে না মানে ?..."

[পৃষ্ঠা ১৪০]

দরজা খুলে কাজ কোরো না। ফ্যাসাদ বাধবে।' এইবার বোঝ! যত্তো সব পাগলছাগলের কাণ্ড! বলে কিনা, 'অ্যাঁ, নাম ধনবতী, অথচ কানাকড়ি দেবারও ক্ষমতা নেই!' কী আপদ রে বাবা!"

বলতে বলতে কর্তার মেজাজ আরো গরম হয়ে উঠলো, পাপকের দিকে ফিরে বললে—"বলি, হাঁহে বাপু! বয়েসটা তো তোমার কম হলোনি, অথচ আজো এটুকু আক্কেল হলোনি যে, নাম ধনবতীই হোক আর অধনবতীই হোক, তাতে কি আসে যায়? ভাল ভাল গালভরা নামে কারো পেট ভরেছে—এটা তুমি কোথায় শুনলে, বাপ? যে যেমন কাজ করে, তার ফলও জোটে তেমনি—এতদিনে এ কথাটাও শোনোনি, গাধারাম? আপদ! আপদ!"

বলতে বলতে কর্তা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল পাপকের মুখের উপর।

তা দিক। পাপকের খেয়াল নেই সেদিকে। নিজের চিন্তায় সে ডুবে গেছে: তাহলে নামের কি কোনই মূল্য নেই? যে যেমন কাজ করে, তার ফলও জোটে তেমনি! তাই ধনবতী কাঙাল হয়, জীবকের মৃত্যু হয়? তাহলে নাম পালটানোর জন্যে কেন সে ঘুরে মরছে এভাবে?

ভাবতে ভাবতে পাপক শহর ছেড়ে মাঠের পথ ধরে। কিছুদূর যেতেই এক চৌমাথা। পাপক দেখে, একজন লোক চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

পাপক কাছে গিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে,—"কি হয়েছে, মশাই? একা একা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে এভাবে কি দেখছেন?"

বিরক্তির সঙ্গে লোকটি বললে,—"দেখবো আবার কি? পথ হারিয়ে গেলে মানুষ যা দেখে তাই দেখছি।"

ফস্ করে পাপকের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—"তা মশায়ের নামটা কি, জানতে পারি?"

বলা নেই, কওয়া নেই—এ কী অবান্তর প্রশ্ন! লোকটি হকচকিয়ে গেল। তারপর বললে, "কেন বলুন তো? বাবা-মা নাম রেখেছিলেন পন্থক বা পথিককুমার।"

"অ্যাঁ! বলেন কি মশাই?"—পাপক যেন লাফিয়ে উঠলো: "আপনার নাম পন্থক—পথিককুমার, আর আপনি কিনা পথ হারালেন!"

তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে সে বললে,—"ভারি আশ্চর্য তো! পন্থকও পথ হারায়!"

রাগে ও অপমানে লোকটির চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাপকের শেষ কথাগুলো কানে যেতেই সে হেসে ফেললে। বুঝতে পারলে, ছেলেটি হয় পাগল, না-হয় নিরেট বোকা। কাষ্ঠ হাসি হেসে সে বললে,—

"বাঃ ! বেশ তো বাছা, বলতে কইতে পারো ! আহা, কী মাথা ! কান দুটোও তো দেখছি; বেশ নজরে পড়ার মতো ! তা বাবা দীর্ঘকর্ণ, তোমার কি বিশ্বাস যে, নামের উপরই সবকিছু নির্ভর করে ? আজ থেকে জেনে রাখো, ওটা ঠিক নয় ! নাম পথিকই হোক আর অপথিকই হোক, সবাই পথ হারাতে পারে,—নামের উপর তা নির্ভর করে না। নাম মানুষের দেওয়া, মানুষই সৃষ্টি করেছে কাজের সুবিধের জন্যে—এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে পৃথক করার জন্যে। বুঝেছো ?"

নিশ্চয়ই !

হেঁট মাথায় পাপক আশ্রমের দিকে রওনা হয়। আর নয় ! কত কাণ্ডই না সে করলো নামের জন্যে। পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে পথে পথে ঘুরেছে কত দিন ধরে ! অথচ পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা—সব কিছুই নির্ভর করে কাজের উপর, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের উপর।

তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আচার্য মৃদু হাসলেন। সহপাঠীরাও চুপ করে গেল সেই দিন থেকে।

আজ সবাই কাঁদে। পৃথিবীতে আজ তাদের সংখ্যাই বোধ হয় বেশি, জীবনভোর যাদের কান্নাই সার।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল—সে কোন্ আদ্যিকালে, কেউ বলতে পারে না—পৃথিবীতে যখন কান্না ছিল না। কেউ কাঁদতে জানতো না, কান্না কাকে বলে, তা-ও কেউ জানতো না। সবাই হাসতো, খেলতো, সুখে দিন কাটাতো। পৃথিবীতে তখন ছিল শুধু আলো আর ফুল, হাসি আর আনন্দ।

তারপর হঠাৎ একদিন সবাই কেঁদে উঠলো—পশুপাখি কাঁদলো, মানুষও কাঁদলো। আর সেইদিন থেকে কান্না এল পৃথিবীতে, এল অশ্রুর বন্যা।

কেন ?—বড় করুণ সে কাহিনী।···

পাহাড়ে ঘেরা এক দেশ। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের কোলে বনের ছায়া, পাহাড়ের নীচে বনের মায়া। মাঝে মাঝে সবুজ মখমলের মতো নরম ঘাসে বিছানো মাঠ আর ঝরনার গান। সেখানে ফুল ফোটে। পাখি ডাকে। রামধনু-রঙের পাখা মেলে ফুলে ফুলে ওড়ে প্রজাপতি। সেথা দিনের বেলায় রেণুর মতো সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে। আর রাতের বেলায় কে যেন তারার চাঁদোয়া টাঙায় উপরে। চাঁদনী জোছনায় আলোছায়া লুকোচুরি খেলে বনে আর মাঠে আর ঝরনার জলে।

মায়াময় সে এক স্বপনপুরী।

সেখানে বাস করে এক হরিণী—তার বাচ্চাটিকে নিয়ে। বড় সুখে সে থাকে। সাত রাজার ধন এক মানিক তার ওই ছেলেটি। কাঁচা হলুদের মতো তার গায়ের রঙ, মাঝে মাঝে গোল গোল সোনালী ডোরা আর কপালে সাতরঙা এক চক্রের মাঝে অপরূপ এক শুভ্র কমল। আলো যেন ঠিকরে পড়ে শিশুর গা থেকে। দেখলে চোখ ফিরানো যায় না। হরিণ-শিশু তো নয়—যেন এক হীরের টুকরো দেবশিশু।

ছেলেকে নিয়েই হরিণীর দিন কাটে। দিনের বেলায় সে ছেলের পাশে

পাশে ঘোরে, একদণ্ড কাছছাড়া করে না। আর রাতের বেলায় তাকে কোলের মাঝে নিয়ে ঘুমায় পরম সুখে। ছেলে যখন মাঠের মাঝে লাফালাফি করে, নিজের ছায়া আর বনের হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করে বেড়ায়, মা তখন ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ছেলের গরবে বুক তার ভরে ওঠে।

এমনিভাবে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন হরিণী দেখলো, ছেলে যেন কেমন আনমনা—খেলাধুলো করে না, দৌড়ঝাঁপে মন নেই। মা জিজ্ঞেস করলে,—"কি হয়েছে রে?"

আনমনে ছেলে জবাব দিল,—"কিছু না।"

একদিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিনের দিন ছেলে হঠাৎ বললে,—"মা, আমি পাহাড়ের ওপারে যাব। ওখানে আছে বড় বড় মাঠ, কত ঘাস, কত মিষ্টি লতাপাতা।"

মা চমকে উঠলো,—"এ্যাঁ! কোথায়? কি বলছিস?"

ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে বললে,—"কেন? ওই ওখানে।"

"ওখানে? হঠাৎ ওখানে তুই যাবি কেন?"

ছেলে বললে,—"ঐ তো বললাম—ওখানে আছে বড় বড় মাঠ, মাঠভরা মিষ্টি ঘাস, লতাপাতা আর ভারি মিষ্টি ফুলফল।"

মায়ের বুক কেঁপে উঠলো। বললে,—"কে বললে? কে বললে তোকে এইসব মিছে কথা?"

মায়ের কোল ঘেঁষে ছেলে বললে,—"অমন করছো কেন, মা? মিছে কথা কেন হবে? তুমি জানোনা, তাই বলছো। সেই যে বনের টিয়ামাসী—সেই তো বলেছে ওই দেশের কথা। মাসী রোজ যায় সেখানে। আমিও যাব মা।"

মা বলে,—"না, না।"

ছেলে বলে,—"কেন না করছো মা? একটিবার—শুধু একটিবার যাব। গিয়েই ফিরে আসবো তখ্খুনি।"

মায়ের মন হু-হু করে ওঠে; বলে,—"ওরে, না না, যাস নে—কখ্খনো যাসনে ওখানে। যা শুনেছিস, সব মিছে কথা।"

মা কত বুঝায়, কত নিষেধ করে। কিন্তু ছেলের সেই এক গোঁ—একটি বার গিয়েই সে ফিরে আসবে।

মায়ের বুকে সে মুখ ঘষে আর বারবার বলে—"একবার যেতে দাও, মা—শুধু একটি বার। গিয়েই ফিরে আসবো। টিয়ামাসী বলেছে, ভারি সুন্দর সে দেশ, সেখানকার সবই মিষ্টি।"

কি বলে ছেলেকে ভুলোবে, কি করে তাকে নিরস্ত করবে, হরিণী ভেবে পায় না। বনের দিকে অসহায় ডাগর দুই চোখ তুলে মনে মনে বলে—'ওরে টিয়া সর্বনাশী এ তুই কি করলি?'

দিন যায়।

ছেলে খায় না, দায় না। হাসে না, খেলে না। শরীর তার রোগা হয়, গায়ের রঙ মলিন হয়। অভিমানে মুখ শুকনো করে সে চুপ করে বসে থাকে।

হাজার হোক মায়ের মন তো—আর কত সহ্য হয়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষে মা একদিন বললে—"ওরে একগুঁয়ে, ছাড়বি না যখন, তখন যা।—কিন্তু কথা দে—

গিয়েই চলে আসবি.
কোনো কিছুতেই মুখ দিবি নে,
এক নজর দেখেই ফিরে আসবি।—বল্। কথা দে।"

ছেলে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। মুহূর্তের তর সয় না। মায়ের কথায় সায় দিয়ে সে ছুটলো তখুনি। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

ছেলে অদৃশ্য হতেই হরিণীর বুক সেই প্রথম যেন কেমন করে উঠলো। আকুল কণ্ঠে সে ডেকে উঠলো—"ওরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়।"

প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। হরিণীর মনে হয়—যেন কতক্ষণ। কী এক অব্যক্ত অনুভূতিতে সে ছটফট করতে থাকে। বারে বারে কান খাড়া করে তাকায় পাহাড়ের দিকে—তার খোকা গেছে যেদিকে।

শেষে আর থাকতে না পেরে অধীর পায়ে সে এগোয় সেই দিকে।

হরিণ-শিশু তখন ছুটে চলেছে. ছুটছে যেন এক আলোর শিখা—কখনো পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন রইল পিছনে পড়ে, পিছনে রইল পাহাড়ের সারি। এক লাফে সে পার হলো রুপালী ঝরনা!

মনের আনন্দে নাচতে নাচতে শিশু ছুটে চললো তীরের মতো।

তারপর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো এক সময়ঃ সামনে এক নতুন দেশ!

শিশুর চোখ জুড়িয়ে যায়ঃ আহা! কী সুন্দর! এমন দেশ তো সে আগে কখনো দেখেনি। আহা কী রূপ! মাঠে মাঠে নাম-না জানা কতো বড় বড় ঘাস। সোনালী, হলুদ, সবুজ—কতই না তাদের রঙের বাহার!

মুগ্ধ শিশু এগিয়ে যায়ঃ আঃ! কী সুগন্ধ ওদের!

তার চোখে যেন পলক পড়ে নাঃ চারিদিকে সুন্দর সব রসাল লতাপাতা! গাছে গাছে মনমাতানো কত ফুলফল। নিশ্চয়ই এই সেই দেশ, টিয়ামাসী বলেছে যে দেশের কথা।

শিশু আত্মহারা। মায়ের নিষেধ সে ভুলে গেল। এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তারপর মাঠে গিয়ে নামলো।

দেখলো, কারা যেন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ চরণে, অদ্ভুত তাদের দেখতে—
তারা দুপায়ে চলে, কি যেন ধরে আছে সামনের দুপায়ে। [পৃষ্ঠা ১৪৮]

তার জিভে জল, চোখ আনন্দে চঞ্চল।

হঠাৎ তার কানে এল এক খসখস শব্দ। ধনুকের মতো নরম ঘাড় তুলে সে তাকালো এদিক-ওদিক। তারপর—মুখ দিল ঘাসের মাথায়।

আবার সেই খসখস। এবার আরো কাছে। আর মাঠের পাশে ও গাছের তলায় কাদের যেন ফিসফাস।

শিশু এবার ঘাড় তুলে তাকালো ডাইনে। নিষ্পাপ দুই গভীর কালো চোখে ভয়ডর নেই, আছে বিস্ময় আর আনন্দ। দেখলো, কারা যেন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ চরণে। অদ্ভুত তাদের দেখতে—তারা দু পায়ে চলে, কি যেন ধরে আছে সামনের দু পায়ে।

শিশু তাকালো বাঁয়ে। তাকালো পিছনে।

ওরা সবখানে।

নির্বোধ শিশু জানে না,—ওরা মানুষ, হাতে ওদের তীর-ধনুক।

বড় বড় কৌতূহলী চোখে সে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত সেই জানোয়ারগুলোর দিকে।

এমন সময় হঠাৎ এক টঙ্কার—আর শন্ শন্ শন্! বাতাস যেন কেঁপে উঠলো।

পরক্ষণে তুলোর মতো নরম শিশু আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলো, পড়ে গেল মাটিতে। যন্ত্রণায় ছটফট করে একবার শুধু ডেকে উঠলো—মা! মা!

তারপর সব শেষ। নিষ্পাপ শিশুর রক্তে সেই বুঝি পৃথিবী প্রথম রাঙা হলো।

সেই মুহূর্তে হরিণীও এসে দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের চূড়ায়—নীল আকাশের গায়ে এক পটে-আঁকা ছবির মতো। তীরের ফলার মতো তার কানে এসে বিঁধলো ছেলের আর্তনাদ—মা! মা!

বিদ্যুদ্বেগে হরিণী ঘুরে দাঁড়াতেই, সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কেঁপে উঠলো। আকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে সে আছাড় খেয়ে পড়লো পাথরের উপর। কেঁদে উঠলো হাহাকার করে। তার বুকের রক্তে পাথর রাঙা হয়ে গেল। সেই প্রথম মায়ের চোখের জলে আর বুকের রক্তে সিক্ত হলো কঠিন পাষাণ।

পরক্ষণে হঠাৎ ক্রন্দনের ধ্বনি জেগে উঠলো আকাশে বাতাসে। গাছপালা কেঁদে উঠলো। পশুপাখি কেঁদে উঠলো। আর—সাঁঝের আঁধারে মানুষও কেঁদে উঠলো ঘরে ঘরে।

এক যে ছিলেন রাজা। রাজার রাজ্য ছিল বিরাট, রাজপুরী ছিল বিরাট, আর ধনদৌলত যে কত ছিল, তা রাজা নিজেই জানতেন না। কিন্তু হলে কি হয়, রাজার মনে সুখ নেই, মুখে হাসি নেই। দিনরাত তিনি গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন : হায় রে একটা ছেলে বা একটা মেয়েও যদি থাকতো।

রাজ্যের লোকেরও কি এজন্যে দুঃখ কম। তারা খাটে, খায় আর মুখ আঁধার করে ঘুমোয়। আর রাজপুরী খাঁ-খাঁ করে।

তারপর হঠাৎ একদিন রাজ্যময় মহা ধুমধাম পড়ে গেল। রাজপুরীতে সে কী আনন্দের হুল্লোড়! সারা দেশ জুড়ে শুধু উৎসব আর উৎসব।

কি ব্যাপার? না, রানীর এক ছেলে হয়েছে।

দুই হাতে রাজা ধনদৌলত বিলোতে থাকেন।

রাজবাড়ির এক কোণে আঁতুড়ঘর। কিন্তু এমন করে সাজানো যে, না বললে তা ধরার উপায় নেই। মনে হয়, রাজবাড়ির কোন মন্দির বুঝি।

আঁতুড়ঘরের দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছেন কে? ভাবছো বুঝি সিপাই শান্ত্রী কেউ? উঁহু। এমন কি রাজ্যের কোটাল বা মুখ্যমন্ত্রীও নন। পাহারা দিচ্ছেন স্বয়ং রাজার শ্যালক অর্থাৎ রানীর একমাত্র সহোদর ভাই। বিধাতাপুরুষ কখন আসবেন, সেই আশায় তিনি বসে আছেন।

মানুষের ভাগ্য বা অদৃষ্ট নিয়ে বিধাতাপুরুষের কারবার। মানুষ জন্মালেই তিনি নবজাতকের কপালে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ বা ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান—যাকে আমরা বলি অদৃষ্ট। বিধিলিপিও বলে কেউ কেউ। সবারই বিশ্বাস, জগতে সব এড়ানো গেলেও অদৃষ্ট এড়ানো যায় না, বিধিলিপি খণ্ডানোর সাধ্য কারো নেই। তাই বিধাতাকে সবাই সমীহ করে চলে—একমাত্র রাজার ওই শ্যালক ছাড়া।

বিধাতার এ ক্ষমতা রাজার শ্যালক মানেন না। বলেন—"যত্তো সব বুজরুকি—মানুষকে ভয় দেখিয়ে বশে রাখার ফন্দি শুধু। বিধাতার মর্জির ওপর মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ওপর। অদৃষ্টই বলো আর বিধিলিপিই বলো, চেষ্টা করলে মানুষ ওটা পালটাতে পারে।"

এর ফলে বিধাতাপুরুষ তাঁর ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। তিনি মনে মনে গজরান আর সুযোগের প্রতীক্ষা করেন—একবার বাগে পেলে হয়, তাঁকে তাচ্ছিল্য করার মজাটা ও'কে টের পাইয়ে দেবেন।

রাজার শ্যালকও তা জানেন। তাই বোনের আঁতুড়ঘরের সামনে তিনি বিধাতার আশায় জে'কে বসে আছেন সেই সন্ধ্যা থেকে।

অন্ধকার নিশুতি রাত। উৎসবক্লান্ত রাজপুরী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সারা দেশ। শুধু একা ঠায় বসে আছেন রাজার শ্যালক। বসে থেকে থেকে কখন তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন সময় বিধাতা এসে হাজির। রাজার শ্যালককে দেখে রাগে তাঁর পিত্তি জ্বলে গেল। পায়ে খড়ম—তবু সাধ্যমতো পা টিপে টিপে সন্তর্পণে তিনি আঁতুড়ঘরে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ খুট করে একটু আওয়াজ হতেই রাজার শ্যালকেয় তন্দ্রা টুটে গেল।

চোখাচোখি হলো দুজনায়। রাজার শ্যালক মুচকি হেসে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বিধাতাপুরুষকে পথ করে দিলেন। আর কটমট করে তাকাতে তাকাতে বিধাতা ঢুকলেন ভিতরে।

ঘরের মধ্যে রানী তখন ছেলে কোলে নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বিধাতা-পুরুষ সন্তর্পণে ভাগ্যলিপি লিখলেন রাজকুমারের কপালে।

কাজ শেষ করে তিনি বেরোতে যাবেন, দেখেন, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে রাজার শ্যালক—হতভাগাটা মুচকি মুচকি হাসছে।

বিধাতা চাপা গলায় হুংকার ছাড়লেন—"পথ ছাড়ো।"

রাজার শ্যালক বললেন—"তা ছাড়ছি। কিন্তু তার আগে আমায় বলে যান, কুমারের কপালে কি লিখলেন।"

চোখ পাকিয়ে বিধাতা বললেন—"বট্‌টে! তোমার কি দরকার?"

রাজার শ্যালক হাসতে হাসতে বললেন—"বাঃ। বেশ প্রশ্ন করলেন যা হোক! আমি হলাম গিয়ে কুমারের মামা। দরকার আমার নয় তো কি আপনার?"

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন—"শুনুন বিধাতা, ভাগনের অদৃষ্ট পালটানোর জন্যে আপনাকে কখনো অনুরোধ করবো না। আপনাকে শুধু বলে যেতে হবে, কি লিখলেন।"

বিধাতা দেখলেন, গোঁয়ারটার হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। অথচ দেরি করারও সময় নেই। আরো নানা জায়গায় অনেক কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া ও যখন অদৃষ্ট পালটানোর কথা বলছে না, তখন লিখন বলতে কি আর এমন আপত্তি!

রাজার শ্যালকের মুখের ওপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—"বড় হলে তোমার ভাগনেটি চোর হবে। রোজ তাকে চুরি করতে হবে, নইলে দিনের খাবার জুটবে না।—বুঝলে?"

রাজার শ্যালকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ক্ষণেকের জন্যে তিনি স্তব্ধ রইলেন, তারপর 'ওঃ।' বলে বিধাতাপুরুষকে পথ ছেড়ে দিলেন।

কিছুকাল পরে—

আবার রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়লো। রানীর আবার এক ছেলে হয়েছে।

আবার সেই আঁতুড়ঘর। আর সেই আঁতুড়ঘরের দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছেন আর কেউ নন—রাজার শ্যালক। আগের মতোই নিশুতি রাতে বিধাতাপুরুষ এলেন, আর মেজ কুমারের ভাগ্যলিপি লিখে, যাবার সময় রাজার শ্যালককে বলে গেলেন—"তোমার এই মেজ ভাগনেটিকে ভিক্ষে করে পেট চালাতে হবে। দৈনিক ভিক্ষে না করলে তার দিনের খাবার জুটবে না।"

আবার কিছু দিন পরে—

রাজ্যময় আবার ধুমধাম। রানীর আর এক ছেলে হয়েছে নিশুতি রাতে বিধাতাপুরুষ আগের মতোই আবার এলেন আর যাবার সময় রাজার শ্যালককে জানিয়ে গেলেন—"তোমার এ ভাগনেটি রাখালগিরি করবে। দিনের খোরাক জুটনোর জন্যে রোজ তাকে গোরু মোষ চরাতে হবে।"

দিন যায়।

আনন্দে উৎসবে রাজপুরী জমজমাট। তিন ছেলে নিয়ে রাজা-রানীর হাসি ও আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু হাসি নেই শুধু রাজার শ্যালকের। ব্যথায় তাঁর বুক টনটন করে। সারাক্ষণ তিনি গুম হয়ে থাকেন।

আবার কিছুকাল পরে রাজ্য জুড়ে উৎসবের সাড়া জাগলো। এবার রানীর এক মেয়ে হয়েছে। গভীর রাতে বিধাতা যাবার সময় রাজার শ্যালককে বলে গেলেন—"তোমার ভাগনীটিকে দাসীগিরি করে পেট চালাতে হবে। রোজ ঝিয়ের কাজ না করলে তার দিনের খোরাক জুটবে না।"

বলতে বলতে বিধাতার মুখে কঠিন বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো। রাজার

শ্যালকের ওপর ক্রুর দৃষ্টি ফেলে তিনি চলে গেলেন। আর তিন দিনের দিন ঘটলো এক মহা সর্বনাশ। রানী হঠাৎ মারা গেলেন।

রাজপুরী অন্ধকার হলো। রাজ্য জুড়ে শোকের ছায়া নামলো। রানীর শোকে রাজা উন্মাদের মতো। কোথায় রইল তাঁর রাজ্যশাসন, আর কোথায় গেল তাঁর ঘরসংসার, ছেলেমেয়ে। শেষে তিনিও একদিন সব ফেলে রানীকে অনুসরণ করলেন।

সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। সবাই শোকে মুহ্যমান। আর রাজার শ্যালক? তাঁর সারা অন্তর জুড়ে তখন শুধু হাহাকার। শোকের জ্বালায় আর মনের আগুনে দিনরাত শুধু কাঁদেন তিনি।

কিন্তু মাবাপ হারা ভাগনে-ভাগনীদের মুখ চেয়ে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত শোক চাপতে হলো। চোখের জল মুছে রাজ্যের শাসনভার তিনি একদিন নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল। তেমনি তাঁর আদর-যত্নে রাজকুমারী ও রাজকুমার দুজনও বাবা-মা'র শোক ভুলে গেল অল্পদিনের মধ্যে। মামার সুশিক্ষায় তারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে লাগলো।

কত বছর কেটে গেল তারপর।

বড় রাজকুমারের বয়স তখন প্রায় উনিশ বছর। রাজকুমারী ও কুমারদের প্রশংসায় রাজ্যের সবাই শতমুখ। এমন সময় হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। মামা একদিন—বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ বড় রাজকুমারকে রাজপুরী থেকে বের করে দিলেন। বললেন—"দূর হ এখান থেকে। নিজের পেটের ভাত নিজে যোগাড় করে খা গে যা।"

কাণ্ড দেখে মন্ত্রী, সভাসদ,—প্রজাবর্গ—সবাই স্তম্ভিত। কিন্তু টুঁ শব্দ করার কারো উপায় নেই। সব ক্ষমতা মামার মুঠোর মধ্যে। তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে বড় কুমারকে এককাপড়ে রাজপ্রাসাদ ছাড়তে হলো।

কয়েক বছর পরে—মেজ রাজকুমার সবে তখন উনিশে পা দিয়েছে, এমন সময় মামা একদিন তাকেও তাড়িয়ে দিলেন রাজপুরী থেকে। বললেন—"দূর হয়ে যা এখান থেকে। নিজের পেট নিজে চালা গিয়ে।"

মামার নিন্দায় দেশ ভরে গেল। সবাই কাঁদলো কুমারদের জন্যে। ধরে নিল, ভাগনেদের তাড়িয়ে মামা পাকাপোক্ত হয়ে সিংহাসনে বসতে চান। মামা কিন্তু নীরব। নিন্দা-প্রশংসায় তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি নিজের কাজ করে যান।

এমনি করে সেজ কুমারও একদিন বিতাড়িত হলো। রাজকুমারীও নিস্তার পেল না। নিরাশ্রয় অভাগা ছেলেমেয়েগুলি কোথায় গেল, কেউ জানে না।

সারা দেশ হায় হায় করতে লাগলো, আর রাক্ষুসে মামার ওপর বিদ্বেষ ও ঘৃণায় সবার মন বিষিয়ে গেল।

এমনিভাবে দিন যায়।

মামা কিন্তু চুপ করে নেই। ভাগনে-ভাগনীরা কোথায় আছে, কিভাবে তাদের দিন কাটছে—সে খবর তিনি রাখেন। এসব খবর তিনি সংগ্রহ করেন সকলের অগোচরে—খুবই সংগোপনে।

শেষে একদিন শেষ রাত্রে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন রাজপুরী থেকে।

ঘুরতে ঘুরতে ভোরবেলায় তিনি এক জঙ্গলে এসে উপস্থিত। দেখেন, এক ঝোপের মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে। মামা চিনলেন, সে-ই বড় রাজকুমার। কুমারের কঙ্কালসার চেহারা। চোখমুখ বসে গেছে। মাথাভরা রুক্ষ চুলের বোঝা—কত দিন তেলজল পড়েনি। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ ফ্যাকাশে কালো হয়ে গেছে। আর সারা গায়ে ধুলোময়লা জমেছে পুরু হয়ে।

মামা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেলা হলে রাজকুমারের ঘুম ভাঙলো। চুরি না করলে তার পেটের ভাত জোটে না। সারা রাত চুরির চেষ্টায় সে বাড়ি বাড়ি ঘোরে, কিন্তু জোটে যৎসামান্য—কোনো রকমে দিন চলার মতো।

খিদেয় পেটের নাড়ী ছিঁড়ে পড়ছে তখন,—রাজকুমার তাড়াতাড়ি ঝোপের ভেতর থেকে খানকয়েক ইট এনে উনুনের মতো করে তার ওপর এক ভাঙা মেটে হাঁড়ি বাসিয়ে দিল। তারপর একটা পুঁটুলি খুলে, তার থেকে হাঁড়িতে চাপিয়ে দিলে দু মুঠো চাল আর কয়েকটা কাঁচকলা। অনেক কষ্টে উনুন ধরিয়ে কাঠি দিয়ে হাঁড়ির চাল নাড়তে নাড়তে কুমারের চোখের জল বাধা মানে না। খিদেয় আর মনের কষ্টে সে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে আর অভিসম্পাত দেয় মামাকে। এমন সময় হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই অস্ফুট আর্তনাদ করে সে লাফিয়ে উঠলো—যেন ভূত দেখেছে। সর্বনাশ! মামা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে!

আতঙ্কে কুমারের গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। পালানোরও ক্ষমতা নেই। পা দুটো কে যেন সেঁটে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। বলির পাঁঠার মতো সে তখন কাঁপছে আর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মামার মুখের দিকে।

মামা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ধরা গলায় বললেন—"কি হয়েছে, বাবা? অমন করছিস কেন? ভাবছিস বোধহয়, আমি তোর কোন অনিষ্ট করতে এসেছি। ওরে বোকা, তা যদি হতো, তাহলে আজ কেন, অনেক আগেই

তো তা করতে পারতুম! তুই কি মনে করিস, তোর কোন খবর আমি রাখি নি? তুই কোথায় আছিস, কি কষ্টে তোর দিন কাটছে—তা কি জানি নে, মনে করিস?"

রাজকুমার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো: কষ্ট! পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, গায়ে-মাথায় এক ফোঁটা তেল পড়ে না। সারা রাত গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে একমুঠো অন্ন তাকে চুরি করে আনতে হয়। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও নেই।—কষ্ট!

মামাও চোখের জল রোধ করতে পারেন না। এতদিন চরের মুখে এদের খবর পেয়েছেন, এ চূড়ান্ত ভিখিরিদশা স্বচক্ষে দেখেননি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে ধরা গলায় তিনি বললেন—"কাঁদিস নে খোকা। তোর সঙ্গে জরুরী একটা কথা বলতে এসেছি। সেই মতো কাজ করলে, এ কষ্ট তোকে আর বেশি দিন সইতে হবে না।"

কান্না ভুলে কুমার তাকালো মামার মুখের দিকে। মামা বললেন—"শোন্, যা বলি সেইমতো তোকে কাজ করতে হবে। আগামী কাল থেকে তুই আর স্বেচ্ছায় চুরি করতে বেরোবি নে। পেট কি করে চলবে, তা তোকে ভাবতে হবে না। আহা, শোন্ শোন্, ওভাবে মাথা নাড়িস নে···"

উত্তেজিত কণ্ঠে কুমার কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে মামা বললেন—"শোন্ বাবা, শোন্, একটিবার—শুধু এই একটিবার আমার কথা শোন্, ভালো হবে। চুরি না করলে তোর পেট চলবে না, জানি। কিন্তু কেউ ব্যবস্থা না করে দিলে নিজের ইচ্ছেয় তুই আর চুরি করতে বেরোবি নে—এইটুকুই তুই শুধু আমায় কথা দে। চুপচাপ এই গাছতলায় বসে থাকবি। তারপর দ্যাখ, কি হয়।"

কিন্তু রাজকুমার কোন কথাই শুনতে চায় না। দিনের পর দিন মনে যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জমা হয়েছে মামার সম্পর্কে, তা কি সহজে যায়! অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত রাজকুমার রাজী হলো।

মামা এবার চললেন মেজ কুমারের খোঁজে। বেলা তখন দুপুর।

ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে এক গাঁয়ের সীমান্তে এসে হাজির হলেন তিনি।

দিন শেষ হয়ে আসছে। গাছের পাতায় পাতায় আলোর শেষ রক্তিমাভা পড়েছে। ডালে ডালে পাখির অশ্রান্ত কলগুঞ্জন, আর গোরু-মোষ নিয়ে রাখালেরা ঘরে ফিরছে।

মামা দেখলেন, বড় এক বটগাছের তলায় একটি ছেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে শুকনো ডালপাতা দিয়ে উনুন ধরানোর চেষ্টা করছে।

তিনি চিনলেন—সে মেজ কুমার। তারও অবস্থা হয়েছে বড় জনের মতো।

চেনার উপায় নেই। সারা দিন ভিক্ষার আশায় সে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। দিনান্তে চালে ডালে মিশিয়ে যা জোটে, তাতে একবেলার খোরাক হয় কোনো রকমে। গাছতলায় সেই ভিক্ষান্ন ফুটিয়ে নেয়।

উনুন ধরানোর চেষ্টায় কুমার ব্যতিব্যস্ত। বাতাসে আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার। ধোঁয়ায় আর মনের কষ্টে সে অঝোরে কাঁদছে। এমন সময় হঠাৎ পিছনে নজর পড়তেই সে লাফিয়ে উঠলো—মামা!

মরি-বাঁচি করে সে ছুটলো জঙ্গলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মামা তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর সে কী ধস্তাধস্তি! মামার কবল থেকে ছাড়া পাবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে, আঁচড়ে কামড়ে মামাকে ক্ষতবিক্ষত করতেও ছাড়ে না। মামা তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন আর কেবলি অনুনয় করেন—"খোকা, শোন্, শান্ত হয়ে শোন্ একটু···ওঃ-হো-হো···কামড়ে রক্ত বের করে দিলি!···উঃ!···বাবা, তোর কোন অনিষ্ট করতে আমি আসিনি। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ, সে মতলব থাকলে আগেই তো তা করতে পারতুম···"

শেষ পর্যন্ত মেজ কুমার কিছুটা শান্ত হলে মামা বললেন—"বাবা, তোর এ অবস্থা দেখার জন্যে আমি আসিনি। এসেছি, যাতে তোর এই কষ্ট শীগ্গির দূর হয়। তার জন্যে আমার পরামর্শ তোকে শুনতে হবে। শুনবি তো? কি, চুপ করে রইলি যে? বিশ্বাস হচ্ছে না,—না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—"আমার পরামর্শ কি জানিস? কাল থেকে তুই আর স্বেচ্ছায় ভিক্ষেয় বেরোবি নে।"

"তাহলে কি না খেয়ে মরবো?"

"না।"—মামা বললেন: "ভিক্ষে তোকে আরো কিছুদিন করতে হবেই। কিন্তু কেউ তার ব্যবস্থা না করে দিলে তুই নিজের ইচ্ছেয় করবি নে,—এইটুকুই শুধু আমার কথা।"

মেজ কুমার রাজী হল শেষ পর্যন্ত।

অন্ধকার শীতের রাত্রে মামা আবার রওনা হলেন। চললেন সেজ ভাগনের কাছে।

দূর গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ি। গৃহস্থের গোয়ালের পাশেই বিচালির ওপর চট বিছিয়ে সেজ রাজকুমারের শোবার ব্যবস্থা। গোয়ালের সামনে আগুন জেবলে সে শীত তাড়ানোর চেষ্টা করছে। মাঘের শীতে সারা রাত সে ঘুমুতে পারে না।

একরোখা গোঁয়ার বলে সবাই তাকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলে—এমন কি

বাড়ির কর্তা-গিন্নি পর্যন্ত। আর অন্য রাখাল-ছেলেরা তাকে ভালবাসে ও সমীহ করে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্যে।

নিঝুম গভীর রাত্রি। মামা ধীরে ধীরে আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেজ কুমার চমকে উঠলো,—কে?

খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল সে। তারপর পাশে পড়েছিল বাঁশ একখানা, ধাঁ করে সেটা তুলে নিয়েই সে তড়াং করে উঠে দাঁড়ালো : "তবে রে শয়তান! তুই? দাঁড়া, তোর মামাগিরি আজ ফলাবো। রাজ্য থেকে তাড়িয়েও সুখ নেই, এখানেও তাড়া করেছিস।"

বলতে বলতে সে ভয়ংকর কণ্ঠে শাসিয়ে উঠলো—"সাবধান! আর এক পা এগিয়েছিস কি, আস্ত রাখবো না।"

তারপর শুরু হলো গালাগালি। অকথ্য ভাষায় মামার চৌদ্দ পুরুষ সে উদ্ধার করে চললো।

কিন্তু একতরফা কতক্ষণ চলে! উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হতেই হঠাৎ তার খেয়াল হলো—তাই 'তো, কি ব্যাপার! মামা এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি, চুপ করে তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখে বা হাবভাবে বদ মতলবের কোন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। বরং ব্যথায় যেন সারা মুখ থমথম করছে। তবে?

থতমত খেয়ে সে চুপ করে গেল।

তারপর অনেক কথা, অনেক তর্কাতর্কি। সেজ কুমার শেষে কথা দিলে—নিজের ইচ্ছায় এর পর থেকে সে আর কখনো রাখালের কাজ করবে না।

মামা আবার রওনা হলেন।

শেষ রাত্রি। পূব আকাশে শুকতারাটি শেষবারের মতো জ্বলে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। দু একটা কাক শালিক আর নাম-না-জানা পাখি ঘুমজড়িত কণ্ঠে ভোরের আগমনী ঘোষণা করতেই রাজকুমারী ময়লা ছেঁড়া চটের ওপর উঠে বসলো। না উঠে উপায় কি?

পরের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর নিকানো, ময়লা সাফ করা থেকে অজস্র ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে তার রাত দুপুর গড়িয়ে যায়! তারপরে বিশ্রাম। শেষ দিকে শরীর যেন আর বইতে চায় না। খাওয়াতেও রুচি থাকে না। আর ঝি-চাকরদের জন্যে সে কী খাওয়ার ব্যবস্থা! প্রথম প্রথম সে তো মুখেই তুলতে পারতো না, বমি করে ফেলতো। তার ওপর এই দারুণ শীতে সারা রাত ভালো ঘুমও হয় না। ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। তার কালিপড়া কংকালসার চেহারা দেখে, কে বলবে সে রাজার

নন্দিনী ! আজ তাকে উদয়াস্ত গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতে হয়—শুধু একমুঠো অন্নের তাড়নায় ।

উজ্জ্বল শুকতারার দিকে রাজকুমারী তাকিয়ে থাকে । শুকতারা নীরবে জ্বলছে, নিভে আসছে একটু একটু করে । রাজকুমারীর চোখে অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে । দাদাদের সে যেন দেখতে পায় । তারা এখন কোথায় ? দুঃখে রাজকুমারীর বুক ফেটে যায় । মামার আদর ও স্নেহ-যত্নের কত কথা মনে পড়ে । কিন্তু—কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল !

নিরালায় নীরবে রোজ কাঁদে রাজকুমারী । সেদিনও কাঁদছে, এমন সময়—

এ কী ! মামা !

তারপর নানা কথা······

রাজকুমারী কাঁদলো । মামাও কাঁদলেন । শেষে রাজকুমারী কথা দিল—স্বেচ্ছায় সে আর ঝিয়ের কাজ করবে না ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মামা ফিরে গেলেন রাজপুরীতে ।

ভোরবেলা । বিধাতাপুরুষের বাড়ি ।

চিরাচরিত অভ্যাসমতো বিধাতা প্রাতঃকৃত্যাদির আগে নিশ্চিন্ত মনে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছেন । আধবোঁজা চোখ, মুখে উদ্বেগ অশান্তির চিহ্নও নেই ।

ফুড়ুৎ ! ফুড়ুৎ ! এক মনে হুঁকো চলেছে । এমন সময়—এ্যাঁ !—চমকে উঠলেন বিধাতা, হুঁকোও আচমকা থেমে গেল : এ্যাঁ ! টনক নড়ছে !

বিধাতা নড়েচড়ে বসলেন । তারপর হুঁকোয় আবার গোটা দুয়েক টান দিয়েছেন কেবল, আবার টনক নড়ে উঠলো ।

বিধাতার ভ্রূ কুঁচকে এল : এঁ্যা, টনক নড়ে কেন ?···এঁ্যা ! তাই তো ! রাজার মেয়েটা ঘরে বসে আছে এখনো ! ঝিয়ের কাজে বেরোনোর নাম নেই ।

কয়েক মুহূর্ত তিনি হাঁ করে বসে রইলেন । তারপর বিরক্তির সঙ্গে হুঁকোয় ঠোঁটটা কেবল লাগাতে যাবেন, অমনি আবার টনক—এবার আরো জোরে ।

বিধাতা সোজা হয়ে বসলেন জলচৌকির ওপর : এ্যাঁ ! আবাগীর বেটীর হলো কি ! এখনো চুপ করে বসে আছে ?

কি করবেন, বিধাতা ভেবে পান না ।

টনকের কিন্তু বিরাম নেই—একভাবে নড়ে চলেছে । বিধাতা অস্থির হয়ে উঠলেন । দাঁড়িয়ে, বসে—কোনতায় সোয়াস্তি নেই । এত জোরে টনক নড়ছে যে, পায়চারি করতে করতে একটু যে ভেবে নেবেন, তারও জো নেই ।

ঠাস করে হুঁকোটা ফেলে দিয়ে গজরাতে গজরাতে বিধাতা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে ।

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রাজকুমারী চুপ করে বসে আছে, এমন সময় ব্রাহ্মণের বেশে বিধাতা গিয়ে হাজির। অবাক হয়ে রাজকুমারী ছেঁড়া চট বিছিয়ে দিলে অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বসবার জন্যে।

আশীর্বাদ করে একথা-সেকথার পর বিধাতা মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,—"তা মা, আজ তুমি কাজে বেরোবে না?"

"না।"

এ্যাঁ!—বিধাতার বুক ধড়াস করে উঠলো: "কেন মা, কি হয়েছে? কাজ না করলে কি করে তোমার পেট চলবে?"

রাজকুমারী বললে,—"তা জানিনে। তবে ঝিয়ের কাজ আমি আর করবো না।"

বিপন্ন কণ্ঠে বিধাতা বললেন,—"মা, তুমি তো বোকা নও। তবু কেন অবুঝের মতো কথা বলছো? অদৃষ্ট মা, অদৃষ্ট। নইলে তোমাকে ঝিগিরি করতে হবে কেন? ওঠো মা—আর দেরি করো না।"

কিন্তু রাজকুমারী উঠলো না। যেমন ছিল, তেমনি হেঁট মুখে বসে রইল।

আর শীতের ভোরে বিধাতা ঘামতে লাগলেন। এক-একবার তাঁর ইচ্ছা হয়, হতচ্ছাড়া মেয়েটার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন। কাজ করবে না!—মামাবাড়ির আবদার পেয়েছে?

কিন্তু রাগলে চলবে না। অনেক কষ্টে মনের বেগ সংবরণ করে তিনি বললেন,—"আচ্ছা মা, কেন কাজ করবে না, বল তো? কি দুঃখ তোমার?"

রাজকুমারী বললে,—"অতো কাজ আমি করতে পারি নে।"

বিধাতার বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। চাদরের খুঁটে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এক লাফে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মুখে শুকনো হাসি টেনে বললেন, "ওঃ! এই কথা! তা আগে বললেই তো হয়! কিচ্ছু ভেবো না বাছা—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি, তোমার জন্যে এমন কাজ যোগাড় করে আনবো যে, খুব অল্প খাটলেই চলবে।"

বলতে বলতে বিধাতা রাজকুমারীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারীকে নতুন কাজে লাগিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি ফিরলেন বাড়ির দিকে। মেজাজ তাঁর ভাল থাকার কথা নয়। এত বেলা হলো, প্রাতঃকৃত্যাদি সব পড়ে আছে। তাই জোরে জোরেই পা ফেলছেন তিনি। এমন সময়—এ্যাঁ! আবার টনক!

বিধাতার পা দুখানা যেন আপনা থেকে অসাড় হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টনকও নড়ে উঠলো—আরো জোরে।
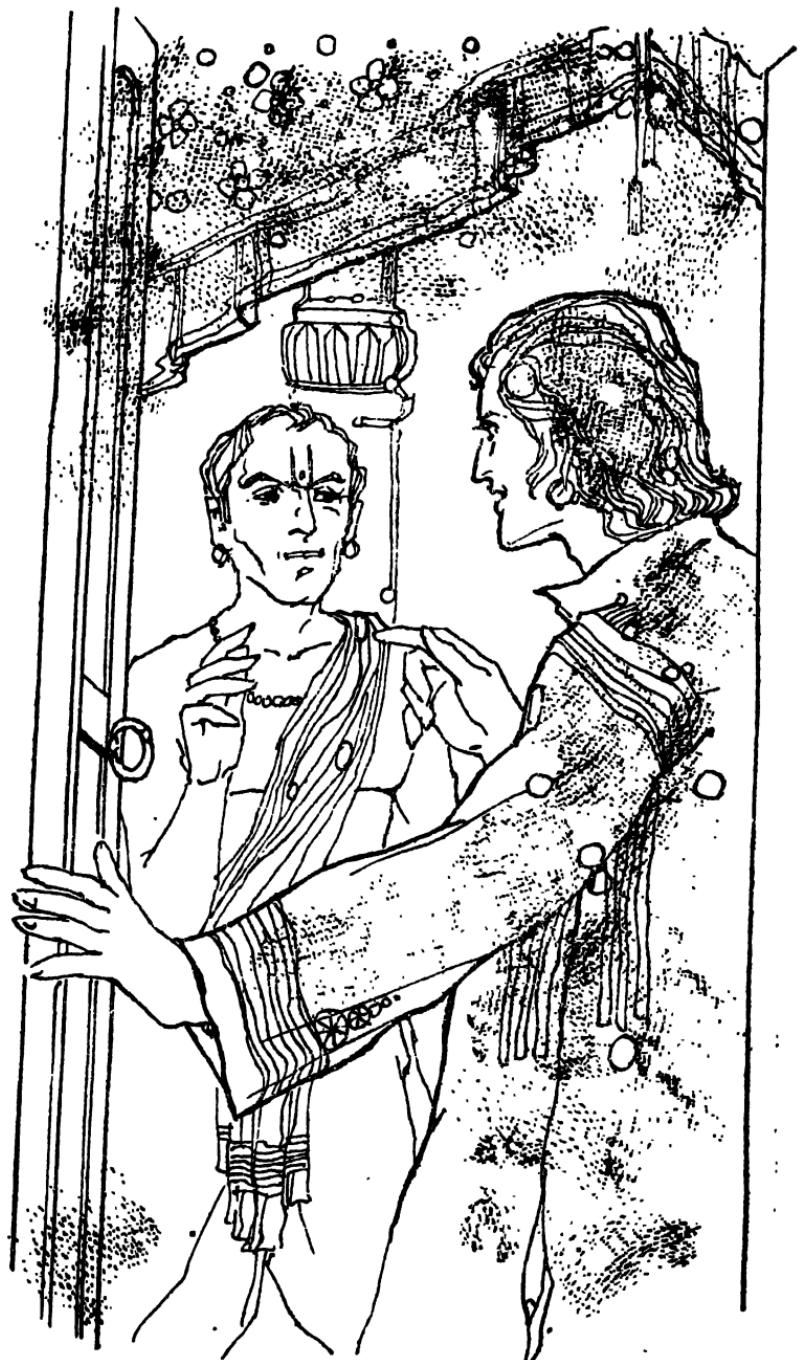
বিধাতা চাপা গলায় হুংকার ছাড়লেন, "পথ ছাড়ো।"

[পৃষ্ঠা ১৫০]

এ্যাঁ! রাজার সেজ ছেলেটা এখনো রাখালের কাজে বেরোয়নি। চুপ করে গাছ তলায় বসে আছে!

বাড়ি আর যাওয়া হলো না। বিধাতা দৌড়লেন সেজ কুমারের কাছে।

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে সেজ কুমার বসে আছে। দূরে এক গাছের মাথায় বসে এক ফিঙে পাখি শিস দিচ্ছে। কুমার চেয়ে আছে সেই দিকে।

বট্‌টে!

অনেক কষ্টে রাগ দমন করতে করতে বিধাতা সেজ কুমারের কাছে গিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—"কি বাবা, গাছতলায় বসে আছ যে? কাজে বেরোবে না?"

বিরক্ত চোখে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে সেজ কুমার আবার নিজের কাজে মন দিল।

বিধাতা গরম হয়ে উঠলেন,—"বলি বাপু, কথাটা কি কানে গেল? আজ গিলবে কি, শুনি?"

সেজ কুমারও চটে উঠলো,—"তাতে তোমার কি হে বুড়ো? ভাগো—ভাগো বলছি এখান থেকে!"

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াতেই, হা-হা করে বিধাতা তার হাত ধরে ফেললেন, বললেন,—"আহা বাবা, চটো কেন? বুড়ো মানুষের কথায় কি চটতে আছে? পরের কষ্ট দেখতে পারি নে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম—কাজ তো করতেই হবে, এভাবে বসে থাকলে চলবে কি করে! আহা কচি বয়েস! আমায় বলো বাবা, কি তোমার অসুবিধে।"

কিন্তু সহজে কি নরম হয় গোঁয়ার ছোঁড়াটা! অনেক মিষ্টি কথার পর শেষে সে বললে, "অতো খেটে আমি পারি নে। একপাল গোরু-মোষ! একটা মুহূর্তও বিশ্রাম নেই।"

বিধাতা যেন বর্তে গেলেন, বললেন,—"তাই বলো! আহা সত্যিই তো! এই বয়েসে অতো খেটে পারবে কেন? কিছু ভেবো না বাবা—সবুর করো এখানে। তোমার জন্যে আমি এখ্খুনি ভাল কাজ জোগাড় করে আনছি।"

তারপর সেজ কুমারকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে বিধাতা যখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন, তখন প্রায় দুপুর। দু পা হয়তো গিয়েছেন, অমনি আবার সেই টনক!

বিধাতা আর্তনাদ করে রাস্তার ওপর বসে পড়লেন: এ্যাঁ! রাজার

মেজ ছেলেটা বসে আছে? এখনো ভিক্ষেয় বেরুলো না! হতভাগাগুলো আজ ভাবলে কি?

কি যে ভাবলে—টনকের জ্বালায় বিধাতার তা ভাববারও অবসর হলো না। ছুটলেন তখ্খুনি।

সেই বটগাছতলা। মেজ কুমার মাথা হেঁট করে বসে এক মনে কাঠি দিয়ে মাটিতে কি সব দাগ কাটছে। বিধাতার ইচ্ছা হলো ইট মেরে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেন। কাছে গিয়ে বললেন,—"বলি ও বাপু, বসে বসে যে পণ্ডিতের মতো আঁক কষছো, আজ খাওয়া জুটবে কোত্থেকে শুনি?"

ধড়মড় করে উঠে মেজ কুমার তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে শেষে বললে—"তা কি করবো, বলুন? সারা দিন ভিক্ষে করে একবেলার খোরাকও জোটে না। তাই ভিক্ষে আর আমি করবো না।"

ছোঁড়াটার আস্পর্ধা দেখে বিধাতার মেজাজ আরো গরম হয়ে উঠলো। বললেন—"বটে! কি করবে তাহলে?"

চড়া গলায় মেজ কুমার বললে, "তাতে আপনার কি দরকার? মেজাজ দেখাবেন না। যান, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার সুর খাদে নেমে এল, অতি মোলায়েম কণ্ঠে বললেন—"আহা, চটো কেন, বাবা? না খেয়ে কষ্ট পাবে, এটা কি চলে কখনো? ওঠো বাবা, ওঠো। ভিক্ষে না করলে যখন চলবে না, তখন যা হোক দুটো এনে ফুটিয়ে নাও।"

দৃঢ়কণ্ঠে মেজ কুমার বললে, "না ঠাকুর। ওভাবে ভিক্ষে করে আমি পারবো না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জিভ বেরিয়ে যায়।"

নিরুপায় বিধাতা—কণ্ঠে দরদ ঢেলে বললেন, "আহা, সত্যিইতো! যথার্থ কথাই বলেছো। তা বাবা, আমার সঙ্গে চলো। দেখবে, এমন ব্যবস্থা করে দেব, যাতে অল্প ঘুরলেই ভিক্ষে ঠিকমতো মিলে যায়।"

মেজ কুমারকে নিয়ে ভিক্ষায় বেরুলেন বিধাতা। ছাড়া যখন পেলেন, তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। সারা দিন অস্নাত অভুক্ত, প্রাতঃকৃত্যাদি জপতপ সব মাথায় উঠেছে—শ্রান্তক্লান্ত দেহে খুঁকতে খুঁকতে বিধাতা চললেন বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যার পর।

স্নানাহার সেরে নিশ্চিন্ত মনে বিধাতা হুঁকোটা নিয়ে কেবল বসেছেন, আরাম করে দু একটা জুতসই টান দিয়েছেন কেবল, এমন সময় হুঁকোটা হাত থেকে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচে গেল: এ্যা! আবার টনক!

রাজার বড় ছেলেটা এখনো চুরি করতে বেরুলো না? চুপচাপ বসে আছে? বাপরে! ওদের আজ হলো কি—এ্যাঁ?

হুঁকো হাতে বিধাতা নিস্পন্দ। মাথায় আগুন জ্বলছে। কিন্তু টনক তা শুনবে কেন?

ঠাস্! হুঁকোটা সশব্দে কাত হয়ে পড়লো। দাঁত-কিড়মিড় করে রুখতে রুখতে বিধাতা তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

জঙ্গলের ধারে ঝোপের কাছে বড় কুমার বসে আছে। চারদিকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। এমন সময় খড়ম পায়ে ঠুক ঠুক করতে করতে বিধাতা গিয়ে হাজির।

সেরেছে!—চমকে উঠলো বড় কুমার। পরক্ষণেই ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

"আহা বাবা, করো কি, করো কি? শোনো, শোনো, ভয় নেই!" চাপা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বিধাতা ছুটলেন তার পেছনে। অন্ধকারে একটা খড়ম কোথায় যেন ছিটকে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে বড় কুমার ফিরে দাঁড়ালো, "আয় দেখি, ট্যাঁ ফোঁ করবি তো শেষ করে দেব।"

পরক্ষণে বিধাতা গিয়ে হাজির। বুড়ো ব্রাহ্মণ দেখে রাজকুমার কতকটা আশ্বস্ত হলো। বললে—"বলো ঠাকুর, কি জন্যে এসেছ। চটপট বলে ফেল চালাকি করেছ কি, এই দেখতে পাচ্ছ—"

হাঁপাতে হাঁপাতে হাত নেড়ে তাকে নিরস্ত করে বিধাতা বললেন—"একটু সবুর বাবা একটু সবুর। বুড়ো মানুষ…"

তারপর কিঞ্চিৎ দম নিয়ে বললেন—"বাবা, ভয় নেই, তোমার কোন অনিষ্ট করতে আমি আসিনি। শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি—সন্ধ্যের পরে রোজ তুমি কাজে বেরোও, আজ কেন বেরুলে না?"

কুমারের মুখ কালো হয়ে উঠলো। ঠিক মতো লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে সে বললে—"ঠাকুর, ভালো হবে না বলছি। কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো।"

শীতের রাত্রে বিধাতা ঘামতে শুরু করলেন। বুঝলেন, অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—"লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষকে ভুল বুঝো না। তোমার ভালো ছাড়া কোন ক্ষতি করতে আমি আসিনি। যে ভাবে হোক আমি জানি, দুটো ভাতের জন্যে কি হীন কাজ তোমায় করতে হচ্ছে।…আহা বাবা, শোনো, শোনো…"

কুমার ততক্ষণে লাঠি তুলেছে। আতঙ্কে বিধাতা দু পা পিছিয়ে গিয়েই, পরক্ষণে কুমারের হাত দুটো চেপে ধরলেন—"বিশ্বাস করো বাবা, বিশ্বাস

করো, কোন ক্ষতি করতে আমি আসি নি। আমার সঙ্গেও কেউ নেই। বাবা, বাধ্য হয়ে যে কাজ তুমি করছো, তাতে কোন পাপ নেই। আজ যে তুমি কাজে বেরুলে না, হয়তো মনে করছো ওতে তোমার পাপ হচ্ছে, সেটা ঠিক নয় —তাই বলার জন্যে আমি এসেছি।"

"কেন? এটা বলার জন্যে তোমার হঠাৎ এমন কি মাথাব্যথা পড়লো? তা যাই বলো না কেন ঠাকুর, ও কাজ আমি আর করবো না।"

"করবে না? কেন বাবা, কি হয়েছে?' সকাতরে বিধাতা জিজ্ঞেস করলেন।

"করবো না, আমার ইচ্ছে। তা জেনে, কি লাভ তোমার?"

তারপর নিজের মনেই সে বললে—"একটা কাজের জন্যে বাড়ি বাড়ি কত ঘুরেছি। সবার কাজ জোটে, আর আমার কপালে একটা যেমন-তেমন কাজও জুটলো না। পেটের দায়ে আজ চুরি করতে হচ্ছে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সারা রাত বাড়ি বাড়ি হাতড়ে এক বেলার খোরাকও জোটে না, তার উপর ধরা পড়লে —ব্যস!"

ফোঁস করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুঢালা কণ্ঠে বিধাতা বললেন— "আহা রে! সত্যিই কী কষ্ট! কিন্তু বাবা, বিধাতার লিখন কে খণ্ডাবে, বল্? চুরি করাই যে তোর বিধিলিপি!"

"চুপ করো বুড়ো!"—রাজকুমার গর্জন করে উঠলো: "বিধিলিপি! বিধাতা! একবার বিধাতার দেখা পেলে হতো। জিজ্ঞেস করতুম, কোন্ পাপে আমার এই অবস্থা। জবাব না পেলে ঠেঙিয়ে তক্তা বানাতুম।"

নিজের অজান্তে বিধাতা পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা। কিছুক্ষণের জন্যে মুখে রা নেই,—শেষে ধীরে ধীরে বললেন—"বাবা, ওসব বলে কি লাভ? চুপ করে বসে থাকলে পেট তো শুনবে না। আমার কথা শোন্, বাবা। আমি তোর সঙ্গে থাকবো। সহজে যাতে কাজ হাসিল হয়, তার সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে দেব। চল্ বাবা, চল্।"

কিন্তু সহজে কি রাজী হয় ছোকরাটা? একমাত্র পায়ে ধরা ছাড়া বিধাতা আর কিছু বাকি রাখলেন না। শেষে দুপুর রাতে তাকে নিয়ে বেরোলেন চুরি করতে।

তারপর রাতভোর চললো তার চোরের শাগরেদি। বিধাতা যখন বাড়ি ফিরলেন, পূব আকাশ তখন ফরসা হয়ে এসেছে।

বিধাতা-গিন্নীও ঘুমোননি সারা রাত। বিধাতা ফিরতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"হাঁ গা, ব্যাপার কি বলো তো? সারাদিন সারারাত তুমি কোথায় টো টো করে বেড়াচ্ছ?"

বিধাতা গুম হয়ে বসে রইলেন। উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা নয়।

আর উত্তরই বা দেবেন কি ছাই। নিজের কাছেও কি কোন উত্তর আছে? ছিঃ ছিঃ। শেষকালে কিনা চোরের শাগরেদিও করতে হলো। রাতভোর বাড়ি বাড়ি ঘুরে চুরির চেষ্টা করতে হয়েছে। ইস্, একবার ধরা পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে কী বাঁচাই না বেঁচে গেছেন!

বিতৃষ্ণায় মুখ কুঁচকে বিধাতা উঠে পড়লেন। রাত শেষ হয়ে গেছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে।

জ্বলন্ত চোখে বিধাতা-গিন্নী তাকিয়ে রইলেন: বটে! উত্তর দেবারও দরকার মনে করো না?

স্নানাহ্নিক প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বিধাতা হুঁকো নিয়ে কেবল বসেছেন, মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা,—জলচৌকির ওপর বসে চোখ বুজে তিনি হুঁকো টানছেন আর ভাবছেন গত চব্বিশ ঘণ্টার কথা, এমন সময় হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন: এ্যাঁ! আবার টনক? আবাগীর বেটী আজো চুপচাপ বসে আছে?

দড়ি থেকে চাদরখানা ছোঁ মেরে কাঁধে ফেলে খড়ম পায় দিতে দিতে বিধাতা তীরের মতো বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

তারপর আবার শুরু হলো গত দিনের কাজ।

দিনের কাজ শেষ করে আধমরা অবস্থায় বিধাতা যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। গিন্নী গুম হয়ে বসে আছেন।

গামছাখানা টেনে নিয়ে বিধাতা চট করে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে-বাইরে তাঁর সমান অবস্থা। সর্বশরীর ব্যথায় বিষ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। তার ওপর গিন্নী তো একেবারে বারুদ!···হুঁ! বাইরে তো বেরোতে হয় না, তাই বুঝতে পারেন না—কত ধানে কত চাল!

স্নানাহ্নিক সেরে কোনো রকমে দুটো মুখে গুঁজে বিধাতা তামাক নিয়ে বসলেন। দুনিয়ার ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। সংসারের ওপরও আর এতটুকু আকর্ষণ নেই। চুলোয় যাক সব!

ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসছে—আয়েশ করে বিধাতা হুঁকোটা কেবল মুখে তুলতে যাবেন, এমন সময় হাতের হুঁকো হাতে রইল, তিনি কাঠ হয়ে গেলেন: এ্যাঁ! আবার টনক নড়ছে? হতভাগা চোরটা আজো চুপচাপ বসে আছে!

লাফ মেরে বিধাতা বারান্দা থেকে নীচেয় পড়লেন: তবে রে হতভাগা, দাঁড়া দেখাচ্ছি—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!

বিধাতার কাণ্ড দেখে বিধাতা-গিন্নীও রেগে আগুন: বটে! এত বড় আস্পর্ধা! এসো আজ ফিরে, দেখি তোমার একদিন কি আমার একদিন!

রোজ রোজ সন্ধ্যের পরে বেরিয়ে যাওয়া আর ফেরা সেই রাত শেষ করে! বুড়ো বয়সের ভীমরতি কি করে ভাঙতে হয়, দেখাচ্ছি।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে তিনি দরজা জুড়ে বসলেন।

বাড়ি ফিরতে বিধাতার রাত শেষ। চেহারা হয়েছে ঝড়-জলে ভেজা দাঁড়কাকের মতো। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। চোখ জবাফুলের মতো লাল। খড়ম জোড়া তিনি পথ থেকেই হাতে নিয়েছিলেন, পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতে যাবেন, দেখেন গিন্নী দরজা আগলে বসে ঝিমোচ্ছেন। গিন্নীর কোমরে আঁটসাঁট করে কাপড় জড়ানো।

সে দিকে নজর পড়তেই বিধাতা আর দাঁড়ালেন না। খড়ম চাদর ফেলে রেখে ত্বরিত পদে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

বিনা তেল গামছায় স্নানাহ্নিক সেরে বিধাতা গুটি গুটি সোজা চলে গেলেন বারান্দায়। গিন্নীর তর্জন-গর্জন সমানে চলেছে। কোন রকমে তামাকটা সেজে হুঁকোয় তিনি জুতসই দু এক টান দিয়েছেন কেবল, অমনি আবার সেই টনক!

এমনি করে দিনের পর দিন রোজই চলতে লাগলো সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

বিধাতার চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, গাল চুপসে গেছে, মুখ শুকিয়ে আমসি। চলতে গেলে তাঁর পা কাঁপে। তার ওপর বুকের দোষও যেন জুটেছে। একটু আওয়াজ হলেই বুক ধড়ফড় শুরু হয়। ঘরেও সমান অশান্তি। গিন্নী সমানে হম্বিতম্বি করে চলেছেন। কার কারসাজিতে এসব ঘটছে, বিধাতার তা আর বুঝতে বাকি নেই। যাকে বলে জাত শয়তান ওই বদমাশ মামাটা!

সমস্ত কর্ম বিধাতার মাথায় উঠেছে। কত নবজাতকের অদৃষ্ট লেখা যে বাদ পড়লো, তার কি আর ইয়ত্তা আছে! কারো কাছে .য তিনি পরামর্শ নেবেন, তারও উপায় নেই! যে শুনবে, সে-ই হাসবে। এমন কি গিন্নীকেও পর্যন্ত বলা চলে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিধাতা পথ চলেন। এই কদিনেই ও-ক্ষমতাটা তাঁর বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কেবলি মনে হয়, 'হায় হায়! শেষে নিজের জালে নিজেই আটকা পড়লাম!'

কিন্তু জাল কেটে বেরোনোর পথ কোথায়? নিরুপায় বিধাতার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে: নেই! কোন পথই নেই! গত কয়েক দিন যাবত একটা কথা তাঁর মনে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারছে: শয়তানটার সঙ্গে মিটমাট করে ফেললে কেমন হয়? বেশি দেরি হলে সব জানাজানি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের কোথায় যেন খচখচ করে ওঠে: এ্যাঁঃ! বিধাতা

হয়ে কিনা শেষকালে এই কম্ম ! মিটমাট করবেন ! আর তা-ও কিনা ওই পাষণ্ডটার সঙ্গে ?

কিন্তু যত দিন যায়, খচখচানিটাও তত ভোঁতা হয়ে আসে। যেটুকু বা বাকি ছিল, তা-ও সেদিন ভোর রাতে বাড়ি ফিরতে গিয়ে উবে গেল। ধুঁকতে ধুঁকতে চলছিলেন তিনি। পথের মোড় ঘুরতেই দেখেন—বঁটি হাতে গিন্নী বাড়ির দরজা আগলে বসে আছেন, কোমরে আঁট করে কাপড় জড়ানো। যেমন দেখা, সঙ্গে সঙ্গে পথের বাঁকে বিধাতা উধাও !

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ তাঁর হুঁশ হলোঃ তাই তো, কোথায় চলেছেন তিনি ?

ভোরবেলা। মামা রাজোদ্যানে পায়চারি করছেন।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। চারিদিকে ফুলের সমারোহ। কিন্তু মামার লক্ষ্য নেই কোন দিকে। নতদৃষ্টিতে তিনি পদচারণ করছেন। দুই হাত পেছনে—গভীর চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তেই তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না ঃ বিধাতা !

পরক্ষণে বিধাতার চেহারার দিকে নজর পড়তেই মুখে তাঁর হাসির ঝিলিক খেলে গেল। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে গদগদ কণ্ঠে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন —"আসুন ভাগ্যবিধাতা, আসুন। কী সৌভাগ্য আমার ! গরীবের কুটির আজ ধন্য হলো। বসুন, বসুন।"

বলতে বলতে পাশের বেদীর ওপর বিধাতার আসন করে দিয়ে গলবস্ত্রে করজোড়ে তিনি বললেন—"আদেশ করুন, প্রভু।"

মামার হাসি বিধাতার নজর এড়ায়নি। তার ওপর ভক্তির এই উৎকট আতিশয্য দেখে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি করে উঠলো। কিন্তু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে বললেন—"বড় খুশি হলাম তোমার ব্যবহারে। রাজার শ্যালকের উপযুক্ত ব্যবহারই বটে। এই পথেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, তোমার ভাগনে-ভাগনীদের খবরটা একবার নিয়ে যাই। তা, কেমন আছে ওরা ? ওদের তাড়িয়ে দিয়ে বেশ তো আরামে আছ দেখছি। ওদের কোন খবর-টবর রাখ ?"

বিধাতা কিনা শেষপর্যন্ত মিথ্যা কথাও বলতে শুরু করেছেন ! মামা অবাক হলেন। মুচকি হেসে বললেন—"হতভাগাদের কথা আর কেন জিজ্ঞেস করেন, বিধাতা ? বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বলুন ? যে যার অদৃষ্টের ধাঁধায় ঘুরে মরছে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—"প্রভু, যে যাই বলুক, আপনার কাছে আমার কিন্তু কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনার দয়াতেই তো আজ আমার এই রাজাগিরি ! এজন্যে আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

আচ্ছা বিধাতা, আপনার কি ঠিক মনে আছে, জন্মসময় আমার কপালে কি লিখেছিলেন ?"

আর কাঁহাতক সহ্য হয় ! বিধাতা যেন ফেটে পড়লেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সগর্জনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি—"বটে। এত আস্পর্ধা। আমার সঙ্গে ঠাট্টা ? আচ্ছা, দেখে নেব।"

বলতে বলতে হনহন করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বাগান ছেড়ে কয়েক পা মাত্র গিয়েছেন, হঠাৎ বুক ধড়ফড় করে উঠলো। আবার টনক !

নিত্যকর্মের কথা মনে হতেই বিধাতার রাগ জল হয়ে গেল। পরক্ষণে এক পা দু পা করে আবার তিনি ফিরে এলেন রাজোদ্যানে।

মামা সাড়ম্বরে আবার অভ্যর্থনা শুরু করতেই বাধা দিয়ে বিধাতাপুরুষ ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—"ওসব রাখো এখন, বলো কি হলে মিটমাট হয়।"

বিধাতার কথা শুনে মামা আবেগে কথা বলতে পারেন না। তাঁর চোখে জল মুখে হাসি। আড়ালে চোখ মুছে শেষে বললেন—"আমি আর কি বলবো প্রভু, সদয় যখন হয়েছেন, তখন দুটো বর আমায় দিন। প্রথমতঃ, আমার চার ভাগনে ও ভাগনীর বিধিলিপি বদলে দিন। রাজার ছেলেমেয়ের উপযুক্ত হবে তারা—হবে শিক্ষিত, ক্ষমতাবান, সুখী, সুন্দর ও ন্যায়পরায়ণ। দ্বিতীয়তঃ, আজ থেকে শুধু বিধিলিপিই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে না। জগতে এটা ঘোষিত হোক যে, পুরুষকার অর্থাৎ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মানুষ নিজের ভাগ্য গড়তে পারবে, বিধিলিপি পালটাতে পারবে।"

বিধাতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত ঃ কী নিদারুণ শর্ত !

কিন্তু বিধাতা চিন্তা করবেন কি, স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না। সমানে টনক নড়ে চলেছে। শেষে অস্থির কণ্ঠে তিনি বললেন—"তথাস্তু ! আজ থেকে তাই-হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে টনক থেমে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরলেন বিধাতা।

আর মামা—বিধাতা চলে যেতেই—আনন্দে কেঁদে ফেললেন। চীৎকার করতে করতে ঢুকলেন রাজপ্রাসাদে। রাজপুরী যেন মাতিয়ে তুললেন। ঘুম থেকে সবাইকে টেনে তুললেন তিনি। তাঁর এই আকস্মিক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলে তটস্থ। মামার কিন্তু ওসব দিকে গ্রাহ্যই নেই। রাজপুরীতে তখনই 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। মামা রওনা হলেন ভাগনে-ভাগনীদের কাছে। তারপর সেই দিনই চার ভাগনে-ভাগনীকে মহাসমারোহে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন রাজপুরীতে।

এতকাল পরে সবাই সব কথা শুনলো। রাজ্যের লোক লজ্জায় ও

অনুতাপে এত বড় মহত্ত্বের পায়ে মাথা হেঁট করলো। সজল চোখে ক্ষমা চাইল সবাই।

মামা কিন্তু নীরব—নির্বিকার।

কয়েক দিন পরে তিনি বড় কুমারকে সিংহাসনে বসালেন। অভিষেক উৎসব শেষ হলে, সবাইকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—"এইবার তোরা আমায় বিদায় দে। সারা জীবন তো বিষয়-আশয়ে কাটলো, এবার পরকালের কথা একটু ভাবতে হবে।"

ভাগনে-ভাগনীদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তারা কেঁদে উঠলো। হায় হায় করতে করতে ছুটে এল রাজ্যের মানুষ। কিন্তু কোন কিছুই মামাকে নিরস্ত করতে পারল না। সকলের কান্নার মাঝে এককাপড়ে তিনি রাজপুরী ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেউ জানে না।

কিন্তু মামা চলে গেলেও, সেই থেকে মানুষের জীবনে এল এক নতুন প্রভাত। মানুষ আর ভাগ্যের দাস রইল না। পুরুষকারই হলো তার জীবনের ধ্রুবতারা।

গঙ্গার তীরে এক নির্জন গহন বন। বনের পাশে গাছপালার অন্তরালে লতায়-পাতায় ছাওয়া এক ঋষির কুটির।

লোকালয় থেকে দূরে নির্জন এই বনরাজ্যে ঋষি বাস করছেন। গঙ্গার তীরে তিনি তপস্যা করেন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত, সব ঋতুই তাঁর কাছে সমান। কোন ঋতুতেই তাঁর তপস্যায় ছেদ পড়ে না। এমনি সে কঠোর তপস্যা। আপনভোলা ঋষি ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর।

কিন্তু সন্ধ্যার পর কুটিরে ফিরে মাঝে মাঝে তাঁর কষ্ট হয়। সারাদিন জপতপ ধ্যানধারণায় কেটে যায়, কিন্তু সন্ধ্যার পরে কোন কোন দিন তাঁর সময় যেন আর কাটতে চায় না। অন্ধকার নিস্তব্ধ অরণ্যের মাঝে নিজেকে বড় একলা নিঃসঙ্গ মনে হয়।

ঋষির কুটিরে বাস করে এক ইঁদুর। ঋষি তাকে বড় ভালবাসেন। ইঁদুরও তাঁকে দেখে আপন জনের মতো—তাঁর পোষা যেন। ঋষি কুটিরে ফিরলে আনন্দে নাচতে নাচতে সে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, তাঁর হাতে পায়ে কোলে পিঠে চড়ে তাঁকে অস্থির করে তোলে। ঋষি খুশী হন। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটে না। বারে বারে মনে হয়—আহা! গল্পগুজব করার, দুটো ধর্মকথা কইবার একজন সঙ্গীও যদি থাকতো!

এমনিভাবে দিন, মাস, বছর গড়িয়ে চলে। কিন্তু যত দিন যায়, ঋষির নিঃসঙ্গতা-বোধ যেন ততই বাড়তে থাকে। এমনকি মাঝে মাঝে তপস্যাতেও বাধা পড়তে শুরু করে।

শেষে উপায় না দেখে ঋষি একদিন ইঁদুরটিকেই মানুষের মতো কথা বলার শক্তি দিলেন। তার নাম রাখলেন 'কুটুর'।

এর পর থেকে ঋষির আর কোন কষ্ট রইল না। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে কুটুর তাঁকে মানুষের ভাষায় কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়, গল্পগুজবে ধর্মকথা-আলোচনায় ঋষির সময় চমৎকার কেটে যায়।

কিছুকাল পরে···

একদিন সন্ধ্যায় ঋষি কুটিরে ফিরতে ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। বিমর্ষ কণ্ঠে ঋষিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চুপ করে বসে রইল একপাশে।

অবাক হয়ে ঋষি জিজ্ঞেস করলেন—"কি হয়েছে, কুট্টুর ? মন খারাপ কেন ?"

ছলছল চোখে কুট্টুর বললে—"প্রভু, অনেক দিন যাবৎ বলি-বলি করেও কথাটা আপনাকে বলতে পারি নি, আজ আর না বলে পারছি নে। আমি বড় বিপদের মধ্যে আছি।"

"বিপদ ! কিসের বিপদ ?"

ইঁদুর বললে—"প্রভু, সকালবেলায় আপনি বেরিয়ে গেলে কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে রোজ ঘরে ঢোকে। আমাকে ধরার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করে। আর ভয়ে আধমরা হয়ে আমি গর্তের মধ্যে পড়ে থাকি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—এভাবে চললে তার হাতেই একদিন-না একদিন আমার প্রাণ যাবে।"

বিচলিত কণ্ঠে ঋষি বললেন—"কী সাংঘাতিক কথা! কি করা যায় বলো তো ?"

ইঁদুর বললে—"প্রভু, যদি অসন্তুষ্ট না হন তো, আমার একটা প্রার্থনা পূরণ করে দিন। আমায় দয়া করে বিড়াল করে দিন—যাতে আর কোন বিড়াল আমার কাছেও ঘেঁসতে না পারে।"

ঋষি তখনি এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল নিয়ে মন্ত্র পড়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন—"তথাস্তু !"

চোখের পলকে ইঁদুর বিড়ালে রূপান্তরিত হলো।

কিছুদিন পরে আবার এক সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরে ঋষি দেখেন, গম্ভীর মুখে বিড়াল চুপচাপ একপাশে বসে আছে।

অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে, আবার কি হলো ? ওভাবে বসে আছ যে ? নতুন জীবন কেমন লাগছে ?"

মিটমিট চোখে বিড়াল বললে—"বিশেষ ভাল না, প্রভু।"

"ভাল না ! কেন ? পৃথিবীতে আর কোন বিড়াল আছে, যে তোমার চেয়ে শক্তিমান ?"

সামনের দুই থাবা জোড় করে বিড়াল বললে—"তা নেই সত্যি। কিন্তু প্রভু, নতুন আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। আপনি তপস্যায় গেলে রোজ একদল কুকুর আসে এখানে। তাদের সে কী ভয়ংকর চিৎকার! ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়, ঘরের বের হতে পারি নে।"

চিন্তিত মুখে ঋষি বললেন—"বটে!"

ঋষির পায়ে গড় হয়ে বিড়াল বললে—"প্রভু, আপনার দয়ার কথা বলে শেষ করা যায় না। সামান্য এক ইঁদুর ছিলাম। আপনার দয়ায় কথা বলার ক্ষমতা পেলাম। আজ বিড়াল হয়েছি। যদি রাগ না করেন তো, আমার আর একটা প্রার্থনা আছে, বলি।"

বিড়ালের কথা বলার ক্ষমতা দেখে ঋষি হেসে ফেললেন, তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললেন—"অত ভণিতার দরকার নেই—বলো।"

বিড়াল বললে,—"প্রভু, আমায় কুকুর করে দিন।"

"তথাস্তু!"

সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল এক প্রকাণ্ড কুকুরে পরিণত হলো।

দিন যায়। নতুন জীবনে কুকুরের আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। নির্ভয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। কুটিরে, কুটিরের বাইরে, তপোবনের সর্বত্র তার অবাধ গতি। ভয়ে কোন জীব তার কাছেও ঘেঁষে না।

কিন্তু যত দিন যায়, তার আনন্দে ততই যেন ভাঁটা পড়তে থাকে। প্রকাণ্ড জানোয়ার সে—ঋষির উচ্ছিষ্ট খেয়ে আজ আর তার পেট ভরছে না। তাই দিনের খাবার জোগাড় করতে তাকে কতই না পরিশ্রম করতে হয়। অথচ গাছের উপরে বানরদের সে দেখে—ওসব বালাই-ই নেই তাদের। গাছ ভরতি পাকা পাকা রসাল ফল—তারা পেট ভরে খায় আর মনের ফুর্তিতে চেঁচামেচি লাফালাফি করে সময় কাটায়।

কুকুর সতৃষ্ণ নয়নে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে—'আঃ! কী আনন্দেই না ওরা দিন কাটায়! জীবন বটে ওদের!'

ক্রমে ক্রমে কুকুর-জীবনের উপর তার যৎপরোনাস্তি বিতৃষ্ণা ধরে গেল। কোন কিছুই আর ভাল লাগে না।

শেষে একদিন আর না থাকতে পেরে মুখ ভার করে সে আবার গিয়ে দাঁড়ালো ঋষির কাছে।

ঋষি জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে, খবর কি? মুখ ভার কেন?"

ঋষির পায়ে লুটিয়ে পড়ে অনেক ভণিতার পর কুকুর বললে—"প্রভু, এই নতুন জীবনে বড় কষ্টে পড়েছি।"

"কষ্ট? কিসের?"—ঋষি জিজ্ঞেস করলেন।

ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে কুকুর আবার ভণিতা শুরু করতেই ঋষি বাধা দিলেন—"ওসব রাখ। কষ্টটা কি বলো।"

কুকুর বললে—"প্রভু, এত বড় জানোয়ার আমি, অল্প খাবারে আজ আর আমার পেট ভরে না। সে খাবার জোগাড় করতে আমাকে যে কতখানি কষ্ট

পোয়াতে হয়, তা আর কি বলবো! অথচ গাছের উপরে বানরদের দেখ— ওসব ঝামেলাই তাদের নেই। হাতের কাছে পাকা পাকা রসাল ফলে পেট ভরাতি করে কেমন মহানন্দে তারা দিন কাটায়। তাই প্রভু, আপনার কাছে আমার আর একটা প্রার্থনা ঃ আমায় বানর করে দিন।"

ঋষি কি ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর—

কুকুর বানর হলো।

নতুন বানর পুলকে যেন আত্মহারা। গাছে গাছে লাফালাফি করে, ডালপালা ভেঙে, আকণ্ঠ ফল খেয়ে, অন্য বানরদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করেও তার সাধ মেটে না।

এমনিভাবে বসন্তকাল কেটে গেল। বসন্তের পরে এল গ্রীষ্ম। আর গ্রীষ্মের সঙ্গে এল যেমন খরা, তেমনি অনাবৃষ্টি। গরমে নতুন বানরের শরীর আইঢাই করে। ঘন ঘন পিপাসা পায়। অথচ আগের মতো আর যেখানে-সেখানে জল মিলছে না। অনাবৃষ্টির ফলে বেশির ভাগ খাল বিল পুকুর প্রায় শুকিয়ে গেছে, নদীর জলও নেমে গেছে অনেক নীচে। জল খাওয়া নতুন বানরের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

গরমে আর তেষ্টায় এমনি যখন তার অবস্থা, তখন বুনো শুয়োরদের কিন্তু ভারী ফুর্তি। সারা দিন তারা জলে কাদায় খেলা করে বেড়ায়, ঠাণ্ডা জলে গা ডুবিয়ে আরামে পড়ে থাকে। গরমের কষ্ট তাদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারে না।

বানরটি তাদের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে —'আঃ! কী আরামের জীবন ওদের! বানর না হয়ে আমার শুয়োর হওয়াই উচিত ছিল।'

মনের কষ্টে হা-হুতাশ করে কিছু দিনের মধ্যেই সে বেশ কাহিল হয়ে পড়লো। খাওয়াদাওয়া খেলাধুলোয় আগের মতো আর রুচি নেই।

শেষে আবার একদিন সে হাত জোড় করে গিয়ে দাঁড়ালো ঋষির কাছে।

তারপর আবার সেই ভণিতা। ঋষি ধমক দিতে সে কাজের কথা পাড়লো। বললে—"প্রভু, অসন্তুষ্ট না হন তো আমার আর একটা প্রার্থনা আপনাকে নিবেদন করি।"

"করো।"—ঋষির কণ্ঠে কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটে ওঠে।

কাঁদো-কাঁদো গলায় বানর বললে—"প্রভু, আমায় শুয়োর করে দিন।"

ঋষি কি আর করেন! আদুরে জন্তুটিকে তাঁর অদেয় কিছু নেই। তাই খানিক ইতস্ততঃ করে বলবেন—"তথাস্তু"।

নতুন জীবন পেয়ে নতুন শুয়োর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না

সেখানে। ক্ষুদে লেজটা নাড়তে নাড়তে নতুন উম্মাদনায় সে ছুটলো দূরের এক বিলের দিকে।

সাধারণ শুয়োরদের চেয়ে আকারে সে অনেক বড়—মহাকায় বরাহবিশেষ। গায়ের জোরও তার তেমনি। তাই কয়েক দিনের মধ্যেই সে শুয়োর-দলের সর্দার হয়ে দাঁড়ালো।

দলবল নিয়ে সারা দিন সে খালে বিলে পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপি করে বেড়ায়, ঘন্টার পর ঘন্টা নাক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে পড়ে থাকে। নতুন জীবনের নতুন আনন্দ সে উপভোগ করে অন্তর ভরে।

কিছুকাল পরে······

সে দেশের রাজা একদিন বনে এলেন শিকার করতে। সঙ্গে বহু লোকজন সৈন্যসামন্ত। হাতীর পিঠে চড়ে তিনি বনবাদাড় তছনছ করে ঘুরতে লাগলেন। কত জন্তু-জানোয়ার যে মারা পড়লো তার ইয়ত্তা নেই।

আমাদের শুয়োর-দলপতি তখন দলবল নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে এক বিলে বাস করছে। শিকার করতে করতে রাজা এক সময় সেখানে এসে পেঁছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তীরবৃষ্টি। শুয়োরদের করুণ চিৎকারে বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠলো।

আমাদের দলপতির ভাগ্যের জোর বলতে হবে, অতি অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেল। সে তখন বনজঙ্গল ভেঙে পাগলের মতো ছুটছে। ছুটছে আর ভাবছে, ভাবছে আর ছুটছে—'ইস! বড় বাঁচা বেঁচে গেছি! পর পর দুটো তীর কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেল। আর একটু হলেই—ফরসা!'

রাজহস্তীর চেহারাটা বারবার তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে—'সত্যি, জীবনের মতো জীবন বটে রাজার ওই হাতীটার! যেমন চেহারা, সওয়ারও তেমনি। আর কী সাজসজ্জা! পিঠের উপর ঝলমলে রঙ-বেরঙের আসন। আর তার উপর সওয়ার হলেন কিনা দেশের এত বড় শক্তিমান রাজা।'

এমনি করে ভাবতে ভাবতে আর ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যার পরে সে এসে পেঁছিলো ঋষির কুটিরে। এসেই হুমড়ি খেয়ে কেঁদে পড়লো ঋষির পায়ে। ভয়ে ও পরিশ্রমে সে আধমরা। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না।

ঋষি তাকে আশ্বস্ত করে তার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে শিউরে উঠলেন। শুয়োর ডুকরে কেঁদে উঠলো—"প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। আমায় হাতী করে দিন।"

তৎক্ষণাৎ ঋষি তার মনস্কামনা পূরণ করলেন।

নতুন হাতী দিনরাত বনে বনে ঘোরে আর ভাবে, কিভাবে রাজার

চোখে পড়বে। কত রকম বুদ্ধি আসে মাথায়, কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হয় না।

শেষে অনেক প্রতীক্ষার পর এক দিন এল সেই সুযোগ। রাজা আবার এক দিন বনে এলেন শিকার করতে। দূর থেকে হাতীটাকে দেখে তিনি চমকে গেলেন। তাঁর সঙ্গীদেরও সেই অবস্থা। কী বিরাট কী সুন্দর হাতী! চলার ভঙ্গীটাই বা কি চমৎকার!

রাজা হুকুম দিলেন তাকে ধরার জন্যে।

হাতী যে সহজেই ধরা দিল, তা বোধহয় না বললেও চলে। পোষ মানলো সে আরো সহজে। তার বুদ্ধি দেখে রাজা এত মোহিত যে, সেই দিন থেকে সে বহাল হলো রাজহস্তীর পদে।

রাজার আদর-যত্নে আর রাজসিক আরামে হাতীর জীবন ধন্য হলো।

দিন যায়।...

রানীর একদিন সখ হলো, গঙ্গাস্নানে যাবেন। রাজার হুকুমে সিপাহী-সান্ত্রী সাজলো। অপরূপ সাজে সাজানো হলো নতুন রাজহস্তীকে। তার পিঠে চড়ে রাজাও যাবেন রানীর সঙ্গে।

খবর শুনে হাতী মহা খুশী : রাজা উঠবেন তার পিঠে! এত দিনের মনোবাঞ্ছা তার পূর্ণ হবে!

কিন্তু এ কী!—হাতী হঠাৎ চমকে উঠলো—রানী উঠছেন তার পিঠে? অ্যাঁ! তার পিঠে উঠবে কিনা একজন স্ত্রীলোক? কী লজ্জা! কী লজ্জা! হলেনই বা উনি রানী, কিন্তু সে-ই বা কম কিসে? সে রাজহস্তী—গজেন্দ্র!

রানী তখন তার পিঠের উপর উঠছেন। হাতীর আর সহ্য হলো না। চিৎকার করে সে লাফিয়ে উঠলো। রানী ছিটকে পড়লেন দূরে। সবাই হায় হায় করে ধেয়ে এল। রাজা ছুটে এসে রানীকে বুকে তুলে নিলেন। চারিদিকে তুমুল সোরগোল উঠলো—'পালাও! পালাও! রাজহস্তী খেপে গেছে!'

রাজার ও রাজপুরীর সকলের ঐকান্তিক সেবা-যত্নে রানী সুস্থ হলেন বটে, কিন্তু রাজহস্তী বুঝি সত্যিই খেপে গেল। ভয়ঙ্কর চিৎকারে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে রাজপুরী ছেড়ে সে ছুটলো বনের দিকে।

আজ তার সমস্ত ধারণা পালটে গেছে। এত দিন সে ভাবতো, রাজহস্তীই বুঝি রাজার সবচেয়ে আদরের। কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখলো, কত মিথ্যা সে ধারণা। রানীই শুধু পায় রাজার সত্যিকারের আদর-ভালবাসা। রানীর জীবনই সার্থক জীবন।

ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যার পরে সে এসে পৌঁছলো ঋষির কুটিরে।

ঋষি যেন আকাশ থেকে পড়লেন—"কি খবর হে? তুমি অসময়ে এখানে? রাজার হাতিশাল ছেড়ে এলে যে?"

তাঁর পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ে হাতী কেঁদে ফেললে, তার পর ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের জলে ভেসে তার দুঃখের কথা শেষ করে শেষে বললে—"প্রভু, আমায় সুখী করার জন্যে আপনি কত কি করলেন ! কিন্তু সুখশান্তি আমার অদৃষ্টে নেই। আজ প্রভু, আপনার কাছে আমি শেষবারের মতো প্রার্থনা জানাতে এসেছি, আর কোনো দিন উত্ত্যক্ত করবো না—আমায় আপনি রানী করে দিন !"

ঋষি গরম হয়ে উঠলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—"অসম্ভব ! মূর্খ জানোয়ার, তুমি জানো না, কি বলছো। তোমার এ অসম্ভব প্রার্থনা কখনই পূরণ হতে পারে না। তোমাকে রানী করতে হলে রাজা চাই, রাজ্য চাই। সে সব আমি কোথায় পাব ?"

হাতী কোন উত্তর দিলে না। ঋষির পায়ের কাছে মাথা রেখে নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ধীরে ধীরে ঋষির মন নরম হয়ে এল। শেষে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—"বাপু, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই, কিন্তু তা বলে রানী করাও সম্ভব নয়। তবে একটা কাজ করতে পারি। তোমায় আমি পরমাসুন্দরী এক মেয়েতে পরিণত করতে পারি। তার পরে তোমার ভাগ্য। কোন রাজা যদি তোমায় দেখে বিয়ে করেন, তাহলেই তোমার সাধ পূর্ণ হবে—তুমি রানী হতে পারবে।"

হাতী সানন্দে তাতেই রাজী হলো।

পরক্ষণে কোথায় মিলিয়ে গেল বিরাটবপু সেই কুৎসিত জানোয়ার। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ রূপসী মেয়ে। ঋষি তার দিকে চেয়ে হাসলেন। রাজার মনমাতানো রূপই বটে ! মেয়ের নাম রাখলেন তিনি পোস্তমণি।

পোস্তমণি ঋষির কুটিরে থাকে, তাঁর মেয়ের মতো আশ্রমের যত্ন নেয়, ঋষির সেবাশুশ্রূষা করে। আর অবসর সময়ে কুটিরের দরজায় বসে থাকে।

এমনিভাবে দিন যায়।

একদিন ঋষি নিত্যকার মতো তপস্যায় বেরিয়ে গেছেন, পোস্তমণি দরজায় বসে আছে, এমন সময় বন থেকে বেরিয়ে এল মূল্যবান জমকালো পোশাকপরা একজন অশ্বারোহী। অশ্বারোহী রূপবান—দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক।

পোস্তমণি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে কুটিরে অভ্যর্থনা জানালো।

আগন্তুক কিন্তু মুগ্ধ। নিষ্পলক চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন পোস্তমণির দিকে। তার পর খেয়াল হতেই ঘোড়া থেকে নেমে কুটিরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—"এ দিকে শিকারে এসেছিলাম। একটা হরিণের পিছনে ছুটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রামের স্থান খুঁজছি। এখানে পাব কি ? সঙ্গের লোকজন বহু পিছনে পড়ে আছে।"

মধুর হেসে পোস্তমণি বললে—"আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। অতিথি আপনি—এ কুটির আপনারই কুটির বলে মনে করবেন। এখানে যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করুন, পিপাসা দূর করুন। কিন্তু আমরা বড় গরীব। আপনার মতো সম্মানিত মর্যাদাশালী ব্যক্তির সেবা করবো, এমন সাধ্য আমাদের নেই। যদি কিছু মনে না করেন—আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?"

সহাস্যে যুবক বললেন, তাঁর পিতা এ অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের সম্রাট—রাজার রাজা। আর তিনি যুবরাজ।

আনন্দের আতিশয্যে পোস্তমণির বুক ফেটে যাবার মতো অবস্থা। সমস্ত শরীর অবশ—চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সে ভিতরে ছুটে গেল এবং এক পাত্র জল এনে নিজের হাতে অতিথির পা ধোয়াতে যেতেই যুবরাজ বাধা দিলেন—"না, না। এ কি করছেন আপনি ? আমি জাতিতে ক্ষত্রিয় আর আপনি ঋষি-কন্যা। আপনি আমার পা ধোয়াবেন কি !"

বিষাদমাখা কণ্ঠে পোস্তমণি বললে—"না যুবরাজ, আমি ঋষি-কন্যা নই, এমন কি ব্রাহ্মণ কন্যাও নই। তাই আপনার পা স্পর্শ করলে কোন দোষ নেই। তা ছাড়া আপনি পূজনীয় অতিথি, আপনার সেবা করা আমার ধর্ম।"

পোস্তমণির কথা শুনে যুবরাজের মন আনন্দে নেচে উঠলো, বললেন—"আমার স্পর্ধা মাফ করবেন, দেবী—কোন্ বর্ণে আপনার জন্ম জানতে পারি কি ?"

নতমস্তকে পোস্তমণি বললে—"শুনেছি, আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যুবরাজ বললেন—"ক্ষমা করবেন দেবী, আপনার বংশ-পরিচয় জানার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। অবশ্য আপনার অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও সুমার্জিত ব্যবহারে মনে হয়, আপনি রাজকুলোদ্ভবা।"

পোস্তমণি কোন উত্তর না দিয়ে ধীরমন্থর পদে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এল এক পাত্র সুমিষ্ট ফলমূল নিয়ে। যুবরাজ বললেন—"না দেবী, আমার কথার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই আমি স্পর্শ করবো না।"

নতমস্তকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পোস্তমণি বললে—"যুবরাজ, এ হতভাগিনীর বংশ-পরিচয় জেনে আপনার কী লাভ হবে জানি নে। তবে যা শুনেছি, সংক্ষেপে বলছি। আমার পিতা রাজা ছিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁর রাজ্য ছিল, জানি নে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমার জননীকে নিয়ে এক-বস্ত্রে তিনি বনে পালিয়ে আসেন। সেখানে বাঘের কবলে তাঁর প্রাণ যায়। এই সময় আমারও জন্ম হয়। কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট যে, পৃথিবীর বুকে আমি যখন প্রথম চোখ খুললাম, জননীও সেই সময় চিরতরে চোখ বুজলেন। যে গাছের তলায় আমার জন্ম

মধুর হেসে পোস্তমণি বললে, "আপনি কিছুমাত্র সংকোচ করবেন না।..."

[পৃষ্ঠা ১৭৬]

হয়, তার ডালে একখানা মৌচাক ছিল। শুনতে আশ্চর্য লাগে, সেই মৌচাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু আমার মুখে ঝরে পড়তো, আর তাই থেকে জীবনদীপ আমার টিকে ছিল। তার পর এই মহানুভব ঋষি আমায় দেখতে পেয়ে আশ্রমে এনে লালনপালন করেন। এই হলো অভাগিনীর জীবনের ইতিহাস।"

বলতে বলতে পোস্তমণি অঝোরে কেঁদে ফেললে।

যুবরাজের অন্তর সমবেদনায় ভরে উঠেছে। পোস্তমণির একখানা হাত নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললেন—"না দেবী, তুমি অভাগিনী নও। কেঁদ না। পৃথিবীর তুমি সেরা সুন্দরী—প্রিয়ভাষিণী। শ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাজপ্রাসাদ তোমায় পেয়ে ধন্য হবে।"

শুনতে শুনতে পোস্তমণির ইচ্ছা হলো, যুবরাজের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করলো।

তার পর ঋষির কুটিরে গান্ধর্ব মতে মালা বদল করে নিরালায় বিয়ে হলো দুজনার।

দিনের শেষে ঋষি কুটিরে ফিরতে যুবরাজ বিদায় নিলেন তাঁর কাছ থেকে। পোস্তমণিকে নিয়ে লোকজন সমভিব্যাহারে মহা ধুমধামের সঙ্গে ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে।

দিন যায়।

কৃতার্থ পোস্তমণি। তার জীবন সার্থক। ইতোমধ্যে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় যুবরাজ সিংহাসনে বসেছেন। পোস্তমণি হয়েছে তাঁর পাটরানী—প্রধানা মহিষী।

নতুন রাজার সে নয়নের মণি। এক মুহূর্ত সে চোখের আড়াল হলে রাজা ভেবে চিন্তে অস্থির। বিলাসে-ব্যসনে হাসি-আনন্দে পোস্তমণির জীবন ভরপুর। দুঃখের লেশ নেই কোথাও।

কিন্তু নিয়তির খেলা কে বুঝবে! হঠাৎ একদিন কোথা দিয়ে কী যে ঘটে গেল, আজো তা কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না।

সেদিন পোস্তমণির কি খেয়াল হলো—রাজোদ্যানে একটা গভীর কুয়ো ছিল, হাঁটতে হাঁটতে সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পরেই কি ঘটলো কেউ বলতে পারে না—পোস্তমণি হয়তো ঝুঁকে কুয়োর ভিতরে একবার তাকিয়েছিল, তাই হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল—টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে।

চিৎকার করে সবাই ছুটে এল। খবর শুনে রাজা ছুটে এলেন হায় হায় করতে করতে। এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড! পুরীময় শুধু হইচই,

চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি। কুয়ো থেকে পোস্তমণিকে তোলার চেষ্টা চললো বটে, কিন্তু ততক্ষণে সে মারা গেছে।

রাজার চোখে নামলো অন্ধকার আর অশ্রুর বন্যা। রানীকে হারিয়ে বেঁচে থাকার আর এতটুকু ইচ্ছে নেই। বারে বারে তিনি আত্মহত্যা করতে যান, আর মন্ত্রী কোটাল পারিষদ্‌বর্গ তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

এমনি যখন রাজা ও রাজপুরীর অবস্থা, তখন ধীরে ধীরে রাজসভায় এসে হাজির হলেন পোস্তমণির পালকপিতা—সেই ঋষি। পোস্তমণি মারা গেছে জেনে তিনি এসেছেন।

রাজার অবস্থা দেখে ক্ষণেকের জন্যে তাঁর মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ, শান্ত হোন। নিয়তির উপর কারো হাত নেই। বৃথা শোক করে বা নিজের জীবন নষ্ট করে কোন লাভ হবে কি? আত্মহত্যা যে কত বড় পাপ, আপনার তা অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু মহারাজ, শুধু এই কথা বলার জন্যেই আমি আসি নি। এসেছি অদ্ভুত একটা কাহিনী আপনাকে শোনাবার জন্যে।"

মুহূর্তে রাজসভা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। ঋষি বলতে লাগলেন—"মহারাজ, আপনার এই মৃতা রানীর পরিচয় জানেন কি? সে যে পরিচয় দিয়েছিল, তা সবই মিথ্যা। আপনি তাকে নিয়ে বিয়ের আগে ও পরে এত মত্ত ছিলেন যে, আমার কাছে তার কুলশীল-পরিচয় জিজ্ঞেস করার কথা একবারও মনে হয় নি। সেই কথাটা আজ বলতে এসেছি। শুনলে আপনি শোক ভুলে যাবেন।"

এক মুহূর্ত থেমে ঋষি বললেন—"মহারাজ, আপনার মহিষীর রাজবংশে জন্ম হয় নি, এমন কি মনুষ্যকুলেও তার জন্ম নয়, তার জন্ম হয়েছিল মূষিককুলে। সে ছিল সামান্য একটা ইঁদুর।"

অ্যাঁ !!

সিংহাসন থেকে পড়তে পড়তে রাজা সামলে নিলেন। কিন্তু মন্ত্রী কোটাল পারিষদ্‌বর্গ চিৎপাত।

"তার নাম রেখেছিলাম কুট্টুর।"—ঋষি বললেন।

অ্যাঁ !!

তাদের পাটরানী কুট্টুর !!!

রাজসভায় পক্ষাঘাত ঘটলো!

হাজার বার বাজ পড়লেও বুঝি মানুষের এমন সর্বনাশ হয় না!

রাজার চোখের জল যে কখন শুকিয়ে গেছে, রাজাও তা টের পান নি।

চারিদিকে তাকিয়ে ঋষি বললেন—"হ্যাঁ, আশ্চর্য হবার কথাই বটে।"

তারপর একে একে তিনি সমস্ত ইতিহাস বলে গেলেন, থামলেন এসে হাতীতে।

. নিস্পন্দ রাজসভা শিবনেত্র হয়ে আছে। হঠাৎ সভাপণ্ডিতের আর্তনাদ বেরিয়ে এল—"তারপর ?"

"তার পর হাতী থেকে পোস্তমণি।"—মৃদু হেসে ঋষি বললেন : "হাতীর শেষ প্রার্থনা মতো তাকে আমি পরমাসুন্দরী এক মেয়েতে রূপান্তরিত করলাম, নাম রাখলাম পোস্তমণি। তার পরের সব ঘটনা আপনিও জানেন, মহারাজ।"

আর 'মহারাজ'! মহারাজার তখনকার অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। রাজা চোখে ইঁদুর দেখছেন।

ঋষি বলে চললেন—"যা হবার, তা হয়ে গেছে, মহারাজ। অতীতের জন্য দুঃখ করা বৃথা। আপনি সুস্থ হোন, আবার বিয়ে করে সুখী হন। আর সেইসঙ্গে আমিও একটা কাজ করতে চাই। আমার যশস্বিনী কন্যা পোস্তমণির নাম চিরস্মরণীয় করতে চাই। এমন ঘটনা অতীতে কখনো ঘটে নি, ভবিষ্যতেও আর ঘটবে না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, পোস্তমণির দেহ কুয়ো থেকে তোলার চেষ্টা করবেন না—করে লাভও নেই, তার দেহ পাবেন না। মাটি দিয়ে কুয়োটা ভরাট করে দিন। কিছু দিন পরে দেখবেন, ওখানে একটা গাছ গজিয়েছে। পোস্তমণির নামানুসারে গাছটির নাম রাখবেন পোস্তগাছ। এই গাছের ফল হবে পোস্তদানা। তার নির্যাস থেকে অত্যাশ্চর্য এক পদার্থ তৈরী হবে। লোকে তার নাম রাখবে অহিফেন বা আফিম। আফিমের মতো অদ্ভুত বস্তু অতীতে হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। পৃথিবীর বুকে যত দিন মানুষ থাকবে, তত দিন নেশার জিনিস হিসাবে আফিমের খ্যাতিও অটুট থাকবে। এটা যে কোনভাবে—অর্থাৎ বড়ি করে, জলে গুলে বা তামাকের মতো আগুনে পুড়িয়ে—খাওয়া চলবে। আর তা খেলেই নেশা হবে।"

প্রধানমন্ত্রী নড়ে উঠলেন। কোষাধ্যক্ষ কোটাল সভাপণ্ডিত চোখ মেললেন। সবার কান খাড়া। ঋষি বলে চলেছেন—"কিন্তু আফিমখোরদের অর্থাৎ যারা আফিমের নেশা করবে, তাদের প্রকৃতি পালটে যাবে—সাধারণ মানুষের সুস্থ প্রকৃতি আর থাকবে না। তাদের চরিত্রে পোস্তমণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করবে। যেসব প্রাণীতে পোস্তমণি রূপান্তরিত হয়েছিল, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই দেখা দেবে আফিমখোরদের চরিত্রে।

"তারা হবে ইঁদুরের মতো পরশ্রীকাতর ও অপকারী, বিড়ালের মতো দুগ্ধ-প্রিয় ও চোর, কুকুরের মতো ঝগড়াটে ও পদলেহী, বানরের মতো অনুকরণপ্রিয় ও অস্থিরমতি, বুনো শুয়োরের মতো একগুঁয়ে ও হিংস্র, হাতীর মতো আলসে ও জড়বুদ্ধি, আর রানীর মতো দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী। তা ছাড়া পোস্তমণির মতো তারাও কখনই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে চাইবে না।"

বলতে বলতে ঋষি ধীর পদে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আর সেই থেকে আফিমের আবির্ভাব ঘটলো পৃথিবীতে।

● যবনিকা ●